মহাবিদ্রোহের কাহিনী

সত্যেন সেন

মহাবিদ্রোহের কাহিনী

সত্যেন

সেন

মুক্তধারা

মুক্তধারা ২২৪৩

প্রকাশক
বিজলী প্রভা সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
২২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা- ১১০০

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৫৮
নবম সংস্করণ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ২০১৩

প্রচ্ছদ শিল্পী : হাশেম খান

কম্পিউটার কম্পোজ
জননী কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রাকর
হেরা প্রিন্টার্স, ঢাকা- ১১০০

মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা

MAHABIDROHER KAHINI
[An Account of the Sepoy Mutiny]
By Satyen Sen
9th Edition : Amar Ekushe Grantha Mela 2013
Cover Design : Hashem Khan
Publisher : B.P.Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
22 Pyaridas Road, Dhaka- 1100, Bangladesh
Price : Taka 120.00
ISBN # 978-984-8857-74-8
E-mail: muktadhara1971 @ yahoo.com

Distributor in India : Puthipatra (Cal) Pvt. Ltd.
9 Anthony Bagan Lane, Calcutta-9
Distributor in UK : Sangeeta Ltd.
22 Brick Lane, London
Distributor in Canada : Bangla Kagoj, Toronto, Canada

উৎসর্গ

সুধীর ও কাঞ্চন বউদিকে

লেখকের অন্যান্য বই

মসলার যুদ্ধ
গ্রাম বাংলার পথে পথে
অভিযাত্রী
মানব সভ্যতার ঊষা লগ্নে
মেহনতী মানুষ
মনোরমা মাসীমা

উপন্যাস

অভিশপ্ত নগরী
রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ
সেয়ানা
আলবেরুণী
পাপের সন্তান
পুরুষমেধ
পদচিহ্ন
অপরাজেয়
মা
একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে
কুমার জীব
বিদ্রোহী কৈবর্ত
সাত নম্বর ওয়ার্ড
উত্তরণ

ছোটদের বই

পাতাবাহার
আমাদের পৃথিবী
এটমের কথা

মুখবন্ধ

ছেলেবেলায় স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে প্রথম পড়ি 'সিপাহী বিদ্রোহের' কথা। শুয়োর ও গরুর চর্বি-মাখানো টোটার প্রশ্ন নিয়ে ধর্মান্ধ সিপাইদের হিংস্র, নিষ্ঠুর রক্তারক্তির এক বিভীষিকাময় কাহিনী। সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে শেখাতে চেয়েছিল, যতটুকু শেখাতে চেয়েছিল, সেই ভাবেই এবং ততটুকুই লিখেছিলাম, তার বেশী নয়।

আজ বড় হয়েছি। এ শুধু ব্যক্তির কথা নয়, জাতির ক্ষেত্রেও তাই। জাতি আজ স্বাধীন। মুক্ত জাতির মুক্তবুদ্ধি নিয়েই আজ আমাদের অতীত শিক্ষা এবং ইতিহাসকে বিচার করতে হবে। সেদিন যা আমাদের শেখানো হয়েছিল, তাই কি সত্যি ? ১৮৫৭ কি শুধু সিপাইদের একটি বিশেষ রকমের টোটার বিরুদ্ধে অসন্তোষের প্রকাশ ? তার উপলক্ষ্য নিয়ে কি অসন্তুষ্ট সামন্ত নৃপতিগণই তাঁদের হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন ? টোটা আর সামন্ত নৃপতিদের ইচ্ছা অনিচ্ছার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ?

আজ নয়, সতর্ক সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু সেদিন বুঝতে পেরেছিল ১৮৫৭ শুধু সিপাইদের বিক্ষোভ নয়, ১৮৫৭ বন্দী উপমহাদেশের মুক্তি সাধনার প্রথম মহা আলোড়ন। পাছে এর তাৎপর্য ভারতের আপামর জনসাধারণের মুক্তি-সাধনার অপরাজেয় অনুপ্রেরণনার উৎস হয়ে দাঁড়ায়, তাই বৃটিশ শাসকবর্গ সচেতনভাবে ১৮৫৭ -র মহাবিদ্রোহের ইতিহাসকে বিকৃত করে সিপাইদের অন্ধ বিক্ষোভে এনে দাঁড় করল।

মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে ভারতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে ইতিমধ্যে বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা, আলোচনা ও সমালোচনার মধ্যে দিয়ে সেখানকার মানুষের কাছে বিষয়বস্তুটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদিক দিয়ে আমাদের পাকিস্তানের চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিকগণ জাতির সম্মুখে উল্লেখযোগ্য কিছুই উপস্থিত করেন নি।

বন্ধুবর সত্যেন সেন আমাদের এই অভাবকে পূরণ করার পথে প্রথম পদক্ষেপ করলেন। বই হিসেবে 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী'র গুণাগুণের প্রশ্ন ছাড়াও প্রধানত এই দিক দিয়েই আমি তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরিশ্রমে তিনি কার্পণ্য করেন নি। ঐকান্তিকতায় তিনি একনিষ্ঠ। একথা সত্য, ইতিহাস-রচনার প্রচেষ্টা নিয়ে তিনি এই বই তৈরি করেন নি। মহাবিদ্রোহের দিনক্ষণ, ধারাপঞ্জী এতে নেই। এ বই ইতিহাস নয়, কিন্তু নিজের জ্ঞাতসারে কোথাও তিনি ইতিহাসকে বিকৃত করতে যান নি। মহাবিদ্রোহের মধ্যে যে-উজ্জ্বল জীবন ছিল, তাকেই তিনি ইতিহাস থেকে অশেষ পরিশ্রমে উদ্ধার করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

পাণ্ডুলিপিতে যখন 'বিদ্রোহী মৌলবী', 'আজিমুল্লাহ্ খাঁ', 'পতিতা আজিজন', 'ঝাঁসীর রানী', 'এলাহাবাদের বিদ্রোহ', 'একটি গুপ্তচরের কাহিনী', 'বিদ্রোহী রোহিলা' প্রভৃতি অধ্যায়গুলো পড়ি তখন বিস্মৃতপ্রায় ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের আসমুদ্রহিমাচলব্যাপকতা, তার সর্বশ্রেণীসমন্বয়ে গণচরিত্র, তার খ্যাত অখ্যাত নায়ক-নায়িকাদের আত্মত্যাগ, তার সচেতন হিন্দু মুসলিম ঐক্যজোট এবং সর্বব্যাপী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলমুক্তির এই অক্ষয় স্মারক আমাকে বিস্মিত করে দেয়।

আমাদের এই গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে আমি মনে মনে গর্ববোধ না করে থাকতে পারি না।

বস্তুতঃ ১৮৫৭-কে নতুন করে সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন তাকে বিস্মৃতি ও বিকৃতির গর্ভ থেকে উদ্ধার করবার। বন্ধুবর সত্যেন সেনের এই প্রচেষ্টা আমাদের দেশের দেশপ্রেমিকদের হৃদয়ে প্রেরণা যোগাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ঢাকা   সরদার ফজলুল করিম

ডিসেম্বর, ১৯৫৭

ভূমিকা

'মহাবিদ্রোহের কাহিনী' সিপাহী যুদ্ধের শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৯৫৭ সালে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি ছোটো, কিন্তু এর মালমশলা সংগ্রহ করবার জন্য অনেক বইপত্র ঘেঁটেঘুঁটে দেখতে হয়েছিল। তাদের কয়েকটি নাম যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে; তাহলেও দু'টি বিষয়ের উল্লেখ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি। প্রথম কথা, 'ঝাঁসির রানী' অধ্যায়ে যে-কয়টি লোকগীতি দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে আমি শ্রীমতি মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য-রচিত 'ঝাঁসির রানী' বইটি থেকে নিয়েছি। দ্বিতীয়ত 'সভ্যতার অবদান' অধ্যায়ে কবি গালিবের যে মর্ম-স্পর্শী বিলাপ বাণী উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেজন্য আমি এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীঅশোক মেহতা রচিত 'দি গ্রেট রেভল্যূশন' বইটির বাংলা অনুবাদকদের কাছে ঋণী। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের কাছে আমার এই ঋণ স্বীকার করছি।

সত্যেন সেন

২৬/৬/৭১

ছায়া পূর্বগামিনী

১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দ। পলাশী যুদ্ধের মাত্র সাত বছর পরে।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিপাইদের বিদ্রোহ তামাম হিন্দুস্থানকে উথল করে তুলেছিল যার প্রচণ্ড আঘাতে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল বৃটিশের জয়স্তম্ভ তারই পূর্বগামিনী ছায়া দেখতে পাই ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে, পলাশী যুদ্ধের মাত্র সাত বছর পরে। কিন্তু এ ইতিহাস আমরা জানি না !

একজন সাধারণ গোরা সিপাই মাসিক বেতন পায় চল্লিশ টাকা আর একজন দেশী সিপাই পায় মাত্র ছয় টাকা। এই রেওয়াজ চলে আসছে কত দিন ধরে, কেউ তো এই নিয়ে কোন দিন কোন কথা বলে নি। এই অব্যবস্থাকেই স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে।

কিন্তু কিছুদিন থেকে হাওয়াটা কেমন যেন বদলে গেছে। বেঙ্গল আর্মি চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ ফেনিয়ে উঠেছে। একটা বেয়াড়া মনোভাব, একটা অসহিষ্ণু 'কেন'? বারে বারেই ঠেলে ঠেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে !

কেন, এই তফাৎ কিসের জন্য, কেন এই অবিচার ? আমরা কি ওদের চেয়ে কম কাজ করি ? পেটের দায়ে জীবন বিক্রি করে দিয়েছি, যখন তখন মরি, দলে দলে মরি—আমরা কি ওদের চেয়ে কম করে মরি ? তবে এই অবিচার কিসের জন্য ?

সিপাইদের মধ্যে প্রধান যারা, বিচক্ষণ যারা, এসব কথা শুনতে তারা ভয় পায়, বলে, কি যে বলে এসব চ্যাংড়ার দল, আছে বই কি তফাৎ, আছেই তো ! আমরা কালো ওরা গোরা, আমরা গোলাম ওরা মনিবের জাত। আরশোলা আর পাখী কি কখনো সমান হতে পারে !

ওরা এ কথায় কান পাততে চায় না। ক্ষেপে উঠে বলে, মানব না এই অবিচার। সমান কাজ সমান বেতন এটাই আমাদের দাবি। আমরা তো অন্যায় কিছু চাইছি না। আমাদের এ হক দাবি আদায় না করে আমরা ছাড়ব না।

—বুঝলাম, তোদের মরণ দশায় পেয়েছে, না মরে তোরা ছাড়বি না। মরবি তো, সেই সঙ্গে আমাদের শুদ্ধ মারবি।

ওরা বলে, মরণ তো একদিন আছেই, অত ভয় কিসের ?

যে কথা ভাবা যায় না, শেষে কিনা তাই ঘটল। উত্তেজিত সিপাইরা তাদের অফিসারদের ঘেরাও করে তাদের দাবি উপস্থিত করল।

—সমান কাজ সমান বেতন চাই! গোরা সিপাইরা যদি মাসে চল্লিশ টাকা করে পেতে পারে, আমরাই বা পাব না কেন ?

স্পর্ধা দেখে অফিসার সাহেবরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এদের হয়েছে কি? চোখ তুলে যারা মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারত না তাদের এত ধৃষ্টতা !

মনের রাগ মনেই চেপে রেখে একজন অফিসার মিষ্টি হাসি হেসে বললেন, "এ হলো গিয়ে আইনের ব্যবস্থা। আমরা কি করতে পারি বল, আমরা তো আর আইন ভাঙতে পারি না। এমন বে-আইনী দাবি কেমন করে তুলছ তোমরা ?"

"তোমাদের এ আইন আমরা বুঝি না সাহেব। এ মাইনে নিয়ে আমরা কাজ করব না—আমরা কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।"

মুখের হাসি দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গর্জন করে উঠলেন সাহেব।

"বটে, কাজ করবে না ! তোমাদের খুশী কিনা ! এটা মিলিটারী চাকরি, চুক্তি করে কাজে ভর্তি হয়েছে। ইচ্ছা করলেই চাকরি ছাড়া যায় না।"

সাহেবের ধমকে ওরা কিন্তু ভয় পেল না। ওরাও উত্তেজিত, একসঙ্গে সবাই মিলে কলরব করে উঠল, "আমরা ওসব চুক্তিটুক্তি বুঝি না, যেখানে কোন বিচার নেই, সেখানে আমরা কাজ করতে পারব না। চল ভাই সব, চল !"

"বটে, মিউটিনি! সিপাইদের ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে ! আচ্ছা, দেখ এবার মজাটা।"

বেছে বেছে চব্বিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হোল। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, এরা সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহ করবার ষড়যন্ত্র করছিল।

কোর্ট মার্শাল।

ছাপরার মিলিটারী কোর্টে বিচার শুরু হয়ে গেল। বিচার তো নয় প্রহসন।

সঙ্গে সঙ্গেই রায় বেরিয়ে গেল, এই চব্বিশ জন সিপাইকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

ময়দানে সমস্ত সিপাইরা এসে জড় হয়েছে। না এসে উপায় নেই, আসতেই হবে, চোখ মেলে দেখতেই হবে এই ভয়ানক দৃশ্য। এটাই নিয়ম।

চব্বিশ জন বীর বন্দীকে নিয়ে আসা হোল। ওরা আসছে, আর ওদের চব্বিশ জনের পায়ের শিকল ঝন্ ঝন্ করে সাজছে।

শত শত নিঃশব্দ সিপাইর বুকের মধ্যে কি এক আলোড়ন জেগেছিল সেদিন, তারাই শুধু জানে! আর সেই চব্বিশ জন বন্দী ? সংসার থেকে বিদায় নেবার শেষ মুহূর্তে কোন্ কথা তাদের মনে সবচেয়ে বেশী ভেসে উঠেছিল ? তাদের বাপ, মা,

ভাই, বোন, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের কথা ? না কি তারা দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলছিল—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ চাই। আমাদের সিপাই ভাইরা, আমাদের দেশের মানুষ, তারা কি কোন দিন এর প্রতিশোধ নেবে না ?

চারটি কামান সাজানো ছিল।

মেজর জেনারেল মুনরো এগিয়ে এসে অর্ডার দিলেন। প্রথমে চার জন বন্দীকে নিয়ে এসে প্রত্যেককে এক একটি কামানের মুখে বেঁধে দেওয়া হোল। চারটা কামান একসঙ্গে গর্জন করে উঠল।

তারপর আরও চার জন। তারপর আরও। এইভাবে চব্বিশ জন বন্দী শহীদ হলেন।

নিস্তব্ধ জনতা নিঃশব্দ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।

সেদিন থেকে ৯৩ বছর পরে সিপাহিদের নেতৃত্বে ভারতীয় জনগণের এই মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হোল। যে-কঠিন রক্তাক্ত প্রতিশোধ সেদিন নেওয়া হয়েছিল, ইতিহাসের পাতা থেকে তার দাগ কোনদিন মুছবে না।

১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দের বীর শহীদেরা, তোমরা তৃপ্ত হয়েছে তো ?

আজিমুল্লাহ্ খাঁ

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা অবশ্যই আজিমুল্লাহ্ খাঁর নাম জানেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস-সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানটুকু আছে, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। কাজেই শিক্ষিতই বলুন আর অশিক্ষিতই বলুন, ক'জনেই বা শুনেছেন আজিমুল্লাহ্ খাঁর নাম! বিদ্রোহকে প্রথম থেকে সচেতনভাবে সংগঠিত করে তোলবার ব্যাপারে যে-ক'জন লোক অগ্রগামী ছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন। তখনকার দিনে আমাদের দেশে প্রতিভা, কুটবুদ্ধি ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টির দিক থেকে তাঁর সাথে তুলনা করবার মত দ্বিতীয় একজন লোক আমাদের চোখে পড়ে না।

কূটনৈতিক বৃটিশ তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী চিনতে ভুল করে নি। তাই তাদের ক্রোধ, ঘৃণা ও কটূক্তি তীব্রভাবে বর্ষিত হয়েছে তাঁরই উপরে। বৃটিশ ঐতিহাসিকদের লেখায় তাই আমরা দেখি, আজিমুল্লাহ্ খাঁ ধূর্ত, নৃশংস ও রক্তপিপাসু। কিন্তু এই কি তাঁর পরিচয় ?

রূপকথার কাহিনীর মতই বিস্ময়কর আজিমুল্লাহ্ খাঁর জীবন।

নিতান্ত গরীবের ঘরে জন্ম। দুমুঠো ভাত জুটবে এমন সঙ্গতি নেই। বয়স তখন খুবই কম, শিশু বললেই চলে। আর সবাই যে-বয়সে খেলাধূলো নিয়ে মেতে থাকে, কঠিন জীবন-সংগ্রামের জন্য তখন তাঁকে বাধ্য হয়ে এক ইংরাজ সাহেবের বাড়ীতে বয়ের কাজে ঢুকতে হোল।

ছেলেবেলা থেকে সাহেববাড়ীতে বয় ও খানসামার কাজ করবার ফলে বহু সাহেবের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয়েছে। এই প্রিয়দর্শন তরুণ খানসামাটি অতি সহজেই সকলের মন জয় করে নিতে পারত। আজিমুল্লাহ্ এই সুযোগটিকে কাজে

লাগাতে ছাড়লেন না। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি ইংরাজী ও ফরাসী এই দুটো ভাষাতেই দিব্যি কথা বলতে শিখে গেলেন। শুধু কি কথা বলা, এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার ফলে তিনি সাহেবী সমাজের চালচলন, আদবকায়দা বেশ ভালভাবেই রপ্ত করে ফেললেন। পরবর্তী জীবনে এটা তাঁর খুবই কাজে লেগেছে।

একদিন যাঁকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করতে হবে খানসামা-বাবুর্চির কাজের মধ্যে তাঁকে আটকা থাকলে চলে না। বাইরের জগতের আলো-বাতাসের সংস্পর্শ পাবার জন্য মন তাঁর উন্মুখ হয়ে উঠল। কিন্তু পড়াশোনা না করতে পারলে কি করেই বা তা সম্ভব হবে !

যে করেই হোক, পড়াশোনা করা চাই।

বাবুর্চিখানা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন আজিমুল্লাহ্। কানপুরের একটা স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলেন। সেখানে ওস্তাদ গাঙ্গাদীনের কাছে তাঁর যথারীতি ইংরাজী শিক্ষা শুরু হোল। ওস্তাদজীর হাতে এমন ছাত্র আর কোনদিন আসে নি। ছাত্র হিসেবে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিলেন তিনি। ফলে সে স্কুলেই তাঁকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে নেওয়া হোল। কৈশোরের খানসামা তরুণ শিক্ষক আজিমুল্লাহ্ খাঁ শিক্ষকতার কাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। এর পর আজিমুল্লাহ্ খাঁ যখন সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন তখন শিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সমস্ত কানপুরে ছড়িয়ে পড়েছে।

তাঁর এ খ্যাতি নানা সাহেবের কানে গিয়ে পৌঁছল। বহু লোকের কাছে তাঁর কথা শুনে তিনি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। এক শুভলগ্নে দুজনের পরিচয় ঘটল। এটি নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় দিন। পরিচয় শেষে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হোল।

নানা সাহেবের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে নানা সাহেব কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতেন না। দুজনের ভিতরকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ভবিষ্যতে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

এ সময় নানা সাহেবের জীবনে এক গুরুতর সংকট দেখা দিল। পেশোয়া বাজীরাও কোম্পানীর নিকট থেকে পেনসন ভোগ করে আসছিলেন। বাজীরাওয়ের

মৃত্যুর পর কোম্পানী এ পেনসন দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। দত্তক পুত্র হিসেবে নানা সাহেবের অধিকার তাঁরা অগ্রাহ্য করলেন। পেনসনের দাবি করে নানা সাহেব কোম্পানীর কাছে দরখাস্ত পাঠালেন। কিন্তু সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়ে গেল।

নানা সাহেব তাতেও দমলেন না। খাস বিলাতে এ মামলা নিয়ে লড়বার জন্য নিজের প্রতিনিধি পাঠাবেন বলে স্থির করলেন। এ বিষয়ে আজিমুল্লাহ্ খাঁর চেয়ে যোগ্যতর লোক কেই বা আছে !

তাই ঠিক হোল। আজিমুল্লাহ্ই যাবেন।

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে এ মামলাটার একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য নানা সাহেবের প্রতিনিধি আজিমুল্লাহ্ খাঁ বিলাত যাত্রা করলেন।

তাঁর সঙ্গে সেদিন ক'জন ছিলেন বা কে কে ছিলেন, সে খবর আমরা জানি না। কিন্তু একজনের নাম জানতে পারা গেছে। তিনি হচ্ছেন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার মহম্মদ আলী খাঁ। জনসাধারণের কাছে তাঁর নাম সুপরিচিত না হলেও, বিদ্রোহের ব্যাপারে তাঁর অবদান যথেষ্ট ছিল। সে পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাঁর কাহিনী অন্যত্র বলা

হয়েছে।

লন্ডনে এসে পা দেবার কিছু দিনের মধ্যেই তাঁকে নিয়ে বেশ একটু সাড়া পড়ে গেল। মণিমুক্তায় সজ্জিত ভারতীয় 'রাজা'কে দেখবার জন্য লন্ডনের পার্কে ও ব্রাইটনের সমুদ্র উপকূলে দস্তুরমত ভীড় জমে যেত। আজিমুল্লাহ্ ইংরাজ সমাজের চালচলন, আদব-কায়দা সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাঁর সুশ্রী চেহারা, সুমিষ্ট কণ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক আলাপের গুণে লন্ডনসমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠতে তাঁর বেশী দিন লাগল না। একথা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে, ঐশ্বর্যের গন্ধে আকৃষ্ট অসংখ্য শ্বেত মধুমক্ষিকার দল সেদিন তাঁর চার দিক ঘিরে গুঞ্জরণ করে চলছিল।

নিজের কাজ হাসিল করবার জন্য তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। পানির মত অজস্র টাকা তিনি ঢেলে চলেছিলেন। সেখানকার রেওয়াজ-অনুযায়ী তিনি বড় বড় সামাজিক মজলিস জমাতেন, শহরের সেরা সেরা লোকদের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসতেন। তাঁর আশা ছিল এ সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের হোমরা চোমরাদের উপর বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন এবং তারই মধ্য দিয়ে মামলাটারও সুরাহা করবার একটা পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

আজিমুল্লাহ্‌র জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। বিশেষ করে সেখানকার মহিলা সমাজে তিনি আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর রূপ ও ঐশ্বর্যের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্য অনেক পতঙ্গই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কেউ কেউ বা জ্বলন্ত পাখায় ছটফট করে মরছিল। তিনি হিন্দুস্থানে ফিরে আসবার পরেও অনেক ইংরাজ তরুণী তাঁর কাছে প্রেমপত্র দিতেন। জেনারেল হ্যাভলক যখন নানা সাহেবের মূল

আস্তানা বিঠুর অধিকার করে আজিমুল্লাহ্‌র বাসগৃহ ভস্মসাৎ করে দিয়েছিলেন, সে সময় তিনি 'ডার্লিং আজিমুল্লাহ্'র কাছে লেখা কয়েকটি ইংরাজ তরুণীর প্রেম-পত্রের সন্ধান পান। বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা-যে আজিমুল্লাহ্‌র সম্পর্কে এত বেশী খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন, তার কিছুটা কারণ হয়তো এর মধ্যেও নিহিত ছিল।

কিন্তু ইংরাজ তরুণীদের মন তাঁর দিকে যতই ঝুঁকে পড়ুক না কেন, তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কঠিন মনোভাবের এক চুল পরিবর্তন করতে পারেন নি। অজস্র অর্থ ব্যয়, যুক্তিতর্ক, প্রকাশ্য গোপন কর্মকৌশল সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে গেল। এ সম্পর্কে কোম্পানী-যে কতদূর পর্যন্ত এক রোখা ও অনমনীয়, আজিমুল্লাহ্ আগে তা কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁর পক্ষের যুক্তি যতই সারবান ও প্রখর হোক না কেন, দেশ বিদেশের জনমত যাই বলুক না কেন, ভারতের কোন দেশীয় রাজা বা তাঁর প্রতিনিধির পক্ষে লর্ড ডালহাউসীর এ রায়কে বাতিল করবার চেষ্টা নেহাত পন্ডশ্রম মাত্র। এ প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করবার সামান্য সম্ভাবনাটুকু মাত্র ছিল না।

সকল যুক্তির বড় যুক্তি হচ্ছে বাহুবল, নগদ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ব্যয় করে আজিমুল্লাহ্ খাঁ এ সার সত্যটিকে শিখতে পেরেছিলেন। এ শিক্ষা তাঁর কাজে লেগেছিল।

কোম্পানীর বড় কর্তারা কিছুদিন পর্যন্ত একথা সেকথা বলে শেষ পর্যন্ত তাদের বাঁধা গৎ-এ এর সাফ জবাব জানিয়ে দিলেনঃ

'বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্রের পৈতৃক পেনসনের কোন দাবি থাকতে পারে না, গভর্নর জেনারেলের এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমরা ষোল আনা একমত।"

কোম্পানীর কাছ থেকে এ কঠিন ঘা খেয়ে আজিমুল্লাহ্ নতুন করে চেতনা লাভ করলেন। যে-জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোনই ধারণা ছিল না সে সম্পর্কে দৃষ্টি খুলে গেল। কানপুরে বসে ইংরাজী শিখেছিলেন, আর বিলাতে এসে ইংরাজকে বুঝতে শিখলেন। বুঝতে পারলেন, এ পথে কার্য সিদ্ধ হবে না। এ ছাড়া আর কোন পথ কি আছে ?

সে একই সময়ে আর একজন ভারতীয় লন্ডনে বসে ঠিক এ কথাই ভাবছিলেন, আর কোন পথ কি আছে ? তাঁর নাম রঙ্গ বাপুজী। আজিমুল্লাহ্‌র মতই তিনিও এসেছিলেন সাতারার রাজার পক্ষ থেকে কোম্পানরি কাছে দরবার করবার জন্য। সেখানেও এ একই সমস্যা। অনেক দরখাস্ত, আবেদন, নিবেদন, তদ্বির কোন কিছুতেই কিছু হোল না। আজিমুল্লাহ্‌র মতই তিনিও কোম্পানীর পক্ষ থেকে সাফ জবাব পেয়ে গেলেন।

ব্যর্থতা থেকে হতাশা, হতাশা থেকে প্রতিহিংসা! দুজনে একই তরণীর যাত্রী। পেশোয়ার প্রতিনিধি আর সাতারার প্রতিনিধির মধ্যে ঘন ঘন আলাপ আলোচনা আর বন্ধ দ্বারে গোপন পরামর্শ চলত। সেদিন বিঠুরের খান সাহেব আর সাতারার বাপুজীর

মধ্যে কি নিয়ে গোপন পরামর্শ চলেছিল, ইতিহাস সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে পারে না। কে জানে, সেদিন আবেদন নিবেদনের বিকল্প হিসেবে তাঁদের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রাথমিক আলোচনা চলেছিল কিনা। লোকে তো তাই বলে।

রঙ্গ বাপুজী লন্ডন থেকে সোজা সাতারা ফিরে গেলেন। কিন্তু আজিমুল্লাহ্‌র পথ আলাদা। ইউরোপীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল লন্ডন। এখানে এসে বৃহত্তর পৃথিবীর হাল চাল কিছুটা তাঁর নজরে এল। নতুন চিন্তায় চঞ্চল হয়ে উঠল তাঁর মন। বৃটিশ রাজত্বের ছত্রচ্ছায়ার নীচে ভারতবর্ষের জমিনে বসে এ অভিজ্ঞতা লাভের কোনই সুযোগ ছিল না। বাস্তব কত রকমের কত চিন্তা, কত কল্পনা তাঁর মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করতে লাগল। ব্যর্থ মনে, শুধু একরাশ হতাশা নিয়ে তিনি দেশে ফিরে যেতে রাজী নন।

নিজের চোখে একবার দেখে নেব নতুন দুনিযার রূপটা। দেখে যাব ইংরাজের শক্তির উৎসই বা কোথায়, দুর্বলতাই বা কোথায়। ওদের দুর্গের কোথায় কোথায় ভাঙ্গন ধরেছে, খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। ইংরাজের মিত্রই বা কারা আর শত্রুই বা কারা ? শুধু পুঁথিপত্রের সাহায্যে নয়, নিজের হাতে বাজিয়ে দেখে নিতে হবে।

দেশে ফেরবার আগে ইউরোপ ভ্রমণের পেছনে এ রকমের ভাবনাই বোধ হয় কাজ করেছিল আজিমুল্লাহ্‌র মনে।

প্রথমে গেলেন তুরস্কের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল্-এ। তুরস্কের সুলতান তখন মুসলিম জগতের খলিফা। সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানেরা তুরস্কের প্রতি ধর্মীয় আনুগত্য বহন করে। কনস্ট্যান্টিনোপল্-এ গিয়ে আজিমুল্লাহ্ জানতে পারলেন যে, তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। 'তুরস্কের মিত্রপক্ষ ইংরাজ সেবাস্তোপলের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে রাশিয়ার কাছে দারুণ মার খেয়েছে। দু'পক্ষের বলাবল নিজের চোখে পরখ করে দেখবার জন্য তিনি কিছুদিন রাশিয়ায় গিয়ে রইলেন।

রাশিয়া কি এশিয়ার ক্ষেত্রে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে! যদি তাই হয়, তা হলে বৃটিশের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গে কোনরূপ আক্রমণমূলক বা আত্মরক্ষামূলক সন্ধি করা যায় কিনা ? কোন কোন বৃটিশ ঐতিহাসিক বলেছেন যে, এ মতলব নিয়েই আজিমুল্লাহ্ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। এ দেশের লোকদেরও সে রকম ধারনাই ছিল। সিপাইদের বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকে প্রকাশ্যে বলাবলি করতে আরম্ভ করল যে, নানা সাহেব রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। রাশিয়ার সৈন্যরা ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তৈরি হয়েই আছে।

আজিমুল্লাহ্ যখন রাশিয়ায় ছিলেন, তখন লন্ডন টাইমসের সংবাদদাতা মিঃ রাসেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তখন রাশিয়ানদের সঙ্গে ইংরাজদের লড়াই চলছিল ১৮ই জুন তারিখে ইংরাজ ও ফরাসীদের মিলিত বাহিনী রাশিয়ান বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এ খবর পেয়ে আজিমুল্লাহ্ ইংরাজদের শিবিরে এসে মিঃ রাসেলের সঙ্গে দেখা করেন।

মিঃ রাসেল বেরিয়ে আসতেই আজিমুল্লাহ্ বললেন, "সিবাস্তোপল শহরে ইংরাজ ও ফরাসীদের হার মানতে হয়েছে। আমি সে বিখ্যাত শহরটিকে একবার দেখতে চাই। আর আমি দেখতে চাই রুস্তমের মত বীর সে রাশিয়ানদের, যারা ইংরাজ ও ফরাসীদের হটিয়ে দিয়েছে।"

আজিমুল্লাহ্‌র এ আগ্রহ মেটাবার জন্য মিঃ রাসেল তাঁকে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। রাশিয়ানদের কামানগুলো অবিশ্রান্ত গর্জন করে চলেছে, আজিমুল্লাহ্ কৌতূহলের সঙ্গে সে দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ একটা কামানের গোলা প্রচন্ড শব্দ করে তাঁর কাছে এসে ফেটে পড়ল। কিন্তু তিনি একটুও নড়লেন না, যেমন ছিলেন তেমনি নিঃশব্দে বসে রইলেন।

সেদিন আজিমুল্লাহ্ মিঃ রাসেলের তাঁবুতেই রাত্রি যাপন করেন। তাঁবু থেকে বাড়ী ফিরে যাবার সময় তিনি মিঃ রাসেলকে বললেন, "দেখুন মিঃ রাসেল, রাশিয়ানদের এ সুরক্ষিত ঘাঁটিটিকে আপনারা কখনও দখল করতে পারবেন কিনা, সে বিষয়ে আমার মনে খুবই সন্দেহ আছে।"

পরদিন আজিমুল্লাহ্ ও তাঁর সঙ্গী ইঞ্জিনিয়ার মহম্মদ খাঁ সিবাস্তোপল থেকে আবার কনস্ট্যান্টিনোপল্-এ ফিরে এলেন। এখানে কয়েকজন রুশ এজেন্টের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। তাঁরা তাঁদের ভরসা দিয়ে ছিলেন যে, হিন্দুস্থানে ইংরাজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাগিয়ে তুলতে পারলে রুশ সরকার বিদ্রোহীদের মুক্ত হস্তে সাহায্য দেবেন।

যে-কল্পনা নিয়ে আজিমুল্লাহ্ লন্ডন ছেড়ে ইউরোপ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন, এবার যেন তা একটু একটু করে দানা বেঁধে উঠতে লাগল। তাঁর সঙ্গী মহম্মদ আলী খাঁ বলেছেন ঃ রুশ এজেন্টদের কাছে সামরিক সাহায্য পাবার আশ্বাস পেয়েই আজিমুল্লাহ্ আর আমি ভারতব্যাপী বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলবার সংকল্প গ্রহণ করলাম।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে এই সময়টা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এ হচ্ছে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের কথা।

তুরস্ক ও রাশিয়া ত্যাগ করে আজিমুল্লাহ্ বিপ্লবের ইন্ধন সংগ্রহ করবার জন্য আর কোন্ কোন্ দেশে গিয়েছিলেন সে কথা জানবার কোন উপায় আজ নেই। তাঁর এই ভ্রমণের ফলাফল কি হয়েছিল,তাও আমরা জানি না। শোনা যায় চন্দননগরের ফরাসীদের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যেতে পারে কিনা এ সম্পর্কে ফরাসী সরকারের সঙ্গেও নাকি কথাবার্তা চালিয়েছিলেন। মিসরের সঙ্গেও নাকি এ বিষয়ে কিছুটা আলাপ হয়েছি। সম্ভত এ কথার পেছনে কিছুটা সত্যতা আছে।

ইউরোপ পর্যটন শেষ করে আজিমুল্লাহ্ দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু যে আজিমুল্লাহ্ নানা সাহেবের প্রতিনিধি হয়ে তাঁর মামলার তদবির করতে বিলাত

গিয়েছিলেন এ আজিমুল্লাহ্ সে আজিমুল্লাহ্ নন। ইংরাজের মন জয় করে কাজ বাগিয়ে আনতে গিয়েছিলেন যিনি তিনি ফিরলেন বৃটিশ রাজত্ব ধ্বংসের ব্রতে ব্রতী হয়ে।

সুদূর কনস্ট্যান্টিনোপল্-এ বসে একদিন যে-অভ্যুত্থানের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, তাকে আজ কাজে রূপ দিতে হবে। একি সহজ কাজ ? ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোটি কোটি জনসাধারণ যে আহ্বানে আকুল ও উদ্বেল হয়ে উঠবে কোথায় সে আদর্শ ? কোথায় সে দেশব্যাপী সংগঠন ? কোথায় সে নেতৃত্ব ? কিন্তু জাতি অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, চলার মধ্যে দিয়ে, ভাঙ্গাগড়া, আঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, নতুন চেতনা, নতুন প্রকৃতি, নতুন বেগ সংগ্রহ করে সম্মুখে এগিয়ে চলতে থাকে।

এ পথ সহজ নয়। অনেক দুঃখ, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পথ কেটে চলতে হয়। বৃটিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষের জমিন প্রস্তুত হয়েই ছিল।

আজিমুল্লাহ্ এবার কাজে হাত লাগালেন।

শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯-এ মার্চ। পুঞ্জীভূত অসন্তোষের ঘনকৃষ্ণ আকাশে প্রথম বিদ্যুদ্দীপ্তি। বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামে প্রথম শহীদের আত্মদান! মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে এ তারিখ চিরস্মরণীয়। বিদ্রোহের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডেকে স্মরণ করে মাথা নত কর।

রবিবারের অপরাহ্ন। ব্যারাকপুরের প্যারেড ময়দানে এমন অসময়ে আজ কিসের ভীড়। ৩৪ নং ইনফ্যানন্ট্রির সিপাইরা আজ দলে দলে জটলা পাকাচ্ছে। এখানে ওখানে সেখানে একটা ফিসফিস চাপা গুঞ্জনের শব্দ উঠছে। সিপাইদের মধ্যে কেউ কেউ ডিউটির পোশাক পরে এসেছে, কেউ বা খালি গায়ে, কেউ অস্ত্র হাতে, কেউ বা নিরস্ত্র। লোকের ভীড় ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সকলের দৃষ্টি একই দিকে ঝুঁকে পড়েছে। উত্তেজনায় সবাই যেন টগবগ করে ফুটছে।

লাইন থেকে পঞ্চাশ ষাট হাত দূরে মঙ্গল পাণ্ডে বন্দুক কাঁধে নিয়ে টহল দিয়ে ফিরছেন। ময়দানে যারা এসে ভীড় জমিয়েছে, সবাই চেয়ে আছে তাঁরই দিকে, তাঁরই কথা নিয়ে সবাই কানাকানি করছে।

ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ, ধীর স্থির প্রকৃতি নিজের স্বভাবের গুণে সকলের কাছে জনপ্রিয় মঙ্গল পাণ্ডেকে না চেনে কে! সেই প্রতিদিনের অতিপরিচিত মঙ্গল পাণ্ডে

আজ কি এক নতুন মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছেন, তাঁকে চেনা যায়, আবার যেন চেনাও যায় না। কে জানে কোন দেবতা তাঁর উপর এসে ভর করেছে! কানে কানে সবাই সে কথাই বলাবলি করছিল।

উদ্ধত চিবুক আকাশের দিকে তুলে গুলিভরা বন্দুক কাঁধে নিয়ে মঙ্গল পাণ্ডে একবার সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন আবার পিছিয়ে আসছেন।

হঠাৎ তীক্ষ্ন কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠলেন ঃ 'বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো

ভাইসব! ফিরিঙ্গীর পায়ের তলায় আর কতদিন পড়ে থাকবে! ওরা আমাদের সোনার দেশ লুটে পুটে খাচ্ছে, আর আমরা মরছি না খেয়ে। ওরা আমাদের ধর্মের উপর হাত দিয়েছে, আমাদের জাতিভ্রষ্ট করেছে। ভাইসব, ফিরিঙ্গীদের মারো, একটা একটা করে সব ব্যাটাকে মারো; ফিরিঙ্গীদের খতম করে দেশকে স্বাধীন কর।"

"হক কথা বলেছে, ন্যায্য কথা বলেছে; পাণ্ডে তো মিছে বলে নি," কয়েকজন মন্তব্য করে। মঙ্গল পাণ্ডের এই ডাক, কি অদ্ভুত তাঁর শক্তি? সিপাইদের মস্তিষ্কে যেন আগুন ধরে যায়, উত্তেজনায় স্নায়ুগুলি টনটন করে ওঠে! সামান্য ক'টাকা মাইনের সিপাই, পোশাক পরে পোশাক খোলে, নিয়মিত ময়দানে গিয়ে প্যারেড করে, লড়াই লাগলে জান দেয় জান নেয়; তাদের মধ্যে তো এ সমস্ত উপসর্গ ছিল না। ওদের আজ হয়েছে কি? কিসের এক অন্ধ আবেগে ওদের প্রাণ দুলে দুলে ওঠে, এতদিনের জমাট কঠিন বরফের স্তূপ অকস্মাৎ উন্মাদিনী নির্ঝরিণীর রূপ ধরে পাহাড়ের পাষাণ প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরতে চায়! কি অদ্ভুত এই উন্মাদনা, কি এর নাম! মূর্খ সিপাই তার কি জানে?

এ কি দেশপ্রেম, আহত ধর্ম-বিশ্বাস, অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া না এ কি?

'বেরিয়ে এসো ভাইসব! দেশ আর ধর্মের এই দুশমনদের খতম কর।'

মঙ্গল পাণ্ডে কি যাদু জানেন! কি দুর্নিবার তাঁর এই আহ্বান।

কিন্তু তবু, তবু তারা আসতে পারে না। কোথায় যেন একটা প্রবল বাধা, একটা অদৃশ্য শৃঙ্খল যেন তাদের বেঁধে রেখেছে। অস্থির হয়ে ওঠে প্রাণ, ছটফট করে, তবু তারা বেরিয়ে আসতে পারে না। এতদিনকার অভ্যস্ত সামরিক শৃঙ্খলাবোধ, প্রভুভক্তি, নিমকের মর্যাদা, অভ্যস্ত জীবনের প্রতি মোহ, আশঙ্কা, আতঙ্ক সব কিছুই রক্তের মধ্যে মিশে আছে—ছাড়তে চাইলেও ছাড়ানো যায় না।

এই দোটানার মধ্যে পড়ে তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ রাস্তায় ঘোড়ার খুরের টগবগ শব্দ শোনা গেল। সবাই কৌতূহলী দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকায়। মঙ্গল পাণ্ডের খবর শুনে এ্যাডজুট্যান্ট লেফটেন্যান্ট বাগ

ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এসেছেন। তাঁর কোমরবন্ধে গুলিভরা পিস্তল কোমরে ঝুলছে তরোয়াল। বিদ্রোহের এই সূচনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে, তাঁর দুই চোখে তারই দৃঢ় কঠিন সংকল্প।

সামরিক হুকুমতের প্রতীক ওই লাল কোটটি। কি আশ্চর্য ওর শক্তি। ওর দিকে তাকালেই অনিচ্ছা-সত্ত্বেও চোখের পাতা নেমে আসতে চায়। লেফটেন্যান্ট বাগের লাল কোট ক্রমশই আগে আরও আগে এগিয়ে আসছে।

উত্তেজনা আর এক পর্দা উপরে উঠল। সিপাইরা মনে মনে অনুভব করছে এখনই সাংঘাতিক ঘটনা একটা কিছু ঘটে যাবে। বিদ্রোহ মোকাবিলা করছে সামরিক শৃঙ্খলার সঙ্গে, কে জানে কি ঘটবে তার পরিণতি! এক বিচিত্র অভিনয় এখনই অভিনীত হবে। এখনই যবনিকা উদঘাটিত হবে—নির্বাক স্তব্ধদর্শকগণ অধীর চিত্তে মুহূর্ত গুণছে।

যেদিকে তাকাও সবার মনই অস্থির চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত। এর মধ্যে একমাত্র মঙ্গল পাণ্ডে স্থির অবিচলিত। ধীর শান্তভাবে কি করে আসন্ন বিপদের মোকাবিলা করতে

হয়, মঙ্গল পাণ্ডে তা জানেন।

মঙ্গল পাণ্ডে একবার হাঁটা বন্ধ করে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। হঠাৎ নিস্পন্দ হয়ে গেলেন। ঘোড়াটা কদমে কদমে এগিয়ে আসছে। আর সোজা তার দিকে মুখ করে কাঁধে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মঙ্গল পাণ্ডে। ব্রোঞ্জের মূর্তির মত অচল অটল। সায়াহ্নের শেষ রোদটুকু লুটিয়ে পড়েছে তাঁর চোখে মুখে ললাটে।

লেফটেন্যান্ট বাগের ঘোড়া সোজা তার গায়ের উপর এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডের বন্দুক গর্জন করে উঠল। ঘোড়াটা একটা পাক খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। গুলিটা ঘোড়ার পায়ে লেগেছে। ঘোড়া আর তার সওয়ার জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়ে গেল। সে অবস্থাটাতেই মাত্র দশ কদম দূর থেকে লেফটেন্যান্ট বাগ তাঁর পিস্তল তাক করলেন। পিস্তলের মুখে একটা লাল শিখা একটু ঝিলিক মেরে উঠল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল পাণ্ডের তলোয়ারের ঘায়ে লেফটেন্যান্ট বাগ ধরাশায়ী হলেন।

আবার শোনা গেল দ্রুত পায়ের শব্দ। লেফটেন্যান্ট বাগের পেছন পেছন ছুটে এসেছেন সার্জেন্ট মেজর। পাণ্ডের তৃষ্ণার্ত তলোয়ার আর একবার নেচে উঠল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সার্জেন্ট মেজর লেফটেন্যান্ট বাগের পাশেই ধূলিশয্যা নিয়ে চিরতরে চোখ বুজলেন।

একি অদ্ভুত ঘটনা! এমন কথা কেউ কখনও ভাবতে পেরেছেন! উত্তেজিত সিপাইদের চোখে নতুন দীপ্তি খেলা করে গেল। দু' দুজন দুর্দান্ত গোরা অফিসার মারা পড়ল কিনা তাদেরই মত একজন কালো সিপাইর হাতে! এও তবে সম্ভব!

বাহাদুর মঙ্গল পাণ্ডে! সিপাইদের মধ্যে উল্লাসধ্বনি উঠল।

২১

ইতিমধ্যে কয়েকজন ইংরাজ অফিসার ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন। কর্ণেল হুইলার আদেশ দিলেন, পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করো। কোন সিপাই নড়ল না। কারো কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডে সোজা জবাব দিলেন, 'পাণ্ডের গায়ে আমরা কেউ হাত দেব না।'

নির্ভীক পাণ্ডে কাঁধে বন্দুক নিয়ে তেমনি অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। সিপাইদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন তাঁরই দিকে।

কর্ণেল সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, অবস্থা বেগতিক। এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে এ দরনের ধৃশ্য অবলোকন করা মোটেও প্রীতিপ্রদ নয়, নিরাপদও নয়। তার চেয়ে উপরওয়ালাদের কাছে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তিনি বুদ্ধিমানের কাজই করলেন।

সংবাদ পেয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিয়ার্সে হন্তদন্ত হয়ে চুটে এলেন। জেনারেল হিয়ার্সে দেখলেন দুটি লাল কোট ধূলায় লুটোপুটি খাচ্ছে। বিজয়ী মঙ্গল পাণ্ডে উদ্ধত ভঙ্গিতে বন্দুক কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে। সিপাইদের চোখে মুখে উত্তেজনা।

জেনারেল হিয়ার্সে তৎপরতার সঙ্গে কয়েকজন অফিসার নিয়ে বিদ্রোহীকে ঘেরাও করে ফেললেন।

মঙ্গল পাণ্ডে সম্ভবত মনে মনে আশা করছিলেন সংকটের সময় বন্ধুরা তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ যখন এল না, যখন দেখলেন শত্রুর হাতে মৃত্যু অবধারিত, তখন তিনি সেই মুহূর্তেই তাঁর শেষ করণীয় স্থির করে

ফেললেন।

কেউ লক্ষ্য করতে না করতে বিদ্যুদ্‌গতিতে কাজটা শেষ হয়ে গেল। বন্দুকের নলটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরে পায়ের আঙ্গুল দিয়ে ট্রিগারটা টেনে দিলেন। গুলিবিদ্ধ মঙ্গল পান্ডে মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয় নি। অনেক চেষ্টা করে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলা হোল যথোচিত আড়ম্বরের সঙ্গে ফাঁসি দেবার জন্য।

৮-ই এপ্রিল তারিখে মঙ্গল পান্ডে ও ঈশ্বরী পান্ডেকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মঙ্গল পান্ডেকে গ্রেপ্তার করতে অস্বীকার করে ঈশ্বরী পান্ডে উপরওয়ালার হুকুম অমান্য করেছিলেন এ অপরাধে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়।

বিদ্রোহী মঙ্গল পান্ডের এ বীরত্বপূর্ণ কাহিনী সমস্ত ব্যারাকপুরে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনা এ অঞ্চলের মানুষের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। ফাঁসির আগে যখন ঘাতকের জন্য খোঁজ করা হোল, ব্যারাকপুরের কোন লোক এ কাজ করতে রাজী হোল না। তখন কি আর করা? বাধ্য হয়ে কলকাতা থেকে চারজন জল্লাদ আনিয়ে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়েছিল।

মঙ্গল পান্ডে নিজের জীবন দান করে বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। স্বাধীনতার সৈনিকেরা এ মশালের আলোয় পথ দেখে চলেছেন। ইংরাজরা তাঁর কথা ভুলতে পারে নি। মঙ্গল পান্ডের নাম অনুসরণ করে তারা বিদ্রোহীদের নাম দিয়েছিল "পান্ডিয়া"।

মঙ্গল পান্ডের, এ নির্ভীক আত্মোৎসর্গের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা অনেকেই বলেছেন যে, মঙ্গল পান্ডে ভাঙের নেশায় উন্মত্তপ্রায় হয়ে এ কাজ করেন। মঙ্গল পান্ডের দেশের মানুষ কিন্তু মনে করে মঙ্গল পান্ডে নেশায় উন্মত্ত হয়ে এ কাজ করেছিলেন একথা ঠিকই, নেশা না হলে এমন কাজ কেউ করতে পারে না। তবে সে নেশা দেশপ্রেমের নেশা।

ব্যারাকপুরের কোর্টের সম্মুখ দিয়ে প্যারেড রোড চলে গেছে। এ রাস্তা বরে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলো। আধ মাইল দূরে রেল লাইনের পাশেই একটি ঐতিহাসিক অশ্বত্থ গাছ দেখতে পাবে। গাছটি বহু প্রাচীন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৮ই এপ্রিলের সকাল দশটায় মঙ্গল পান্ডেকে এ গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়া হয়। গত একশো বছর ধরে একটি পবিত্র জীবনের নিঃস্বার্থ আত্মাহুতির কালজয়ী স্মৃতিকে বহন করে গাছটি আজও দাঁড়িয়ে আছে।

বিদ্রোহের প্রচার বাহিনী

একথা প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল গ্রাম থেকে গ্রামে প্রদেশ থেকে প্রদেশে সমস্ত ভারতময়। হিন্দ মুসলমান সকলের মধ্যেই একথা ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোট বড় সবাই একথা জানত। হাটে মাঠে ঘাটে সর্বত্র এ আলোচনা চলতঃ পলাশী যুদ্ধের একশো বছর পরে,১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩-এ জুন ফিরিঙ্গীদের রাজত্ব খতম হয়ে যাবে, দেশ আবার দেশের মানুষদের হাতে ফিরে আসবে।

কে প্রথম একথা প্রচার করেছিল, কেউ তা' বলতে পারে না। কোন ফকীর, কোন সন্ন্যাসী, নাকি কোন বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতা ? নাকি সমগ্র দেশের মানুষের প্রাণের উদগ্র কামনা এ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে রক্ত রঙিন গোলাপের মতই ফুটে উঠেছিল ?

যেই প্রচার করুক, ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, মানুষের মন উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। তাই এ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যুতের মতই খেলা করে গেল। এ চিন্তা মানুষের প্রাণে এক অদ্ভুত আশা ও প্রেরণার সৃষ্টি করে তুলল। তাই দেখতে পাই ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সূচনা থেকেই ভারতের মানুষ যেন রুদ্ধ আবেগে দুলে দুলে উঠছে। একটা বিরাট কিছু আসছে, দূর থেকে তার অস্ফুট পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

একটা বিরাট প্রচার সংগঠন কাজ করে চলেছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এ সংগঠনের কতটুকু কেন্দ্রীয় কতটুকুই বা আঞ্চলিক এ হিসেব কেউ দিতে পারবে না। তবে এ সমস্ত প্রচারকেরা কি অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এ প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতেন, ভাবলে অবাক হতে হয়।

ফকীর সন্ন্যাসী দরবেশ বা জ্যোতিষী সেজে এ সমস্ত প্রচারকেরা তাঁবুতে তাঁবুতে, কেল্লায় কেল্লায় ঘুরে যেখানে যেটুকু সুযোগ পেতেন তারই মধ্য দিয়ে প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতেন। এঁরা পোশাকের আড়ালে অস্ত্র নিয়ে চলতেন।

বিপদে পড়লে গোপন ঝোলা থেকে শাণিত তলোয়ার ঝকমক করে উঠত। হঠাৎ বিপন্ন হয়ে সাধুবাবা তার বাঘের চামড়ার আসনের তলা থেকে "হ্যান্ডগান" নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, এমন দৃষ্টান্তও দেখা গেছে। সব সময়ই এঁদের প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হোত, ধরা পড়লে অনিবার্য মৃত্যু। মৃত্যুর আশঙ্কা সম্মুখে নিয়েই দুঃসাহসিক প্রচারকের দল ব্যারাকপুর থেকে মীরাট, মীরাট থেকে এলাহাবাদ বা কানপুর, লখেনৌ, আম্বালা, পেশোয়ার—সেখানে যেখানে সেনানিবাস আছে, সর্বত্র ঘুরে ঘুরে সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে গিয়েছেন বা এক জায়গার গোপন খবর অন্য জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। এঁদের বীরত্বপূর্ন কাহিনী কিন্তু লোকচক্ষের অগোচরেই থেকে গেছে।

এঁদের মধ্যে কোন কোন ফকীর দস্তুরমত হাতীতে চড়ে শিষ্য মুরীদদের নিয়ে দলবলে ঘেরাও হয়ে বেরোতেন। একবার এক শহরে এরকম একটা দল এসে হাজির। তাঁদের চালচলন ও কার্যকলাপে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মনে একটু সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তারা সে ফকীরকে তাঁর দলবল সহ শহর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য হুকুম দেয়। ফকীর সাহেব শান্তিপ্রিয় লোক, সরকারী হুকুম বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল যে, তিনি সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সিপাইদের ব্যারাকে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কেল্লা বা সেনানিবাসের কাছাকাছি জায়গায় প্রায়ই দেখা যেত কোথাও সাধুবাবা ধুনি জ্বালিয় বসে গঞ্জিকা সাধনায় ডুবে আছে, কোথাও কোন ফকীর একাগ্রমনে কোরআন পাঠে নিরত , কোথাও বা কোন জ্যোতিষী ভাগ্যগণনার ফাঁদ পেতে বসে আছেন। হিন্দু মুসলমান সিপাইরা দলে দলে তাঁদের কাছে এসে ধন্না দিত, ভক্তিতে গদগদ হয়ে ধর্মোপদেশ ও তত্ত্বকথা শুনত। এই ধর্মকথার অন্তরালে লোক বুঝে বুঝে তাঁরা বিদ্রোহের বীজ- মন্ত্র দান করতেন।

শুধু সিপাইদের মধ্যেই নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও এঁদের প্রচারের ক্ষেত্র বিস্তারিত ছিল। কোন কোন জায়গায় ইংরাজদের নজরেও এ জিনিসটা পড়ল। তারা লক্ষ্য করল, 'যখনই সে অঞ্চলে কোন সাধু বা দরবেশ আসে, কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের চাকর-বাকর আর বাবুর্চি আয়া মহলে একটা দুর্বিনীত ভাব দেখা দেয়। বাজারের ফিরিঙ্গীদের দেখলেই দেশী লোকেরা ফিস ফিস করে কি সব

কানাকানি করে। পরের দিন ভিস্তির দেখা নেই, সাহেব সারাদিন পানি পান না। বলা নেই কওয়া নেই, আয়াগুলো কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। মেমসাহেবের সামনে বাবুর্চি খালি গায়ে এসে দাঁড়ায়। সাহেবকে দেখে বয় সেলাম করে না, এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেন সাহেবকে দেখতেই পায় নি, কিন্তু সাধু ও ফকীরেরা-যে কোন রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতে পারে, এ সন্দেহ তাদের মনে দেখা দেয় নি।

দেশী সিপাইদের মধ্যে ধর্মচর্চার ব্যবস্থার জন্য সরকার থেকে মৌলবী ও পুরোহিত নিযুক্ত করা হোত। শোনা যায় বিদ্রোহীদের পক্ষের অনেক লোক মৌলবী ও পুরোহিতের ছদ্মবেশে এদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন।

উত্তর ভারতে 'তামাসগার' বলে একটা সম্প্রদায় ছিল। এরা গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে তামাসা দেখিয়ে বেড়াত বিদ্রোহীরা তাদের প্রচারের কাজের জন্য এদের সাহায্য নিত। এরা সাধারণত ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বন করেই গান গাইত। এ ধরনের

অনুষ্ঠান খুবই জনপ্রিয় ছিল। এ সমস্ত গান শোনবার জন্য হাজার হাজার লোক এসে ভীড় করত এবং ঘন্টার পর ঘন্টা গান শুনত। এ সমস্ত ধর্মীয় কাহিনীর ফাঁকে তারা স্বদেশপ্রেমের গান গাইত আর গানের মধ্য দিয়ে ফিরিঙ্গী বিদ্বেষ প্রচার করত।

ঝাঁকে ঝাঁকে ইশ্‌তাহার বের হচ্ছিল। কতগুলি অঞ্চলেই ইশ্‌তাহার নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হোত। ফৈজাবাদের বিদ্রোহী মৌলবী তো তরোয়াল আর লেখনী দুই-ই সমানভাবে চালিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত ইশ্‌তাহার অগ্নিবর্ষণ করত, মানুষকে পাগল করে দিত।

সে সব ইশ্‌তাহারের নমুনা আজকাল খুব কমই পাওয়া যায়। বিদ্রোহের গতি ও প্রকৃতিকে বোঝবাব জন্য সে সমস্ত ইশ্‌তাহারগুলো আমাদের খুবই প্রয়োজনে লাগত সন্দেহ নেই। মাদ্রাজ শহরের দেয়ালে এ ইশ্‌তাহারটি এঁটে দেওয়া হয়েছিলঃ

"স্বদেশবাসিগণ, স্বধর্মে অনুরাগিগণ, ওঠো, ফিরিঙ্গীদের দেশ থেকে ভাগিয়ে দেবার জন্য সবাই মিলে উঠে দাঁড়াও। ওরা ন্যায়কে পদদলিত করেছে, আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে. ওরা স্থির করেছে আমাদের জাতিকে ধূলির সাথে মিশিয়ে দেবে। এ ফিরিঙ্গীদের অসহনীয় অত্যাচার থেকে হিন্দুস্থানকে মুক্ত করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে রক্তাক্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এ হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য জেহাদ, ন্যায়ের জন্য জেহাদ। যাঁরা এ যুদ্ধে জীবন হারাবেন তাঁরা শহীদ বলে গণ্য হবেন। বেহেশতের দুয়ার শহীদদের জন্য সদাই উন্মুক্ত কিন্তু যে-সকল ভীরু যে-সকল দেশ-দ্রোহী এ জাতীয় কর্তব্য থেকে দূরে সরে যাবে, দোজখের আগুন সে সব দুর্ভাগাকে ঘিরে ফেলবে। স্বদেশবাসিগণ. এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা তোমরা চাও? বেছে নাও— এখনই বেছে নিতে হবে।"

লক্ষ্মৌ শহরের পার্কে পার্কে ইশ্‌তাহার যেতে লাগল। জনসাধারণের মনকে আলোড়িত করে তোলবার জন্য আবেগময়ী ভাষায় তাদের আহ্বান করা হোত ঃ

"হিন্দু ও মুসলমান, মিলিতভাবে উঠে দাঁড়াও! এই শেষবারকার মত তোমাদের ভাগ্যকে নির্ধারণ করে নাও। এ সুযোগ যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তবে আর দেশের মানুষের বেঁচে থাকবার কোন উপায় থাকবে না। এ হচ্ছে শেষ সুযোগ। পার তো এখনই কর নইলে আর নয়।"

সরকারী লোকেরা জানত প্রতিদিনই এ ধরনের নিত্য নতুন ইশ্‌তাহার বের হচ্ছে। দেখলেই তারা ছিঁড়ে ফেলত। তার বেশী আর করবেই বা কি! কিন্তু ছিঁড়ে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গেই কারা যেন আবার সে জায়গায় নতুন ইশ্‌তাহার লাগিয়ে দিয়ে যেত।

পুলিশ বলত এগুলো কারা লাগায় কখনই বা লাগায় এটা খুঁজে বের করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তার কারণটা কিছুদিন বাদেই জানা গেল। সরষের মধ্যেই ভূত রয়েছে যে! পুলিশের লোকদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই এ সমস্ত গোপন কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। বিদ্রোহের উদ্দীপনা তাদেরও মাতিয়ে তুলেছিল।

চাপাটি আর পদ্ম

দিল্লীর অন্তর্গত পাহাড়গঞ্জ থানার থানাদার মৈনুদ্দীন সাহেব তাঁর রোজনামচায় এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেনঃ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। সবে মাত্র ভোর হয়েছে এমন সময় ইন্দ্রপৎ গ্রামের চৌকিদার এক রিপোর্ট নিয়ে এসে হাজির! অবাক হয়ে দেখি তার হাতে একখানা চাপাটি। এ আবার কি! এ চাপাটি সম্পর্কেই সে নাকি রিপোর্ট করতে এসেছে।

কি ব্যাপার?

সে বলল, "সেরাই ফারুক খান গ্রামের চৌকিদার এ চাপাটিখানা আমার হাতে এনে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে। চাপাটিখানা দেবার সময় সে বিশেষ করে বলে দিয়েছে যে, আমি যেন ঠিক এ রকম পাঁচখানা চাপাটি বানিয়ে পাশাপাশি পাঁচটি গ্রামে পাঠিয়ে দেই। আর যাদের কাছে পাঠাব তাদের যেন একথা বলে দেই যে, তারাও যেন প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচটা করে চাপাটি বানিয়ে পাঁচ পাঁচটা গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। যব বা গমের আটা দিয়ে এ চাপাটি বানাতে হবে। চাপাটিগুলোকে হাতের তালুর মত বড় করতে হবে, ওজনে যেন দুই তোলার মত হয়।"

অবাক হয়ে তার কথা শুনি। লোকটা বলে কি! তবে এটা বুঝতে পারলাম যে, সে মিছে কথা বলছে না। ব্যাপারটার গুরুত্ব আছে, একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে না। এ ধরনের ঘটনায় হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের মনে আতঙ্কের ভাব ছড়িয়ে পড়ে।

কয়েকদিন যায়। অস্বাভাবিক কোন কিছু ঘটল না। কিন্তু কিছুদিন বাদেই একটা জনরব শুনতে পেলাম যে, ২৬-এ ফেব্রুয়ারী তারিখে বহরমপুরে ১৯নং রেজিমেন্ট টোটা নিতে অস্বীকার করেছে। ৩৪নং রেজিমেন্টেও ঠিক একই অবস্থা। ফলে রেজিমেন্টের ৭টি কোম্পানীকে পদচ্যুত করা হয়েছে।

খবরটা শুনেই সন্দেহ হোল, ব্যাপার সুবিধার নয়, সামনেই একটা বিপদের দিন আসছে। এ সময় সংবাদপত্রে বিভিন্ন রেজিমেন্টের সিপাইদের চালচলন সম্পর্কে নানারকম খবর বের হচ্ছিল। অবস্থাটা কেমন যেন সঙ্গীণ বলে মনে হতে লাগল। আমার থানা এলাকার চারদিকে খোঁজ নেবার জন্য লোক পাঠালাম যে, অন্যান্য গ্রামগুলোতে চাপাটি এসে গেছে কিনা। সবাইকে নিষেধ করে দিলাম, কেউ যেন এই চাপটি বিলি করার ব্যাপারে সাহায্য না করে।

আমার ছোট ভাই মীর্জা মহাম্মদ হোসেন খাঁ বুদ্দাপুরের থানাদার। বুদ্দাপুর দিল্লী

থেকে ষোল মাইল দূরে। যেদিন আমি পাহাড়গঞ্জে চাপাটি বিলি করার সংবাদ পেলাম ঠিক সে দিনই আমার ভাই একজন ঘোড়- সওয়ার সংবাদদাতাকে পাঠিয়ে আমাকে খবর দিল যে, তার এলাকাতেও গ্রাম থেকে গ্রামে চাপাটি বিলি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় এর সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো বকরীর গোশ্‌তও এভাবে বিলানো হচ্ছিল। এ অবস্থায় কি করা উচিত এ সম্পর্কে সে আমার মতামত জানতে চেয়ে পাঠিয়েছে।

আমি খবর পাঠিয়ে দিলাম, এ চাপাটি বিলি যাতে বন্ধ হয় সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে। সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছেও খবর দিলাম। উপর থেকে নির্দেশ পেলাম, চাপাটি বিলি যাতে বন্ধ করা যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখো।

সারা দেশ জুড়ে এ ব্যাপার চলছে কিনা তদন্ত করে দেখবার জন্য আমার ভাইকে আলীগড় ও মথুরায় পাঠানো হোল।

তদন্ত শেষ করে সে যখন ফিরে এল তখন তার মুখে শুনলাম যে, এ ব্যাপারে খেঁজ করবার জন্য দিল্লীর অনেক জায়গাতেই সে গিয়েছে। যেখানেই গিযেছে, সব জায়গাতেই চাপাটির খোঁজ পেয়েছে। যেখানেই খোঁজ করেছে সেখানেই শুনতে পেয়েছে চাপাটি এসেছে পূর্ব দিকে থেকে। কিন্তু কোথা থেকে এসেছে, কোন উদ্দেশ্যেই বা পাঠানো হয়েছে এর সঠিক জবাব সে কারো কাছেই পায় নি।

আমার ভাই বলল, অন্যান্য জেলার কর্তৃপক্ষের কাছে এ সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ নেওয়া হোক অথবা আমাকে যদি পাঠানো হয় আমি একবার এর গোড়ার ঘরটা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

আমার ভাই এ ব্যাপারটা নিয়ে ভাল করে তদন্ত করে দেখবার জন্য খুবই উৎসুক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উপরওয়ালারা এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে রাজী ছিলেন না।

২৭

কিছুদিন বাদে দিল্লীর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্যর থিওফাইলাস মেটকাফ ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে লিখলেন—এ চাপাটির ব্যাপারটার মূল কোথায় ? এ সম্পর্কে তুমি ব্যক্তিগতভাবে কি মনে কর আমাকে লিখে জানাও।

তার উত্তরে আমি তাঁকে জানালাম যে, আমি আমার আব্বার মুখে শুনেছি মারাঠা শক্তির পতনের সময় চিনার মঞ্জরী ও রুটির টুকরো এ ভাবে গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হোত। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্য থাকলে সাঁওতালেরাও এ ভাবে গ্রামের পর গ্রামে শালের মঞ্জরী পাঠিয়ে দিত। এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব মতামত সম্পর্কে আমি লিখলাম আমার ধারণা শীগ্‌গিরই খুব বড় রকমের একটা গোলমাল বাধবে।

মৈনুদ্দিনের এ রোজনামচা থেকে আমরা শুধু দিল্লী ডিভিশনেরই খবর পেলাম। কিন্তু এই রহস্যময় চাপাটি শুধু এ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে এ চাপাটির কাহিনী শোনা গেছে। সরকারী অফিসাররা চাপাটিকে খুবই সন্দেহের চোখে দেখতেন কিন্তু এর কোন কূলকিনারা করতে পারেন নি। অথচ এ দেশের ইতিহাসে এটা নতুন কিছু নয়, এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। যখনই কোন বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিয়েছে, এ নিঃশব্দ চাপাটি তখন গ্রাম থেকে গ্রামে, হাত থেকে হাতে পরিক্রমণ করতে করতে আসন্ন বিদ্রোহের বাণী প্রচার করে ফিরেছে।

ভেলোরে যখন সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তখনও চাপাটির মধ্য দিয়ে প্রচারের কাজ চালানো হয়েছে। এ বিদ্রোহের দূতীরা বিদ্যুদ্গর্ভ বাণী বহন করে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উড়ে চলেছে, যাকেই স্পর্শ করেছে তাকেই বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। কোথা থেকে তারা আসত আর কোথায়-যে চলে যেত একথা কেউ বলতে-পারে না।

কোন কোন উৎসাহী সরকারী অফিসার চাপাটির রহস্য ভেদের জন্য বহু চেষ্টা করেছেন। তাঁরা এই চাপাটি আনিয়ে তাকে পিষে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেখেছেন তার মধ্য দিয়ে কোন গোপন খবর চলাচল হচ্ছে কিনা। কিন্তু নিঃশব্দ চাপাটির মুখ থেকে কোন কথা তাঁরা বের করতে পারেন নি, রহস্য রহস্যই থেকে গেছে। যাদের উদ্দেশ্য করে চাপাটি পাঠানো হোত, তারাই শুধু বুঝতে পারত চাপাটির মর্মকথা।

বিদ্রোহের বাণী প্রচার করে সবাইকে সজাগ করে তোলবার জন্য বাংলাদেশে চাপাটির পরিবর্তে আর একটি জিনিসকে ব্যবহার করা হোত। লালপদ্মকে তাঁরা বিদ্রোহের প্রতীক বলে ধরে নিয়েছিলেন। লালপদ্মের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহীরা অভ্যুত্থান-সম্পর্কে তাঁদের সম্মতি জ্ঞাপন করতেন।

তাঁবুর মধ্যে সিপাইরা বসে জটলা করছে এমন সময় কোথা থেকে একটি লোক এসে হাজির। হাতে তার একটি লালপদ্ম। লালপদ্মের ইঙ্গিত কেউ বুঝল কেউ বা বুঝল না। যারা বুঝল তাদের চোখে চোখে ইশারা খেলা করে গেল।

রক্তপদ্ম আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত বহন করে এনেছে। যে-লোকটি এসেছিলো, লালপদ্মটিকে যথাস্থানে পৌওছে দিয়ে সে যেখান থেকে এসেছিলো সেখানে ফিরে চলে গেল। এবার এ তাঁবু থেকে একজন লোক পদ্মটিকে নিয়ে অন্য একটি তাঁবুর দিকে যাত্রা করল। এ ভাবে তঁবু থেকে তাঁবুতে গ্রাম থেকে গ্রামে হাতে হাতে ঘুরতে থাকত সে পদ্ম, নিঃশব্দে বিদ্রোহীদের প্রস্তুতির কথা পরস্পরকে জানিয়ে দিত। বাংলাদেশে এমন কোন সেনানিবাস ছিল না যেখানকার সিপাইরা এ লালপদ্মের দেখা পায় নি।

বৃটিশ ঐতিহাসিক ট্রেভেলায়ান তাঁর 'কানপুর'-নামক বইটিতে লিখেছেনঃ

"রক্তপদ্ম সমস্ত মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করে তুলছিল। বাংলাদেশে কি সিপাই, কি চাষী সবার মুখেই এ কথাটি শোনা যেত, সব লাল হো যায়েগা! এ কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই তারদের চোখে রহস্যময় অর্থপূর্ন ইঙ্গিত খেলা করে যেত।"

সব লাল হো যায়েগা! রক্ত পদ্মের রক্তিমা কি তারই ইঙ্গিত ?
সব লাল হো যায়েগা!

কি দিয়ে লাল করা হবে ?
এত রং যোগাবে কারা ?

মীরাটের বিদ্রোহ

দমদমের এক দেশী সিপাই স্নান করে এক লোটা পানি নিয়ে ব্যারাকে ফিরছিল। পথে এক ঝাড়ুদারের সঙ্গে দেখা। ঝাড়ুদারের তেষ্টা পেয়েছিল, সিপাইর কাছে পানি চাইল। সিপাইজী উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তার কাছে ঝাড়ুদার অস্পৃশ্য। কি করে পানি দেবে, একটু ইতস্তত করতে লাগল। ঝাড়ুদার তিক্ত হাসি হেসে বলল—"মহারাজ এখনও জাতের বড়াই করো! তোমাদের জাত জন্ম কি আর থাকবে! সরকার বাহাদুর এবার নতুন টোটায় গরু আর শুয়োরের চর্বি মাখিয়ে দিচ্ছে। দাঁত দিয়ে কাটতে হবে সে টোটা। দেখা যাবে এবার তোমরা কি কর।"

সামান্য ঝাড়ুদারের কথা হলেও যে শুনল তার মনেই খটকা লাগল। দমদমের সমস্ত সিপাইদের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। দমদমের সঙ্গে ব্যারাকপুরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এ খবর ব্যারাকপুরে গিয়ে পৌছতে দেরী হোল না। সিপাইদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিল।

কিন্তু এ তো শুধু দমদম আর ব্যারাকপুরের কথা নয়। একই সঙ্গে সমস্ত ভারতময় এ নিয়ে তুমুল তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। কথাটা কি প্রথম বাংলাদেশ

থেকে উঠেছিল, না আর কোন প্রদেশ থেকে উঠেছিল, নাকি একই সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠেছিল, এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না। তবে বিদ্রোহীদের একটা নিপুণ প্রচার বাহিনী যে পেছন থেকে সংগঠিতভাবে কাজ করে চলেছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

গভর্নমেন্ট ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী থেকে এক নতুন টোটা চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কথাটার মধ্যে সত্যতা থাক আর নাই থাক সিপাইরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হোল যে, তাদের ধর্ম নষ্ট করবার জন্যই খ্রীস্টান গভর্নমেন্ট এ

দুরভিসন্দিমূলক নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে সারা ভারত জুড়ে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমস্ত সিপাইদের মধ্যে এ নিয়ে যে-বিক্ষোভ দেখা দিল তার বিস্তৃতি ও তীব্রতা দেখে গভর্নমেন্ট থমকে দাঁড়ালেন। ফেব্রুয়ারী মাসে সর্বপ্রথম বহরমপুরের সিপাইরা এ টোটা ব্যবহার করতে প্রকাশ্যে অস্বীকার করল। এ টোটা প্রশ্ন নিয়েই মীরাটের সিপাইরা বিদ্রোহ করেছিল।

২৩-এ এপ্রিল তারিখে থার্ড লাইট ক্যাভেলরির ঘোড়সওয়ার সিপাইদের প্যারেডে জমায়েত করা হয়েছিল। এখানে সিপাইদের টোটা ব্যবহার করবার নয়া কায়দা শেখানো হচ্ছিল। কিন্তু নব্বই জন সিপাইর মধ্যে পঁচাশি জনই টোটা স্পর্শ করতে অস্বীকার করল। কর্তৃপক্ষ তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এ টোটা তাদের পুরানো টোটাই, কাজেই এগুলো সম্বন্ধে তাদের আপত্তি করবার কোনই কারণ নেই। কিন্তু সে পঁচাশি জন সিপাই তাদের সংকল্পে অটল রইল। তারা অফিসারদের মুখের সামনে প্রকাশ্যে অমান্য করল।

এতই দুঃসাহস!

সিপাইদের এ স্পর্ধায় কর্তৃপক্ষ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম দেওয়া হোল, অবিলম্বে এ পঁচাশি জন উদ্ধত সিপাইর হাতের অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে আর গা থেকে খুলে নিতে হবে তাদের সামরিক পোশাক।

এ পঁচাশি জন বিদ্রোহী হয়তো মনে মনে আশা করেছিল যে, অন্যান্য সিপাই ভাইরা তাদের গায়ে হাত দিতে রাজী হবে না।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের আদেশ, কঠিন হাতে বিদ্রোহ দমন করতে হবে। গোলন্দাজ গোরা সৈন্যেরা সামনেই কামান সাজিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হুকুম হলেই হয়।

উদ্যত কামানের মুখে দাঁড়িয়ে অন্যান্য সিপাইরা এ আদেশ লঙ্ঘন করতে সাহস করলো না। মনের গ্লানি মনেই, চেপে রেখে তারা তাদের সহযাত্রী বিদ্রোহী ভাইদের গা থেকে পোশাক টেনে খুলে নিল। কোর্ট মার্শালের বিচারের এ পঁচাশি জন বিদ্রোহীকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে দীর্ঘ-কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হোল।

সমস্ত শহরে এ কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল। শহরের লোক বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। ঘরের মানুষ পথের মানুষ সকলের মধ্যে এ একই আলোচনা, এ একই কথা নিয়ে বলাবলি। পঁচাশি জন বীর বন্দী শহরবাসী নরনারীর মন জয় করে নিয়েছে। সিপাইদের আন্দোলনের সঙ্গে জনসাধারণের প্রাণের যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গেল। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সূচনার মুখে এ মুহূর্তটি একটি চরম মুহূর্ত।

যে-সমস্ত সিপাইরা তাদের বিদ্রোহী ভাইদের গা থেকে জোর করে সামরিক পোশাক খুলে নিয়েছিল, তারা রাস্তায় বেরিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে পারল না। সমস্ত শহরবাসীর ধিক্কারে তারা যেন মাটিতে মিশে গেল। এমন কি বাজারে মেয়েরা পর্যন্ত তাদের ডেকে অপমান করতে লাগল-ছি, ছি, ছি, কাপুরুষের দল, নিজের ভাইদের গা থেকে পোশাক খুলে নিতে একটু বাধল না! তারা বীর, তারা সব জেলখানায় পচে মরছে আর তোমরা বেরিয়েছ হাওয়া খেতে ! লজ্জা করে না, গলায় দেবার দড়ি জোটে না!

সিপাইরা মনের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরছিল। এ লাঞ্ছনা তারা আর সহ্য করতে পারছিল না। সে রাত্রেই গোপন পরামর্শ-সভা বসল। সব স্থির হয়ে গেল-আর দেরী নয়, কালই।

পরদিন রবিবার। শহরের ইউরোপীয় অধিবাসীরা ও গোরা সৈন্যেরা সবাই গীর্জায় উপস্থিত ছিল। গীর্জার ঘন্টা বাজতে শুরু হতেই নির্ধারিত ব্যবস্থা মত সিপাইরা বিদ্রোহ করল প্রথমেই থার্ড ক্যাভেলরি জেলখানায় গিয়ে জেলের দরজা ভেঙ্গে বন্দীদের বের করে নিয়ে এল। এতদিনের জমানো ক্রোধ এবার যেন ভেঙ্গে পড়ল। মহাবিদ্রোহের রক্তগঙ্গা এখান থেকেই প্রবাহিত হয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলল।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এভাবে অবাধে হত্যাকান্ড চালিয়ে সিপাইরা সে রাত্রিতেই দিল্লী দখল করবার জন্য ছুটল। দিল্লীর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্তে বসে ছিলেন, কোন খবরই রাখতেন না। বিদ্রোহী সিপাইরা নিজেরাই তরোয়াল ও বন্দুকের আগায় এ খবর বহন করে নিয়ে এলো। দিল্লী অতি সহজেই তাদের দখলে এসে গেল। বিদ্রোহীরা রাজধানীর বুকে আজাদীর ঝান্ডা উড়িয়ে দিল।

আজাদ দিল্লীতে ঈদ উৎসব

আজাদ দিল্লীর আকাশে ঈদের চাঁদ দেখা দেবে। একশো বছর পরে ঈদের চাঁদের পবিত্র আলোকচ্ছটা আজাদ দিল্লীর বুকে ছড়িয়ে পড়বে। শহরের মুসলমান অধিবাসীরা আগ্রহে অধীর হয়ে এই পবিত্র দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করছে।

ঠিক তেমনি আগ্রহ নিয়ে ঈদের দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছেন হডসন সাহেব আর সমস্ত বৃটিশ অফিসারেরা, যারা দিল্লী শহরকে অবরোধ করে ওৎ পেতে বসে কোন্ মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়া যায় তারই সুযোগ খুঁজছে। হডসন সাহেব একটা খবর পেয়েছেন, আর সেই খবরটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। ঈদের সময় শহরে গো-জবেহ্ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেধে যাবার নাকি খুবই সম্ভাবনা। এ দাঙ্গাটা যদি সত্যিই বেধে যায় বা কোনমতে বাধিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সহজেই কার্যোদ্ধার হয়ে যাবে। এ হচ্ছে চমৎকার মওকা।

শহরে ভেতর থেকে ইংরাজদের গুপ্তচরেরা সংবাদ পাঠাচ্ছে অবস্থা নাকি খুবই

আশাপ্রদ। ভেতরে খুবই গোলমাল আর দলাদলি চলছে। একদল মুসলমান ঘোষণা করেছে যে, যে-করেই হোক ঈদের দিনে জুম্মা মসজিদে চিরাচরিত রীতি-অনুযায়ী গরু জবেহ্ তারা করবেই। আশা করা যাচ্ছে তাদের এই ধর্মীয় বিশ্বাসকে তারা আঁকড়ে ধরে থাকবে। আর তা যদি হয়, তাহলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেধে যাবেই, কেউ তাকে আটকাতে পারবে না!

ঈদ উপলক্ষে গো-জবেহ্ বন্ধ করে দেওয়া হলে স্বভাবতই মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করবে। আবার হিন্দুদের মনে গোহত্যার বিরুদ্ধে সংস্কার এতই প্রবল যে, গোহত্যা বন্ধ না হলে বিদ্রোহী হিন্দু সিপাইরা বেঁকে বসতে পারে। অথচ এক সংকটের সময় এ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে কোনরকমে যাতে ফাটল ধরতে না পারে, সে দিকে দৃষ্টি দেওয়াই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। মুসলমানদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন যাঁরা তাঁরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, হিন্দুরা যাতে দূরে সরে যায়, এমন কোন কাজ করা সঙ্গত হবে না। ঠিক এ দিকে দৃষ্টি রেখেই খান বাহাদুর খান বেরিলীতে ঘোষণা করলেন যে, হিন্দুরা যদি বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে যোগদান করে, তাহলে রাজ্যে গোহত্যা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এ ঐক্য রক্ষা করবার জন্য বাদশাহ কত দূর পর্যন্ত যেতে পারেন? তিনি যেটাই করেন না কেন, এক পক্ষ তার বিরুদ্ধে থাকবেই। এতদিনের প্রচলিত প্রথাকে বন্ধ করে দেওয়া সম্পর্কে হাকিম আহসানুল্লাহ্ ও ইতস্তত করছিলেন। তিনি মৌলবীদের পথেই পা বাড়াতে চলেছিলেন। কিন্তু বাদশাহ এসময় এ ব্যাপারে অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিলেন। তিনি সেনাপতি ও সৈন্যবাহিনীর অন্যান্য অফিসারদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন ঃ

'ঈদ উপক্ষে শহর এলাকার মধ্যে কোন গরু জবেহ্ করা চলবে না। যদি কোন মুসলমান এ কাজ করে, তাহলে তাকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং আর কোন মুসলমান যদি এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে তবে তাকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।"

বাদশাহ্ ঈদগাহে একটা ভেড়া কোরবানী করে নিজেই তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ফলে পয়লা আগস্ট, ঈদের দিনে দিল্লীতে কোন রকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধল না। সকাল বেলা যথাবরীতি ইদের জমায়েত নামায পড়া হোল।

কোনও দিকে কোন রকম শান্তি ক্ষুণ্ণ হোল না। কিন্তু এজন্য কত লোক-যে মনঃক্ষুণ্ণ হোল! পর দিন মিঃ কীথ ইয়ং তাঁর স্ত্রীর কাছে চিঠিতে লিখলেনঃ গতকাল ঈদ উৎসব উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বড় রকমের একটা হাঙ্গামা বাধবে এ আশা আমরা খুবই করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের এ আশা পূর্ণ হয় নি। কাল শহর থেকে একটি মাত্র সংবাদলিপি পাওয়া গেছে তাতে এ ধরনের কোন কথাই নেই। বাদশাহ শহরে গোহত্যা বন্ধ রাখবার জন্য কড়া আদেশ জারী করেছিলেন। এ আদেশ যদি প্রতিপালিত হয়ে থাকে তাহলে হিন্দুরা খুবই খুশী হবে এবং হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা করবার পরিবর্তে উভয়ে মিলে আমাদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে আক্রমণ চালাবে।

হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়ে আপনার আপনার কাজ হাসিল করে নেওয়া, এটা বৃটিশের নতুন আয়ত্ত করা বিদ্যা নয়। যেদিন ভারতের মাটিতে পা দিয়েছে, সেদিন থেকেই সে এ খেলা খেলে আসছে। সে খেলার আমরাই ছিলাম খেলনা। কিন্তু মহাবিদ্রোহের সময় তার আশা ও প্রচেষ্টা দুই-ই সমানভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পয়লা মে স্যর হেনরী লরেন্স লর্ড ক্যানিংকে যে- চিঠি লিখেছিলেন, তাতে আছেঃ

'দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-বিরোধ বাধবে, আমি তার অপেক্ষায় আছি।' তাঁর এ আশা পূর্ণ হয়েছিল কি?

মিঃ এইচসন্ তার জবাব দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছেনঃ

"এক্ষেত্রে মুসলমানদের আমরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছি!"

এলাহাবাদের বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহে এলাহাবাদ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শুধু সিপাইদের মধ্যে নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে, শুধু শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও বিদ্রোহের শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল।

এখানে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানরা ছিল এ বিষেয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী। গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম পরিচালনায় তারা ছিল ওস্তাদ। এলাহাবাদে এ গোপন সংগঠন

এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, শুধু সাধারণ লোকেরা নয় শহরের বহু বিশিষ্ট লোক এমন কি জজ-মুনসেফরা পর্যন্ত এ সমস্ত গুপ্ত সমিতির আওতার মধ্যে এসে গিয়েছিলেন।

একটা ব্যাপারে এলাহাবাদের বিদ্রোহীরা অন্যান্য অঞ্চলের বিদ্রোহীদের টেক্কা মেরেছে। সে হচ্ছে তাদের গোপন কর্মকৌশল। এ তুলনা কোথাও মিলবে না। যে-সকল নেতা ও কর্মীরা চারদিকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে বেড়িয়েছেন, সরকার পক্ষ তাঁদের সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ পোষণ করে নি। সারা দেশ যখন বিদ্রোহের

জোয়ারে টলমল করে উঠেছে, এলাহাবাদে তখন পূর্ণ শান্তি বিরাজমান। এখানে যে ইংরাজ ফৌজ মোতায়েন করবার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে, একথা কারো মনেই আসে নি।

দিল্লী শহর মীরাটের বিদ্রোহী সিপাইদের দখলে এসে গেছে, এলাহাবাদে এ খবর যখন এসে পৌঁছল, এখানকার বিদ্রোহীদের দলপতিরা অফিসারদের কাছে গিয়ে তাদের ব্যগ্র কামনা নিবেদন করলঃ খাবন্দ, একবার আমাদের দিল্লী যাবার জন্য হুকুম দিন। দেখে নেব ব্যাটাদের একবার, কেটে কুচি কুচি করে গঙ্গার পানিতে ভাসিয়ে দেব। ব্যাটাদের বড় বাড় বেড়েছে, এ আর আমাদের সহ্য হয় না।

প্রভুভক্তির এই উচ্ছল উচ্ছ্বাসে প্রভুরা অভিভূত হয়ে পড়েলেন।

স্বয়ং গভর্নর জেনারেল ৬নং রেজিমেন্টের এ অতুলনীয় বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির জন্য তাদের প্রকাশ্যাভাবে ধন্যবাদ জানাবার নির্দেশ দিলেন।

ঠিক সে সময় কোন একজন নাগরিকের কাছে থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা সংবাদ এসে পৌঁছল। সংবাদটা অপ্রত্যাশিত এবং অবিশ্বাস্য। ৬নং রেজিমেন্টের সিপাইরা নাকি গোপনে গোপনে বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলেছে।

কিযে বলে, যত সব বাজে গুজব!

তবু একবার তদন্ত করে দেখা দরকার। ইংরাজ অফিসাররা ৬ই জুন তারিখে লাইন পরিদর্শনে এলেন। নাঃ, কোথায় কি, যেদিকেই তাকান, চোখ জুড়ানো দৃশ্য। সিপাইদের হৃদয় রাজভক্তিতে কানায় কানায় পূর্ন। আর লোকগুলোরও খেয়ে দেয়ে কাজ নেই কেবল বাজে গল্প রটিয়ে বেড়ায়।

কয়েকজন সিপাইর প্রেম যেন কূল ছাপিয়ে উঠল, তারা দৌড়ে গিয়ে অফিসারদের জড়িয়ে ধরল, দুই গালে সস্নেহ চুম্বন ঢেলে দিল।

এত মাখামাখি, কালায় আর গোরায়, সিপাই আর অফিসারে। ভুললে চলবে না, সে বিষম সংকটের দিনে সিপাইদের ভালবাসার মত মহামূল্য জিনিস গোরা অফিসারদের কাছে আর কিইবা থাকতে পারে! অফিসাররা মুগ্ধ হয়ে ফিরে এলেন।

সে রাত্রিতেই।

৩৪

হ্যাঁ, সে রাত্রিতেই ৫নং রেজিমেন্টের সিপাই নাঙ্গা তরোয়াল হাতে দলে দলে ছুটে আসতে লাগল। শত শত কণ্ঠের আওয়াজ উঠল-মারো ফিরিঙ্গীকো!

সে রাত্রিতে সিপাইদের সস্নেহ চুম্বনে পরিতৃপ্ত নিশ্চিন্তচিত্ত গোরা অফিসাররা ডিনারের টেবিলে এসে জমায়েত হয়েছেন। হঠাৎ তীব্র সুরে বিউগল বেজে উঠল। দারুণ বিপদের সংকেত! অফিসাররা খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন।

প্রভুভক্ত ৬নং রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষনা করেছে!

আউধ ক্যাভেলরিকে পাঠানো হোল বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার জন্য। ঘোড়সওয়ার দল উদ্ধত বিদ্রোহী সেপাইদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। একটি সংকটময় মুহূর্ত! ইংরাজ অফিসারগন করে উঠলেন—এ্যাটাক! কই, কেউ একটু নড়ল না তো। আপনার দেশের ভাইকে হত্যা করবার জন্য একটি সওয়ারও তার কোষ থেকে তলোয়ার মুক্ত করল না। তারা নিঃশব্দে অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল! ৬নং রেজিমেন্টের সিপাইরা তাদের সওয়ার ভাইদের অভিনন্দন জানিয়ে মিলিত কণ্ঠে

জয়ধ্বনি তুলল।

সমস্ত এলাহাবাদ শহর বিদ্রোহীদের হাতে চলে এসেছে। কিন্তু মূল জায়গাতেই গলতি। এলাহাবাদের কেল্লা এখনো রাজভক্ত শিখ সৈন্যদের হাতেই রয়ে গেছে। তাকে মুক্ত করা যায় নি।

সমস্ত এলাহাবাদ একই সঙ্গে জেগে উঠেছে। এখানকার তালুকদারেরা অধিকাংশই মুসলমান, প্রজারা হিন্দু। এক নম্বর হিন্দু মুসলমান, দু নম্বর প্রজা-জমিদার। এ দু'সম্প্রদায়-যে কখনো একত্রে মিলতে পারবে এবং সমস্ত জনসাধারণ-যে তাদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে-ইংরাজরা স্বপ্নেও একথা ভাবতে পারেনি। কিন্তু জুনের সে স্মরণীয় সপ্তাহে কত অসম্ভবই না সম্ভব হয়ে গিয়েছে।

এলাহাবাদের গ্রাম-অঞ্চলগুলি শহরের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল না। তারাও একই সঙ্গে মাথা তুলে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

অনেক জায়গাতেই একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে। বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ের কাজ অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের কাজ সম্পন্ন হবার পর পরবর্তী পর্যায়ের কাজ অর্থাৎ শাসন পরিচালনা করবার মত উপযুক্ত লোকের অভাবে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ভেঙেগ পড়ে।

এলাহাবাদে এ রকম উপযুক্ত লোকের অভাব হয়নি। সংকট মুহূর্তে একজন লোক সামনে এগিয়ে এলেন। তাঁর নাম লিয়াকত আলী। এলাহাবাদের মৌলবী বলে পরিচিত। তিনি তাঁর শক্ত হাতে বিদ্রোহের রাশ চেপে ধরলেন।

এ অসাধারণ লোকটি সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানা গিয়েছে। এটুকু জানা গিয়েছে যে. তিনি ইতিপূর্বে তাঁতী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মপ্রচার করে বেড়াতেন। বিদ্রোহের আগে তিনি একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর পবিত্র জীবনের জন্য লোকসমাজে তাঁর অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা ছিল।

এলাহাবাদ স্বাধীন হোল। তার কয়েকদিন পরেই চব্বিশ পরগণার জমিদার লিয়াকত আলীকে ডাকিয়ে এনে শহরের ভার তাঁর উপর ছেড়ে দিলেন। দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল।

মৌলবী খসরুবাগে তাঁর প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করলেন এবং সারা প্রদেশব্যাপী বিদ্রোহকে সংগঠিত করে তোলবার কাজে হাত দিলেন। তাঁর পরিচালনায় কাজকর্ম সুশৃঙ্খলভাবে চলল।

তিনি যে দিল্লীর সম্রাটের অধীন একজন সুবাদার, একথা তিনি শুধু মুখেই বলতেন না, শেষদিন পর্যন্ত সুবাদার হিসেবে সম্রাটের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট পেশ করে এসেছেন।

ক্ষমতা হাতে আসতেই, যে-জরুরী কাজটি অসমাপ্ত ছিল তিনি প্রথমেই তাতে হাত দিলেন, অর্থাৎ শত্রুর হাত থেকে এলাহাবাদের কেল্লাকে পুনরায় দখল করাবার জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি একটি সৈন্যদল গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ঠিক এ সময় সংবাদ পাওয়া গেল জেনারেল নীল বারাণসী থেকে এলাহাবাদ যাত্রা করছেন। ১৭ই জুন তারিখে ইংরেজ সৈন্যরা শহরের দরজায় এসে ঘা মারল।

তখনকার অবস্থা বর্ননা করে মৌলবী সম্রাটের কাছে রিপোর্ট দিচ্ছেনঃ

যে-সমস্ত বিশ্বাসঘাতক দল ছেড়ে শত্রুর সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ লোকের কাছে গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে, ইংরাজরা সমস্ত শহরটাকে কামানের গোলায় উড়িয়ে দেবে। প্রাণের ভয়ে সব লোক ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।'

ইংরাজরা খসরুবাগ আক্রমণ করলো। প্রথম দিনের মত বিদ্রোহীরা সে ধাক্কা সামলে নিল। কিন্তু মৌলবী দেখলেন বৃথা চেষ্টা! কেল্লা যখন শত্রুদের হাতে, তখন খসরুবাগের এ জীর্ণ আশ্রয়ে বসে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা নিতান্ত পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭ই তারিখে মৌলবী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কানপুর যাত্রা করলেন। আর তার পরদিন ইংরাজরা এলাহাবাদ এসে প্রবেশ করল।

৩৬

এলাহাবাদ শহর হাতছাড়া হয়ে গেছে। তবু বিদ্রোহীরা হাল ছাড়ল না। সারা প্রদেশে গ্রামে গ্রামে দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে উঠতে লাগল।

এলাহাবাদের সাধারণ মানুষ সেদিন সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করেছিল। ভেঙ্গে চূর্ন-বিচূর্ন হয়ে গেল, কিন্তু মাথা নোয়ালো না।

এলাহাবাদের সাধারণ মানুষ সেদিন সমস্ত জাতির মান রক্ষা করেছে। কিন্তু আমরা সে গৌরবময় ইতিহাসকে ধরে রাখতে পারিনি। আমরা দুর্ভাগা।

তাদের সে বজ্রদৃঢ় একতাকে ভাঙ্গবার জন্য শত্রুপক্ষ একদিকে অত্যাচার আর একদিকে প্রলোভন, এ দ্বিমুখী অভিযান চালিয়েছে।

একদিন মহৎ আদর্শের জন্য তাদের এ নির্ভীক সংগ্রাম দেখে একজন ইংরাজ অফিসার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। কোন একটি গ্রাম সম্বন্ধে তিনি লিখেছেনঃ

'ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণা করে দিয়েছেন যদি কেউ স্থানীয় বিদ্রোহীদের নেতাকে জীবিত অবস্থায় অথবা তার মাথা কেটে নিয়ে আসতে পারে তাহলে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এ অঞ্চলের লোকেরা সবাই তাকে চেনে কিন্তু আমাদের প্রতি ঘৃণা তাদের এতই তীব্র যে, তাকে ধরিয়ে দেবার মত লোক এখানে কেউ নেই।'

সে সময় এখানে ইংরাজদের কাছে কোন জিনিস বিক্রি করা গুরুতর পাপের কাজ বলে বিবেচিত হোত। কেউ এ অপরাধ করলে সঙ্গে সঙ্গে সমাজ থেকে তাকে কঠিন দণ্ড দেওয়া হোত। জনৈক অফিসার লিখেছেন, 'দেশের প্রতিটি মানুষ যদি এভাবে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবে আর আমাদের ভরসা কি।'

এ হচ্ছে ২৩-এ জুনের খবর। ওরা এলাহাবাদ শহর দখল করে নিয়েছে একথা সত্য কিন্তু ওদের শহর থেকে বাইরে এক পা বেরোবার উপায় নেই।

"এরা রসদ পায় না, এমন কি ওষুধ পর্যন্ত না। রুগ্ন সৈন্যদের জন্য ডুলির যোগাড় করতে পারে না, কে এদের বয়ে নিয়ে যাবে! ইংরাজদের কাছে এক দানা শস্য বিক্রি করবে, এমন লোক কেউ নেই।"

"আজ পর্যন্ত খেতে আমরা খুব কমই পেয়েছি। কাল সকালে যা দিয়ে নাস্তা করেছি, আগে হলে আমার কুকুরটাকেও আমি তা দিতে পারতাম না।"

সাধারণ মানুষের মধ্যে আপনাদের আদর্শ সম্পর্কে কি পরিমাণ দৃঢ় সংকল্প ও শত্রুর বিরুদ্ধে কি প্রবল ঘৃণা থাকলে এ ধরনের সর্বাঙ্গীণ প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব

হয়, সে কথা ভাবতে গেলে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। এলাহাবাদ সেদিন এদিক দিয়ে সমস্ত দেশের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

বিদ্রোহী মৌলবী

দাবানল যেমন লকলকে শিখায় বনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়ায়, বিদ্রোহী মৌলবী যেন তারই প্রতিমূর্তি।

শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষা বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। মৌলবীর নাম বিদেশী শাসকদের কাছে পরম আতঙ্কের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অযোধ্যা প্রদেশের অখ্যাত, অজ্ঞাত, সামান্য একজন তালুকদার। কেই বা তাঁকে চিনত, কেই বা জানত এ শান্ত, সৌম্য মানুষটির বুকের মধ্যে কি বিপুল তেজঃপুঞ্জ সংহত হয়ে আছে। স্তূপীকৃত বারুদরাশি, তার মধ্যে কত বড় শক্তিই না লুকিয়ে থাকে! একটু স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়।

ডালহাউসীর সর্বগ্রাসী নীতি এ স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করল। স্বেচ্ছাচারী রাজ-প্রতিনিধি কতগুলি মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে অযোধ্যাকে আত্মসাৎ করে নিল, বহু তালুকদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

ফৈজাবাদের মৌলবী আহম্মদ শাহ সে তালুকদারেরই একজন। মৌলবী পথে এসে দাঁড়ালেন, সেদিন থেকে পথই হোল তাঁর আশ্রয়। সারা দেশ জুড়ে কোম্পানীর অত্যাচার ও লুণ্ঠন চলছিল, তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করলেন, "এ জুলুমবাজ ফিরিঙ্গীরাজকে খতম কর", সিংহগর্জনে গর্জে উঠলেন।

মৌলবী ধর্মপথের পথিক। কিন্তু মানুষের সুখ-দুঃখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের কোণে বসে ধ্যান-ধারণা ও অত্যাচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখাকেই তিনি ধর্ম বলে মনে করতেন না। তাঁর ধর্মের মূলমন্ত্র ছিলঃ

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

সে দিন থেকে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত নিজের কায় মন প্রাণ—নিজের সর্বস্বের মায়া ছেড়ে দিয়ে তিনি এ ধর্ম পালন করে চলেছেন।

হতাশায় হাল ছেড়ে দেওয়া, ভেঙ্গে পড়া মানুষকে কি করে নতুন আশায় ও উৎসাহে উদ্দীপিত করে তুলতে হয়, সে মন্ত্র তাঁর জানা ছিল। নিস্ব ফকীরের বেশে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, প্রদেশে প্রদেশে, পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিদ্রোহের বাণী প্রচার করবার জন্য। অদ্ভুত তাঁর আকর্ষনী শক্তি! যেখানে যেতেন সেখানেই শহরের মানুষ, গাঁয়ের মানুষ, মিক্ষিত মানুষ, মুর্খ মানুষ দলে দলে এসে তাঁর চারদিকে ভীড় করে দাঁড়াত। ঘুমন্ত মানুষের চোখের ঘুম তিনি কেড়ে নিতে

পারতেন। হ্যাঁ, এমন মানুষ ছিলেন মৌলবী। অ-বোলা মানুষের মুখে কথা ফোটাতে পারতেন তিনি, তাঁকে দেখলে দুর্বল মানুষও সবল হয়ে উঠত। লোকে বলত, মৌলবী সাহেব? অদ্ভুত হাঁর কেরামত! তাঁর হাতের ছোঁয়া পেলে মরা হাড়েও প্রাণ জেগে ওঠে। কথাটা মিথ্যে নয়।

অযোধ্যার জনসাধারণ তাঁদের প্রাণের মানুষ বলে মনে করত। একবার তিনি প্রকাশ্যে লক্ষ্ণৌ শহরের বুকের উপর দাঁড়িয়ে ফিরিঙ্গীর রাজত্বকে ধুলিস্যাৎ করে দেবার জন্য, বজ্রনির্ঘোষে পবিত্র জেহাদ ঘোষণা করলেন। সে আহ্বানে জোয়ারের

টানে উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মত জনতার প্রাণ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল।

শুধু বক্তৃতাই নয়, সাথে সাথে তাঁর লেখনীও অবিরাম অগ্নি বর্ষণ করে চলল, তাঁর লেখা বৈপ্লবিক ইশ্‌তাহারে সারা অযোধ্যা প্রদেশ ছেয়ে গেল।

হুকুম জারী হোল, গ্রেফতার কারো মৌলবীকে।

অযোধ্যার এ জনপ্রিয় নেতাকে কেউ গ্রেফতার করতে ভরসা পেল না। তখন তাঁকে ধরে আনবার জন্য সৈন্যদল পাঠানো হোল।

তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল। বিচারে তাঁর ফঁসির আদেশ হয়ে গেল। মৌলবী আহম্মদ শাহ ফৈজাবাদের কারাগারে বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন।

কিন্তু বাতাস হয়ে উঠেছে এলোমোলো, পুরানো যা কিছু ছিল, সবই যেন উল্‌টে গিয়েছে। কে কাকে দন্ড দেবে, কাল যে ছিল দণ্ডবিধাতা আজ সে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে, ওখানে, সেখানে, যেদিকে কান পাতো, শোনা যাবে বিদ্রোহের পদধ্বনি।

যারা এতদিন ভয়ে কথা বলত না, তারাও আজ গর্জন করে উঠেছে।

ফৈজাবাদের মানুষ তাদের জনপ্রিয় নেতার উপর এ হামলা নিঃশব্দে মাথা পেতে নিল না। তাঁকে গ্রেপ্তার করবার ফলে, যে আগুন হয়তো বা আরও দুদিন পরে জ্বলে উঠত, সেটা এখনই জ্বলে উঠল। সিপাইও নগরবাসীরা একই সঙ্গে রুখে দাঁড়াল।

ইংরাজ অফিসাররা সিপাইদের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে প্যারেড ময়দানে জমায়েত হবার জন্য হুকুম দিলেন। সিপাইরা সে কথা গ্রাহ্য করল না, বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করল, এখন থেকে দেশী অফিসার ছাড়া তারা কারো কথা মানবে না। সরদার দিলীপ সিং ইংরাজ অফিসারদের আটক করবার জন্য হুকুম দিলেন। শহর বিদ্রোহীদের অধিকারে এসে গেল। জনসাধারণ ও সিপাইরা জয়ধ্বনি করে জেলের দরজা ভেঙ্গে তাদের নেতাকে বের করে নিয়ে এল। জনগণের নেতা আবার জনগণের মধ্যে ফিরে এলেন।

মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহের নেতৃত্বের ভার তাঁর উপরে এসে পড়ল।

যারা তাঁকে এ পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিনের জন্য সরিয়ে দেবার সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি করে রেখেছিল তাদের বিরুদ্ধে কি প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তিনি ?

এমন এক প্রতিশোধ, যে-কথা তাঁর শত্রুরা কোনদিন ভুলতে পারবে না। তিনি যখন মৃত্যুদন্ড মাথায় নিয়ে কারাবাসে দিন যাপন করছিলেন, সে সময় কর্নেল লেনক্স তাঁকে তামাক খাবার জন্য একটি গুড়গুড়ি উপহার দিয়েছিলেন। এ কর্নেল লেনক্সই তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।

মৌলবী কর্নেল লেনক্সকে লোক মারফত বলে পাঠালেনঃ "তুমি যে আমার সে দুঃসময়ে গুড়গুড়িটা ব্যবহার করতে দিয়েছিলে সেজন্য শোকরিয়া জানাচ্ছি।"

শুধু তাই নয়, মহাপ্রাণ মৌলবী সমস্ত বন্দী ইংরাজ অফিসারদের মুক্তির আদেশ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ফৈজাবাদ ছেড়ে চলে যাবার জন্য হুঁশিয়ারী পাঠালেন। ১৫নং রেজিমেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত যুদ্ধ কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, সমস্ত বন্দী

ইংরাজ অফিসারদের হত্যা করতে হবে। কিন্তু মৌলবী তাদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হোল না। অফিসারদের ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রত্যেককে পথ খরচা দিয়ে দেওয়া হোল।

লক্ষ্ণৌ শহর আক্রমনের মুখে। স্যার কলিনের নেতৃত্বে ইংরাজ সৈন্যরা গঙ্গা পার হযে এগিয়ে এসেছে। এমন সময় খবর পাওয়া গেল দুর্দান্ত তাঁতিয়া টোপীর সৈন্যরা কানপুরের উপর চাপ দিতে শুরু করেছে। স্যার কলিন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কানপুরকে এমন বিপদের মুখে ফেলে রেখে আর সামনে এগিয়ে যাওয়া চলে না। চার হাজার সৈন্য সহ আউট-রামকে আরামবাগে রেখে তিনি তঁতিয়ার সঙ্গে মোকাবিলা করতে কানপুরের দিকে ফিরলেন।

আরামবাগের এ চার হাজার সৈন্য সম্পূর্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। কোন দিক থেকে তাদের সাহায্য করবার মত কেউ চিল না। লক্ষ্ণৌর বিদ্রোহীদের পক্ষে এ ছিল একটা সুবর্ণ সুযোগ। সংগঠিতভাবে আক্রমণ চালতে পারলে এ সামান্য-সংখ্যক ইংরাজ সৈন্যের টিকে থাকবার কোনই উপায় ছিল না। কিন্তু বিদ্রোহীদের নিজেদের ভিতরকার অবস্থা তখন নিতান্তই শোচনীয়। নানা জায়গা থেকে হরেক রকমের লোক এখানে এসে জড় হয়েছে। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, কেউ কারো কথা মানতে চায় না, যে যার খুশীমত চলছে। বেগম হজরতমহল সরকারীভাবে সর্বাধিনায়িকা বলে স্বীকৃত হলেও এদের সবাইকে সামাল দিয়ে রাখা এবং এদের সংগঠিতও পরিচালিত করবার মত সুকঠিন কাজ তাঁর ক্ষমতার বাইরে ছিল। কাজেই এমন চমৎকার সুযোগ থাকলেও তাকে কাজে লাগানো গেল না।

দিল্লীর পতন হয়েছে, কানপুরের পতন হয়েছে, ফতেগড়ও সে একই পথ অনুসরণ করেছে। হাজার হাজার বিদ্রোহী সিপাই অন্যান্য অঞ্চল থেকে তাড়া খেয়ে এখানে এসে জড় হয়েছে। কিন্তু তারা আসার ফলে লক্ষ্ণৌর কোন সাহায্য হওয়া দূরে থাক, তারা এখানে এসে নানা রকমের উৎকট সমস্যার সৃষ্টি করে তুলছিল। এ

সমস্ত দেখে শুনে মানুষের মন ক্রমশই ভেঙ্গে পড়ছিল। ক্রমে ক্রমে এ ধারণাটা সবাইকে পেয়ে বসেছিল যে, এবার যখন ইংরাজ সৈন্যরা আরও নতুন সৈন্য নিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে আক্রমণ চালাবে তখন আর তাকে বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। মনে মনে অনেকেই ভাবছিল, লক্ষ্ণৌর পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে।

কিন্তু মৌলবী কোন অবস্থাতেই ভেঙ্গে পড়তেন না। যারা তাঁর সহযাত্রী ছিল, তাদের ও তিনি ভেঙ্গে পড়েতে দিতেন না।

তিনি এ কথাই বার বার করে সবাইকে বোঝাতে লাগলেন, এখনও একমন হয়ে কাজে লাগলে ইংরাজকে হারানো যেতে পারে।

বেগমের দরবারের লোকেরা একদম হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়েছে, তিনি তাদের মধ্যে উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলার নাম মাত্র নেই, তিনি চেষ্টা করতেন কি করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু একাজ করতে গিয়ে নানারকম অসুবিধায় পড়তে হোত তাঁকে। দরবারের মধ্যে তাঁর প্রভাব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে দেখে কিছু কিছু লোক তাঁকে হিংসা করত। তারা তাঁর

পেছনে উঠে পড়ে লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত তাদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁকে গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করতে হয়।

কিন্তু সিপাইদের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। স্বয়ং বেগমেরও বোধ হয় এতটা ছিল না। দিল্লী থেকে যে-সব সিপাইরা এসেছিল, তারা একবাক্যে তাঁর কথা মান্য করে চলত। এ সমস্ত সিপাইর চাপে পড়ে বেগম তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন।

তাঁর মুক্তির পর যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে তঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ এখন আমাদের করণীয় কি ? তাঁর উত্তরে তিনি বলেন, "যে-সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল, আজ আর তা' নেই সব কিছুই গড়বড় হয়ে গেছে। তবে ফলাফল যাই হোক না কেন, যুদ্ধ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে একমাত্র এ কারণেই যে যুদ্ধ করাটাই আমাদের কর্তব্য।"

লক্ষ্ণৌর জনসাধারণের উপর তাঁর যে-প্রভাব'ছিল, তা' কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নি। সিপাইদের নিজেদের মধ্যে যে সমস্ত ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ বা মনোমালিন্য চলত, সেগুলি মিটিয়ে দেবার ভার তাঁকেই নিতে হোত। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনিই তাদের মধ্যে নতুন করে প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার করে তুলতেন।

কিন্তু এখানেই তাঁর কাজের শেষ ছিল না। এ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের পরিচালনা করবার কাজটা তাঁকেই প্রায় করতে হোত। আরামবাগে ইংরাজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সিপাইরা যখনই আক্রমণ চালিয়েছে মৌলবীকে সব সময় তাদের পুরোভাগে দেখা যেত।

৪১

১৫ই জানুয়ারী খবর পাওয়া গেল আরামবাগে আউটরামের সৈন্যদের সাহায্যের জন্য কানপুর থেকে একদল ইংরাজ সৈন্য আসছে. তাদের সঙ্গে প্রচুর রসদপত্র আছে। কি করে এদের মাঝপথে ঠেকিয়ে রাখা যায়, এ নিয়ে আলোচনা সভা বসল।

শুধু আলোচনা, আলোচনা আর আলোচনা! শুধু কথা আর কথা! কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌছান গেল না, কোন কর্মপন্থা গৃহীত হোল না। কাজের কথা এলেই সবাই যেন পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চায়।

অন্যান্য নেতাদের কাপুরুষতা দেখে অধৈর্য হয়ে উঠলেন মৌলবী। ঘৃণায় ও ক্ষোভে তিনি যেন ফেটে পড়লেন। সকলের সম্মুখে শপথ করলেন, তিনি নিজেই যাবেন, শত্রুপক্ষের নিকট থেকে মালপত্র হস্তগত করে ইংরাজ সৈন্যদের মধ্য দিয়েই তিনি ফিরে আসবেন।

এ সংকল্প নিয়ে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি থেকে যতটা সম্ভব আত্মগোপন করে মৌলবী কানপুরের পথে যাত্রা করলেন। কিন্তু গুপ্তচরের মারফত জেনারেল আউটরামের কাছে এ খবর আগেই পৌছে গেছে। মৌলবীর সৈন্যদের বাধা দেবার জন্য তিনি ইতিমধ্যেই একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

যুদ্ধ বাধল। সৈন্যদের উৎসাহিত করবার জন্য মৌলবী সবার সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন হঠাৎ একটা গুলি তাঁর হাতে এসে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। ইংরাজরা অনেক দিন থেকেই তাঁকে বন্দী করবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তারা তাঁকে বন্দী করতে পারল না। তাঁর সৈন্যরা চটপট একটা ডুলিতে তুলে দিয়ে তাঁকে লক্ষ্ণৌতে পাঠিয়ে দিল।

লক্ষ্ণৌ শহরের পতন ঘটেছে। বিদ্রোহীদের যুদ্ধে পরাজিত করে ইংরাজ সৈন্যরা

লক্ষ্ণৌ অধিকার করে নিয়েছে। স্যার করিন এ আনন্দে মশগুল হয়ে ছিলেন। কিন্তু এ আনন্দের মাঝখানে একটু যেন খাদমেশানো ছিল যে হাজার-হাজার বিদ্রোহী সৈন্যদের তারা ঘেরাও করে ফেলেছিল একদিকের বেষ্টনী ভেঙ্গে তারা বেরিয়ে গিয়েছে। বিদ্রোহীদের অনেক নেতাও ছিলেন তার মধ্যে . খোদ অযোধ্যার বেগম সাহেবাও এ পথ দিয়েই পালিয়েছেন। মস্ত একটা দাঁও ফসকে গেছে!

কিন্তু মৌলবী আহম্মদ শাহ কোথায় ? পলাতক সৈন্যদের সঙ্গে গিয়ে মাথা গুঁজবার আশ্রয় খোঁজ করছেন ? না, তাঁর বিশ্রামের সময় এখনো আসে নি। ওই দেখো চেয়ে দেখো, আর সব বিদ্রোহীরা যখন লক্ষ্ণৌ থেকে দূরে, অনেক দূরে উধাও হয়েছে মৌলবী আহম্মদ শাহ তখন সে লক্ষ্ণৌ শহরের মধ্যেই এসে ঢুকে পড়েছেন।

এও কি সম্ভব ? মৌলবীর পক্ষে কি যে সম্ভব নয়, বলা কঠিন। চারদিকে শত্রু সৈন্য গিজগিজ করছে ভয় নেই প্রাণে ? না, সত্যিই ভয় নেই। ভয় কাকে বলে

মৌলবী তা জানেন না। মৌলবী কি উন্মাদ ? এ কথাই ঠিক। মৌলবী সত্যই উন্মাদ। দেশপ্রেমে উন্মাদ। শুধু নিজেই নন, যাদের মধ্যে যান, তাদের শুদ্ধ উন্মাদ করে তোলেন। তাঁরই সহচর তাঁরই মত উন্মাদ.একদল সৈন্য সঙ্গে নিয়ে আবার ঢুকে পড়েছেন লক্ষ্ণৌ শহরে, শত্রুপুরীর মাঝখানে।

লক্ষ্ণৌর পতন হয়েছে, ইংরাজদের হাতে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে, এ অবিসংবাদিত সত্যটিকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।লক্ষ্ণৌ শহরের বুকের উপর ইংরাজরা যথেস্ট অত্যাচার চালিয়ে যাবে, ইংরাজের সঙ্গীণ নির্বিচারে নিরীহ জনসাধারণের বুকের রক্ত পান করে চলবে, এ তিনি কি করে সহ্য করবেন! যেটুকু শক্তি এখনও অবশিষ্টে আছে, তা নিয়েই শেষ পর্যন্ত লড়াই করে চলবেন।

লক্ষ্ণৌর প্রতিরোধ সংগ্রামে বিদ্রোহী নেতারা যে বিশৃঙ্খলা, দুর্বলতা ও ভীরুতা দেখিয়েছে, তার জ্বালা মৌলবী এখনও মর্মে মর্মে বোধ করছেন। এ কলঙ্ক যেটুকু পারা যায় মোচন করে যেতে হবে। লক্ষ্ণৌর পতন হয়েছে, কিন্তু বিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছে, ইতিহাসের শেষ পাতায় এ স্বীকৃতিটুকু তিনি রেখে যাবেন।

মৌলবী নির্বোধ নন। তিনি জানতেন, সুবর্ণ সুযোগ চলে গিয়েছে। যা গিয়েছে, তা আর ফিরবে না। আর কোন আশা নেই। তবুও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, কারণ "যুদ্ধ করাই আমাদের কর্তব্য।"

লক্ষ্ণৌ শহরের একটা এলাকা, নাম শাহাদাৎগঞ্জ। মৌলবী আর তার সহচরগণ এ জায়গায় এসে ঘাঁটি গেড়ে বসলেন।

হাজার হাজার ইংরাজ সৈন্য শহরের উপর দিয়ে বীরদর্পে টহল দিয়ে ফিরছে, তারই মাঝখানে এ ক'টি বীর-হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, মরীয়া! মরীয়া না হলে এমন দুঃসাহস কে করতে পারে!ফিরিঙ্গী অজগর সমস্ত লক্ষ্ণৌকে গ্রাস করে ফেলেছে, সে অজগরের মুখে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে লক্ষ্ণৌকে আবার ছিনিয়ে আনতে চান!

উন্মাদ, মৌলবী। মৌলবী উন্মাদ, কিন্তু অপূর্ব!

বৃটিশ ঐতিহাসিক ম্যালেসন সাহেব লিখেছেন, বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে

সবচেয়ে নাছোড়বান্দা মৌলবী আবার ফিরে এসেছেন লক্ষ্ণৌ শহরের বুকে। শহরের বুকের মাঝখানে শাহাদাৎগঞ্জ বলে যে-এলাকাটি আছে দু'- দুটো কামান সাজিয়ে মৌলবী সেখানে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসেছেন। একটি সুরক্ষিত বাড়ীর মধ্যে বসে তিনি ইংরাজ সৈন্যদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত। নাইনটি থার্ড হাইল্যান্ডার্স ও ফোর্থ পাঞ্জাব রাইফেলসকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠানো হোল। এ সামান্য শক্তি নিয়ে মৌলবী সে যুদ্ধে যে-দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়েছিলেন, বিদ্রোহীদের মধ্যে তা খুব বেশী দেখা যায় নি! চারদিকে শত্রুদল, তার মাঝখানে বহুক্ষণ পর্যন্ত

তাঁরা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে চললেন। তারপর আমাদের পক্ষের কিছু লোককে হত্যা করে এবং বহু লোককে জখম করে তবে তাঁরা স্থান ত্যাগ করলেন।"

লক্ষ্ণৌর পতনের পর রোহিলাখন্ড ও অযোধ্যায় বিদ্রোহীদের কোন শক্তিশালী কেন্দ্রই বাকী রইল না। চারদিক থেকে তাড়া খেয়ে বিদ্রোহীরা এ এলাকার মধ্যেই এসে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে প্রতিরোধ দিতে পারে, এমন কোন কেন্দ্র তাদের হাতে রইল না।

বিদ্রোহের নেতারা বুঝতে পারলেন পুরানো কায়দায় যুদ্ধ করতে গেলে কিছুতেই টিকে থাকা যাবে না। একমাত্র পন্থা গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অনুসরণ করে চলা। তাই নেতারা সমস্ত প্রদেশব্যাপী লড়াইয়ের এক নতুন কৌশল-সম্পর্কে এক ফতোয়া জারী করলেনঃ দুশমনকে সামনাসামনি যুঝতে চেষ্টা করো না। তাদের ব্যবস্থা ভালো, নিয়মানুবর্তিতা বেশী। তা ছাড়া তাদের বড় বড় কামান আছে। তাদের চলাচলের উপর লক্ষ্য রাখ। নদীর সবগুলি ঘাট পাহারা দাও, যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটাও, রসদ সংগ্রহে বাধা দাও, তাদের ডাক আটকাও, তাঁবুর আশেপাশে লেগে থাক, তারা যেন নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ না পায়।

মৌলবী এখন থেকে গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় লড়াই চালাতে শুরু করলেন। এবার তাঁর নতুন এক রূপ দেখা গেল।

ইংরাজ সৈন্যরা লক্ষ্ণৌতে বসে আছে। সেখান থেকে ২৯ মাইল দূরে 'বারি'তে মৌলবী তাঁর ঘাঁটি করলেন। অপরদিকে 'বিতাওলি'তে রইলেন অযোধ্যার বেগম-বেগম হজরতমহল ৬ হাজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে!

ইংরাজ সেনাপতি দুদিকেই নজর রাখলেন, একটি একটি করে দু'টিকে খতম করতে হবে। তিনি প্রথমত মৌলবীকে শায়েস্তা করবার জন্য বারি'র দিকে এগোলেন। মৌলবীও চোখ কান খুলে বসেছিলেন। সংবাদটা তাঁর কাছে পৌছতে দেরী হোল না।

ইতিমধ্যে বিদ্রোহের নেতারা সবাই এসে শাহজাহানপুরে মিলিত হয়েছেন।

খবর পেয়ে স্যার কলিন উল্লসিত হয়ে উঠলেন এবার সব ক'টিকে একই সঙ্গে জালে ফেলা যাবে! তিনি অতি গোপনে সমস্ত শাহজাহানপুর শহরটিকে ঘেরাও করে ফেললেন। এবার দেখি কেমন করে পালায়! এত—দিনের দুশ্চিন্তা এবার মিটল।

শাহজাহানপুর অধিকার করতে বিশেষ বেগ পেতে হোল না। কিন্তু হায় হায়, স্যার কলিনের কপাল চাপড়ানোই সার হোল! কোথায় গেল সব দলপতিরা! সব ক'টি পাখীই উড়ে পালিয়েছে।

শাহজাহানপুরের প্ল্যানটা ভেস্তে যাওয়ায় স্যার কলিন এবার বেরিলীর দিকে ছুটলেন। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ পতনের পর বেরিলীই বিদ্রোহীদের শেষ আশ্রয়। মীর্জা ফিরোজ শাহ্, নানা সাহেব, মৌলবী আহমদ শাহ, বালা সাহেব, বেগম হজরতমহল,

রাজা তেজ সিং এবং অন্যান্য নেতারা সবাই রোহিলাখণ্ডে চলে এসেছেন। রোহিলাখণ্ডের রাজধানী বেরিলীই তখন একমাত্র স্বাধীন কেন্দ্র।

কিন্তু এবারও স্যার কলিনের মতলব হাসিল হোল না। বিদ্রোহের দলপতিরা হাওয়ার মত এবারও তাঁর হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলেন। স্যার কলিন ফাঁকা মাঠেই যুদ্ধ জয় করলেন। দলপতিরা ধরা না পড়লেও বেরিলী অধিকার করে মনটা তাঁর খুশীই ছিল। কিন্তু মৌলবী তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেবেন না।

স্যর কলিন সবে মাত্র একটু আয়েস করে বেরিলী জয়টাকে উপভোগ করতে বসেছেন, এমন সময় শিবিরময় কোলাহল জেগে উঠল-মৌলবী! মৌলবী! আবার সেই মৌলবী! কোথায় মৌলবী?

আর কোথায়! দুরন্ত বাজের মত কোত্থেকে এসে ছোঁ মেরে বসেছে আবার নেই শাহজাহানপুর।

সমস্তই পূর্বপরিকল্পিত

স্যার কলিন যখন শাহজাহানপুর অবরোধ করেছিলেন, মৌলবী যুদ্ধ এড়িয়ে গেছেন। শুধু গা বাঁচাবার জন্য নয়, তাঁর মাথায় ঘুরছিল অন্য একটা মতলব। শাহজাহানপুর ছেড়ে চলে যাবার আগে তিনি শহরের সমস্ত দালানগুলোকে ভেঙ্গে ফেলবার আদেশ দিয়েছিলেন, শত্রুসৈন্য যাতে আশ্রয় নেবার স্থান খুঁজে না পায়। মৌলবী ও অন্যান্য দলপতিরা এটা পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে স্যার কলিন শাহজাহানপুরে কিছু সৈন্য রেখে দিয়ে অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে নিশ্চয়ই বেরিলী আক্রমণ করতে ছুটবেন। তারপর দেখা যাবে।

তাঁরা যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই ঘটল। বেরিলীর ইংরাজ সৈন্যেরা যখন বিজয়োৎসবে মত্ত হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মত মৌলবী অতর্কিতে শাহ-জাহানপুরের ইংরাজ সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সরকারী বাড়ীগুলো ভেঙ্গে ফেলে দেওয়াতে ইংরাজ সৈন্যেরা খুবই বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। খোলা ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে থাকতে হোত তাদের।

মৌলবীর এ আক্রমণ প্রতিরোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শাহজাহানপুরে আবার স্বাধীনতার সবুজ নিশান উড়ল।

এ সংবাদ যখন স্যার কলিনের কানে এসে পৌছল, তিনি চমকে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই একটা কথা চিন্তা করে তিনি মনে মনে খুবই খুশী হয়ে উঠলেন। একবার যে-সুযোগ তিনি পেয়েও হারিয়েছেন, মৌলবীকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও তাঁকে ধরতে পারেন নি, এবার মৌলবী নিজেই সে সুযোগ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। এবার দেখা যাবে মৌলবী কোন্ পথ দিয়ে পালায়!

স্যার কলিন এবার প্রথম থেকেই অতি সাবধানে আটঘাট বেঁধে কাজ শুরু করলেন। সত্যসত্যই এবার কোনদিক দিয়েই কোন ফাঁক ছিল না। এ বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

শিকারী আর শিকারের মধ্যে বুদ্ধি আর শক্তির কঠিন প্রতিযোগিতা চলছে। তিনদিন পর্যন্ত দু'পক্ষে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলল।

বিদ্রোহীদের অন্যান্য দলপতিরা, যাঁরা বাইরে ছিলেন, তাঁরা নির্বাক দর্শক হয়ে রইলেন না। কি করেই বা থাকবেন ? অযোধ্যার শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা, শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিককে এ সংকটের মুখ থেকে রক্ষা করবার জন্য তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি—নিয়ে এগিয়ে এলেন। মহাবিদ্রোহের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মৌলবী, তাঁকে তাঁরা কোন মতেই হারাতে পারেন না। অযোধ্যার বেগম থেকে নানা সাহেব পর্যন্ত সবাই এসে হাত মেলালেন।

স্যার কলিনের দৃঢ় বেষ্টনী ভিতর ও বাইরের এ বিপুল চাপ সহ্য করতে পারল না। মৌলবী দিবারাত্রি যুদ্ধ করতে করতে সে বেষ্টনী ভেঙ্গে বেরিয়ে এলেন। জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডকে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখা গেল না। প্রতিপক্ষ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

মৌলবীকে এবার সদলবলে বিধ্বস্ত করে দিতে পারবেন, এ বিষয়ে স্যার কলিনের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না। তিনি তাঁর হিসেবের খাতা থেকে মৌলবীর নামটা বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। এ দিকটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি ইতিমধ্যেই হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন যে, সৈন্যরা যেন অতঃপর দুভাগ হয়ে দু'দিকে চলে যায়। কিন্তু তিনি যা কিছু প্লান করেন, মৌলবী তা বরবাদ করে দেন।

স্যার কলিনের পরিকল্পনাকে এভাবে তছনছ করে দিয়ে কোথায় গেলেন মৌলবী ? কোথায়, কতদূরে ? আবার কোন্ দিকে তাঁর পিছে পিছে ছুটতে হবে ? কোথায়, গেলেন মৌলবী ? স্যার কলিন চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন।

খবর পেতে বেশী দেরী হোল না, মৌলবী গেছেন অযোধ্যায় !

হায় হায়, আবার সে অযোধ্যায়! সারা বছরের এত কষ্ট, এত হাঙ্গামা, এত রক্তপাতের ফলে যে-অযোধ্যা থেকে বিদ্রোহীদের নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে, আবার সে অযোধ্যায় !

স্যার কলিন সসৈন্যে অযোধ্যায় গেলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। মৌলবী চলে এলেন রোহিলাখণ্ডে। পেছন পেছন ধাওয়া করে স্যার কলিন চলে এলেন রোহিলাখণ্ডে। যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। আর মৌলবী ? মৌলবী আবার চলে গেছেন অযোধ্যায়।

এ কি বিষম খেলা ! এ খেলার শেষ কোথায় !

এভাবে এ নতুন কায়দায় মৌলবী ইংরাজ সৈন্যদের অতিষ্ঠ করে তুললেন। বিলাতের কাগজগুলোতে মৌলবীকে নিয়ে লেখালেখি চলতে লাগল।

এই বীর বিদ্রোহীর মাথার উপর পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত হয়ে গেল।

মৌলবী অযোধ্যায় ফিরে এসে নতুন শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন। পাওয়েনের রাজাকে যদি পক্ষে টেনে আনা যায়, তা হলে অযোধ্যার বুকে আবার বিদ্রোহের ঝড় তুলে দেওয়া যাবে।

মৌলবী পাওয়েনের রাজার কাছে অযোধ্যার বেগমের নামে একটি অনু-রোধলিপি পাঠালেন। রাজা তার উত্তরে জানালেন, তিনি মৌলবীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে চান। মৌলবী বিশ্বস্ত চিত্তে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

কাছে যেতেই তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, বাইরের ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, প্রাচীরের উপর সশস্ত্র প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে, আর তাদের মাঝখানে বসে আছেন রাজা জগন্নাথ সিংহ ও তাঁর ভাই। এর অর্থ পরিষ্কার। তবু মৌলবী ভয় পেলেন না, হাল ছাড়লেন না; নীচে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় রাজাকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা। রাজা যেমন কাপুরুষ, তেমনি বিশ্বাসঘাতক।

মৌলবী বেশী কথা বলবার সময় পেলেন না। আগে থেকেই সব ঠিক করা ছিল। রাজার ভাই প্রাচীরের উপর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। মৌলবী মাটিতে পড়ে গেলেন। আর উঠলেন না।

বীর দেশপ্রেমিকের বুকের রক্তে মাটি পবিত্র হোল।

হায় রে, আমার দেশ! এ দেশে মীরজাফর আর উমিচাঁদের অভাব কোনদিনই হয় না।

পরদিন সুসভ্য ইংরাজ বিজয় চিহ্নস্বরূপ মৌলবীর মাথা কোতোয়ালীর উপরে ঝুলিয়ে রাখল! আর পাওয়েনের সেই লোভী জানোয়ারটাকে তার এ বিশ্বাসঘাতকতার মুল্য বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হোল।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ইংল্যান্ডে পৌঁছলে পরে সেখানকার লোকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঐতিহাসিক হোমস সাহেব লিখেছেন যে, ইংরাজেরা এ বলে আশ্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল যে, উত্তর ভারতে তাদের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ শত্রুর এতদিনে পতন ঘটল।

মৌলবী সম্পর্কে ঐতিহাসিক ম্যালেসন সাহেব লিখেছেন ঃ "মৌলবী একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। বিদ্রোহের সময় সামরিক নেতা হিসেবে তাঁর যোগ্যতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তবে স্যার কলিনের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি যে-কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাব তুলনাই হয় না। স্যার কলিনকে লড়াইয়ের ময়দানে দু'দুবার নাস্তানাবুদ করতে পেরেছেন, এ অহংকার করবার মত দ্বিতীয় লোক জন্মায় নি।—এভাবে ফৈজাবাদের মৌলবীর মৃত্যু ঘটল। যে লোক স্বদেশের হৃত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে, তাঁর নাম যদি দেশপ্রেমিক হয়, তা হলে মৌলবী একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, সে বিষয়ে এত ও সন্দেহ নেই। তিনি যুদ্ধের

বাইরে হত্যার কাজে তাঁর তরবারীকে কখনোই কলঙ্কিত করেন নি, কোন হত্যাকে প্রশ্রয় দেন নি। যে বিদেশীরা তাঁর দেশ কেড়ে নিয়েছে,তাদের বিরুদ্ধে তিনি বীরের মত সসম্মানে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সংগ্রাম করেছেন। পৃথিবীর যে কোন দেশেই থাকুন না কেন, যাঁরা সত্যিকারের বীর, যাঁদের সত্যিকারের প্রাণ আছে, মৌলবীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁদের শির নোয়াতেই হবে।"

বৃটিশ ঐতিহাসিক যাঁকে সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধার পাত্র বলে বর্ণনা করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি, তাঁর দেশের মানুষ তাঁর সম্বন্ধে কি ভাবে ?

আমরা আজ তাঁর কথা ভুলে গিয়েছি, আমরা আজ তাঁকে চিনি না। এত বড় একটা চরিত্র যে এভাবে অজ্ঞানতা ও অবহেলার আড়ালে চাপা পড়ে গেল এ কেবল আমাদের মত দেশেই সম্ভব।

আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা তাদের পাঠ্য কেতাবে দেশী বিদেশী কত লোকের জীবনীই তো পড়ে, কিন্তু মৌলবী আহম্মদ শাহের জীবন নিয়ে একটি কথাও কি কোথাও থাকে! আমাদের দেশের তরুণেরা সভার মিছিলে কত লোকের নামেই তো জয়ধ্বনি করে, কিন্তু প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকের নাম তাদের জানা নেই।

ভারতের জনৈক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক তাই সেদিন বড় দুঃখের সঙ্গেই বলেছেন, "বর্তমানে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের বীর শহীদদের স্মরণে যে-সব আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে বা অনুষ্ঠিত হবে, তার মধ্যে মৌলবী আহম্মদ শাহের নাম কোন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করতে পারে নি।"

ভারতের ক্ষেত্রে তিনি যে কথা বলেছেন, পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও সে কথা কি তার চেয়ে এতটুকুও কম সত্য ?

বিচিত্র আমাদের দেশ, আর বিচিত্র আমরা !

বদলা চাই

কানপুর শহর আবার ইংরাজদের দখলে এসে গিয়েছে। মাঝখানকার দিন কয়টা যেন একটা স্বপ্ন। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত ইংরাজ সৈন্যরা শহরে এসে ঢুকল। তাদের চোখে বন্য পশুর হিংস্র চাহনি। এবার শুরু হবে প্রতিহিংসা নেবার পালা।

হতভাগ্য কানপুর, কত না বীভৎস দৃশ্য তাকে চোখ মেলে দেখতে হয়েছে! বিদ্রোহী সিপাইরা সাহেবদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। স্ত্রীলোক আর শিশু তাদেরও রেহাই দেয় নি।

শতগুণ রক্তপাত করে সে রক্তপাতের জবাব দিতে হবে। ক্ষিপ্ত ইংরাজ সৈন্যরা আর তাদের নেতা জেনারেল নীল হিংস্র গর্জন করে উঠলেন—বদলা চাই! প্রতিহিংসা নেবার এক বীভৎস পরিকল্পনা খাড়া করলেন। বিবিঘরের মাটি তখনও ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ও শিশুদের রক্তে কলঙ্কিত হয়ে ছিল। নির্দেশ দেওয়া হোল, যারা দোষী বলে সাব্যস্ত হবে, তাদের জিভ দিয়ে চেটে সে রক্ত পরিষ্কার করে দিতে হবে। তারপর

ফাঁসি।

সফর আলী—সেকেন্ড রেজিমেন্ট লাইট ইনফ্যানট্রির দফাদার। তাকেও বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছে। কে এক জন নাকি বলেছে যে, গত ২৭-এ জুন তারিখে সতীচওড়াঘাটের হত্যাকান্ডের সময় এ লোকটি নাকি জেনারেল হুইলারকে হত্যা করেছিল।

সফর আলী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "না হুজুর, একথা ঠিক নয়। একথা যেই বলে থাক, মিছে বলেছে। হুইলার সাহেবের মারা যাবার ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।"

জেনারেল নীল তার কথা বিশ্বাস করলেন না। কে দোষী, কে নির্দোষ, অত বিচার করে দেখবার মত সময় তখন কোথায়! তখন প্রয়োজন ফাঁসিতে ঝোলাবার মত কতগুলো লোক।

সফর আলীকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসা হোল। বিবিঘরের মেঝের উপর যে রক্ত জমে আছে, চেটে সাফ করে দিতে হবে।

"চেটে ফেল, চেটে ফেল, ওই রক্ত তোর জিভ দিয়ে।"

সফর আলী ভয়ার্তভাবে চারিদিকে তাকাল, মিনতি জানিয়ে বলল, "হুজুর আমি নির্দোষ, আমার উপর এমন হুকুম করবেন না।"

শপাৎ করে চাবুক নেমে এল। চাবুকের পর চাবুক—আরও আরও—

ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো সফর আলী, ঝর ঝর করে পিঠ বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। মেজর ব্রুসের মেথর পুলিশ চাবুকের পর চাবুক মেরে চলল, যতক্ষণ পর্যন্ত না—

হ্যাঁ, জেনারেল নীলের আদেশ প্রতিপালিত হয়েছে। ওই দেখ সফর উপুড় হয়ে কুকুরের মত রক্ত চেটে চলেছে। ইংরাজ সৈন্যরা হো হো করে হেসে উঠল।

কানপুরের মানুষ আতঙ্কে ঘৃণায় স্তম্ভিত হয়ে সে দৃশ্য দেখল। সামনেই ফাঁসিকাঠ সাজানো ছিল। তার নীচে সফর আলীকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোল। মাত্র আর কয়েকটি মুহূর্ত তার সম্বল।

দেখতে দেখতে সফর আলীর চেহারা বদলে গেল। ভয় নেই, আতঙ্ক নেই, বিস্ফারিত চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

নির্ভীক, বেপরোয়া সফর আলী ভয় করতে ভুলে গেল। যে সব লোক ভীড় করে দাঁড়িয়ে এ নৃশংস হত্যালীলা দেখছিল,তাদের উদ্দেশ্য করে সফর আলী চিৎকার করে উঠল ঃ "ভাইসব শোন, তোমাদের কাছে আমার এ শেষ কথা। তোমাদের মধ্যে যারা ভাল মানুষ, যাদের বিবেক আছে, ঈমান আছে, তাদের কাছে আমার এ কথাগুলি পেশ করে যাচ্ছি। তোমাদের বাপ-মা আছে, ভাই-বোন আছে, স্ত্রী আছে, বেটা-বেটি আছে, তোমরা জানো, তাদের মায়া মহব্বতের কথা। আজ আমাকে বিনা দোষে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ফাঁসির দড়িতে লটকে দেওয়া হচ্ছে।"

"ভাইসব, তোমরা শুনে রাখো, কোন কসুরই আমি করি নি। তোমাদের মতই আমি নির্দোষ। আমার কোন কথাই শোনা হোল না বিচার করে দেখা হোল না, ওদের মনের আক্রোশ মেটাবার জন্যই আমাকে আজ প্রাণ দিতে হচ্ছে।"

"মরে গেলেও একথা আমি ভুলতে পারব না! মরে গেলেও জ্বালায় আমি দগ্ধ

হতে থাকব, তিলেকের জন্য শান্তি পাব না, যতক্ষণ পর্যন্ত এ হারামী সাহেবের উপর কেউ এর বদলা না নেয়।"

ভাইসব, মরবার আগে আমার আর কোন আকাঙ্খা নেই আর কোন সাধ নেই, প্রতিশোধ, একমাত্র প্রতিশোধ, মরবার আগে এ আমার একমাত্র চিন্তা। আর কোন কথা আমি ভাবতে পারছি না। কিন্তু আমার হয়ে কে নেবে এ প্রতিশোধ, কে আমার এ রূহের জ্বালা মিটাবে।"

"ভাইসব, শোনো, রোটাকে আমার ঘর। আমার এক বাচ্চা ছেলে আছে নাম তার মজর আলী। এসব কথা বুঝবার বয়স তার হয় নি। কিন্তু এক দিন হবে। সেদিন আমার কোন কথাই তো সে জানতে পারবে না। মরবার আগে তোমাদের কাছে এ কাজের ভারটুকু দিয়ে যাচ্ছি, তোমরা সেদিন আমার এ খবরটুকু তার কাছে পৌঁছে দিও। বোলো, এ হারামীরা, এ শয়তান ফিরিঙ্গীরা তার আব্বাজানকে বিনা দোষে মেরে ফেলেছিল, মরবার আগে সকলের সামনে মেথর দিয়ে চাবুক মারিয়েছিল। আর বোলো, আমাকে ফাঁসিতে ঝোলবার আগে মাটি থেকে রক্ত চেটে তুলতে হয়েছে বলো, এতটুকু গোপন করো না। বাপের কাজ আমি কিছুই করে যেতে পারলাম না, কিন্তু তাকে বোলো, ছেলের কাজ সে যেন করে। তাকে বোলো তার আব্বাজান ফাঁসির দড়িতে ঝোলবার আগে তার শেষ আদেশ রেখে গেছে এর বদলা নিতে হবে, আমার জানের বদলে সে হারামীর নয়তো তার ছেলে বা বংশধরের জান নিতেই হবে। যতক্ষণ এ কাজ হাসিল না হয়, ততক্ষণ আমার রূহ্ কিছুতেই শান্তি পাবে না।"

"অ্যায় খোদা, অ্যায় রসুল আমার বেটার হাতে এ তাকতটুকু সেদিন দিও যাতে সে তার এ পবিত্র দায় পূর্ণ করতে পারে।"

এর পরেই সফর আলীর মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সাহেবেরা এ কথা নিয়ে হাসাহাসি করল। মানুষ ক্ষেপে গেলে কত কিছুই না বলে। ত্রিশ বছর

পরের কথা। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ। সফর আলীর ছেলে মজর আলী মেজর নীলের অধীনে কয়েক বছর ধরে কাজ করে আসছে।

মেজরের ভারী পেয়ারের লোক। তার উপরে তিনি খুবই খুশী। কাজের গুণে মজর আলী সব সময়েই তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ পেয়ে আসছে। বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল তার। সুখে শান্তিতে সংসারধর্ম প্রতিপালন করে চলছিল। কিন্তু নীল আকাশের পেছনেও বজ্র লুকিয়ে থাকে।

সেদিন মজর আলী অসুস্থ হয়ে সামরিক হাসপাতালে শয্যা নিয়েছিল। তেমন বড় কিছু রোগ নয় শীগগিরই সেরে উঠবে। সন্ধ্যা হয় হয়, কোথা থেকে এক বৃদ্ধ ফকীর এসে হাজির। মজর আলীর খোঁজ করতে করতে হাসপাতালে এসে উপস্থিত হয়েছে।

ফকীরকে দেখেই মজর আলী চমকে উঠল। ওকে দেখলেই কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। পরনে ঢিলে আলখাল্লা, মাথায় লম্বা রুক্ষ চুলগুলি উড়ছে, চোখের কোণে কিসের একটা ক্রূর সংকেত। মজর আলী জোয়ান সওয়ার, সাহসী বলেই পরিচিত। তবু এই আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর আবছায়ায় একটু নুয়ে পড়া সেই দীর্ঘ দেহটির দিকে

তাকিয়ে মজর আলীর কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল।

ফকীর কোনই ভূমিকা করল না। দেরী করবার সময় তার নেই, কাজটুকু শেষ করেই চলে যাবে। মজর আলীর পাশে বসে, তার কানের কাছে মুখ নিয়ে সে ফিস ফিস করে বলেঃ "বেটা শোন্, এ মেজর নীল সে জেনারেল নীলেরই ছেলে যার হুকুমে তোর আব্বাজানকে বিনা দোষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়েছিল যার হুকুমে তাঁকে কুকুরের মত মাটি থেকে রক্ত চেটে নিতে হয়েছিল। এর বদলা চাই— মরবার আগে তোর বাপ তোর জন্য এ আদেশ রেখে গেছে। এ না হলে তাঁর রূহের শান্তি হবে না! ত্রিশ বছর ধরে এ খবরটা আমি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, এ খবর তোর হাতে পৌঁছে দেবার জন্য বহুদূর থেকে আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে। আঃ খোদাহ্ এবার আমি খালাস। এবার আমি দায়মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত মনে মরতে পারব।"

একটু ইতস্তত করে মজর আলী বলল, সাহেব লোক কিন্তু খুবই ভাল। সবাই তাকে খুব পছন্দ করে।"

ফকীর চাপা কণ্ঠে গর্জন করে উঠল, "কেউটের বাচ্চা কেউটে, ওদের আবার ভাল আর মন্দ! ওদের কারু দাঁতেই বিষ কম নেই। দেখ বেটা, মরদ যদি হোস, বাপের বেটা বলে যদি দাবী করতে চাস্, তবে আর দেরী নয়, কাজ হাসিল কর; আর তা যদি না পারিস, জাহান্নামে যা।"

ফকীর ঝড়ের মতই এসেছিল, ঝড়ের মতই মিলিয়ে গেল। বাইরে তখন মেঘ গর্জন করছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, শোঁ শোঁ করে ঝড় আসছে-ঝড়!

সওয়ার মজর আলী স্থির শান্ত ভাবে তার বিছানায় শুয়ে রইল, একটু নড়ল না, একটু কাঁপল না। কে জানে, কি ভাবছিল সে মনে মনে।

পরদিন ভোরবেলা রোজকার মতই বিউগল বেজে উঠল। সিপাইরা দলে দলে ময়দানে প্যারেড করতে এসেছে। ঘোড়ার উপর বসে মেজর নীল অর্ডার দিচ্ছেন, যেমন রোজ দিয়ে থাকেন। হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। সবাই চমকে উঠল, চেয়ে দেখল মেজর নীলের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। হত্যাকারী কাছেই ছিল। ধরা পড়ল; সওয়ার মজর আলী।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মার্চ তারিখে মজর আলীর ফাঁসি হয়ে গেল।

কেন, কিসের জন্য এ হত্যাকান্ড! লোকে এ নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। দুএকজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ইঙ্গিত করলেন, এর পেছনে স্ত্রীঘটিত ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা কিন্তু রহস্যই থেকে গেল। সরকার তরফ থেকেও এর কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া গেলনা।

কিন্তু মজর আলীর মৃত্যুর পর একটা ইশ্‌তাহার উত্তর ভারতের বাজারে বাজারে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। ইশ্‌তাহারটি উর্দু ও ইংরাজী ভাষায় পরিষ্কার টাইপে ছাপানো। এর উপরের অংশ ছিল রসুলের কাছে মজর আলীর বাপ সফর আলীর শেষ প্রার্থনা। আর নীচের অংশ মজর আলীর ফাঁসির সংবাদ বিজ্ঞাপিত করা

হয়েছে। কারা যে ইশ্‌তাহারটা ছড়াচ্ছিল, সে কথা কেউ বলতে পারে না। ইশ্‌তাহারে লেখা ছিল,

'হে মহম্মদ রসুল! মেজর ব্রুসের মেথর-পুলিশ তোমার এ দীন বান্দাহ্‌র দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে, জেনারেল নীলের হুকুমে তাকে দিয়ে বিবিঘরের রক্তাক্ত মেঝে চাটিয়ে পরিষ্কার করানো হয়েছে, তারপর তাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তোমার এ দীন বান্দাহ্‌র রূহ্‌কে তোমার কাছে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাও। হে রসুল যখন সময় হবে,. তখন আমার ছেলে মজর আলীর বুকে এ প্রেরণা জাগিয়ে দিও যেন জেনারেল নীল বা তার বংশধরদের উপর সে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে।"

"দ্রষ্টব্য-সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া হর্সের সেকেন্ড রেজিমেন্টের সওয়ার মজর আলী ঐশী প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মার্চ মধ্যভারতের অন্তর্গত 'আগার' এ মেজর এ. এইচ.এস. নীলকে গুলী করে হত্যা করেছে। গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট স্যার লেপেল গ্রিফিন-এর আদেশে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।"

জানি না, সফর আলীর রূহ্‌ এতে শান্তি পেয়েছিল কিনা।

আর দু'দিন বাদে ?

হ্যাঁ; আজিজন, আর দু'দিন বাদে।

তুমি বল কি শামসুদ্দিন, আর দু'দিন বাদেই আমরা-

হ্যাঁ দু'দিন বাদেই আমরা ফিরিঙ্গীদের হাত থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করব।

সব ঠিক ?

হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।

কাল সন্ধ্যায়। গঙ্গার উপরে। মুসলমানেরা পাক কোরআন ছুঁয়ে আর হিন্দুরা গঙ্গার পানি ছুঁয়ে কসম করেছে, জান দিতে তারা কসুর করবে না!

কে কে ছিলেন সেখানে ?

আর আমাকে প্রশ্ন কোরো না আজিজন, আর বেশী জানতে চেয়ো না। অনেক কথাই বলে ফেলেছি, যা আমার কোন মতেই বলা উচিত ছিল না।

কেন বললে ?

কি জানি কেন, কি যেন যাদু জান তুমি, তোমার কাছে না বলা পর্যন্ত মনটা ভরে ওঠে না।

আচ্ছা শামসুদ্দিন, একটা কথা। যা তুমি বলছ, তাই যদি হয়, সত্যসত্যই যদি আমরা স্বাধীন হতে পারি, তাতে আমাদের লাভটা কি হবে বলতে পার ?

তুমি বল কি আজিজন, লাভ হবেনা ? দেশের মানুষ খেয়ে পরে সুখে থাকবে, সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবে, সবাই নির্বিঘ্নে যে যার ধর্ম কর্ম করতে পারবে, আর কি চাই ?

আর একটা কথাও বলতে পারতে, বললে না তো ? সওয়ার শামসুদ্দিনের পদোন্নতি হবে, তার অনুগৃহীতা আজিজনের দু'এক খানা গয়না বাড়বে।

তুমি কি আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করছ আজিজন ?

না শামসুদ্দিন, বিদ্রূপ নয়। অনেক দুঃখে এসব কথা বেরিয়ে আসে। জানি, স্বাধীন দেশে তোমরা স্বাধীন মানুষের মর্যাদা পাবে, কিন্তু সে শুভ দিনে পতিতা তো পতিতাই থাকবে, পতিতাকে কি আর মানুষ বলে মনে করবে কেউ ?

কেন, পতিতা কি মানুষ নয় আজিজন, তুমি কি জান না আমরা ২ নং ক্যাভেলরির সওয়াররা কি চোখে তোমাকে দেখি ?

না শামসুদ্দিন, না তুমি আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিতে চেষ্টা কোরো না : আমি কি জানি না, আমি কি ? তোমরা আমাকে ভালবাসতে পার, আদর করতে পার, কিন্তু মর্যাদা দিতে পার না। কিন্তু কি করব আমি, আমার এ জীবনের জন্য আমিই কি দায়ী !

আজ এ আনন্দের দিনে অমন দুঃখের সুর টেনে আন কেন আজিজন ?

তুমি তো জান না শামসুদ্দিন, আনন্দের দিনেই আমার দুঃখ যেন শত গুণ হয়ে দেখা দেয়। একথা তুমি বুঝবে না, কেউ বুঝবে না, যার বোঝার সেই শুধু বোঝে। পতিতা পতিতাই, সেকথা অস্বীকার করব কি করে ! কিন্তু তা হলেও আমি একথা অনুভব করতে পারি যে, পতিতাও মানুষ।

এ কথা আমি স্বীকার করি।

না, তা কর না; করতে পার না। মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে আমাকে ভুলাতে চেয়ো না। আমিও যে মানুষ, সেকথা আমিই শুধু জানি, আর কেউ জানে না। একদিন একথা আমি প্রমাণ করে দেখাব। হ্যাঁ, আমি সকলের কাছে প্রমাণ করে দেখাব।

প্রমাণ ? কি করে প্রমাণ করবে ?

যেদিন তোমরা ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, সেদিন তোমরা আমাকে তোমাদের পাশেই পাবে। যদি প্রয়োজন হয়, বুকের রক্ত দিয়ে এ কথা প্রমাণ করে দিয়ে যাব। সেদিন তোমরা আমাকে নর্তকী বলে নয়, সুন্দরী বলে নয়, প্রেমের পাত্রী বলে নয়, মানুষ বলেই চিনবে। মানুষ বলেই মর্যাদা দেবে। বিশ্বাস হয় ?

হয়। আমি জানি তোমার অসাধ্য কিছুই নেই।

আজিজন সেদিন এতটুকু মিছে বলে নি। যা বলেছিল কাজেও তাই দেখাল। যখন সময় এসে ডাক দিল, সাড়া দিতে এতটুকু দেরী সে করে নি। কানপুরের মানুষ সেদিন তাদের সুপরিচিতা পতিতা আজিজনকে এক নতুন দৃষ্টি নিয়ে দেখল।

বিদ্রোহের ডামাডোলের মাঝখানেও এটা কারো দৃষ্টি এড়ায় নি। পুরুষের পোশাকে নর্তকী আজিজন ঘোড়ায় চড়ে চলেছে বিদ্রোহীদের পাশে পাশে। তার কোমরে ঝুলছে তরোয়াল, হাতে পিস্তল। কানপুরের সে ভয়ংকর দিনগুলোতে অচল নিষ্ঠার সঙ্গে সে তার কর্তব্য করে চলেছে। গোলন্দাজ বাহিনীর ফৌজেরা ক্লান্তিতে, তৃষ্ণায় ধুঁকছে। পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আজিজন। ক্লান্ত সৈনিক তার হারানো শক্তি ফিরে পেয়েছে, উৎসাহে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। পানি নিয়ে, দুধ নিয়ে, খাবার নিয়ে ঘুরে ঘুরে ফিরছে আজিজন। তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত সিপাইদের মধ্যে বিতরণ করে চলেছে।

এ কাজের জন্য কেউ তাকে ডাক দেয় নি। আপনার জায়গা সে আপনিই তৈরি করে নিয়েছে।

নানকচাঁদের মত ইংরাজদের একান্ত অনুগত দালাল এ দৃশ্য তাঁকেও মুগ্ধ করেছিল। বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর কুখ্যাত ডাইরীতে তীব্র বিষ ঢেলে দিয়েছেন, তাঁর চোখে বিদ্রোহীরা পাজী, বদমাস ও শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার সে নানকচাঁদই ২/৩টি ছত্রের মধ্যে দিয়ে আজিজনের যে উজ্জ্বল ছবিটি এঁকে তুলেছেন, তা ভোলবার মত নয়ঃ

"পতিতা আজিজন অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। বীর সজ্জায় সুসজ্জিত আজিজন, তার হাতের অস্ত্র কখনোই নামে না। যেখানে যুদ্ধের তীব্রতা সব চেয়ে বেশী সে ব্যাটারির কাছেই তাকে সব সময় উপস্থিত দেখতে পাওয়া যায়। সওয়ারদের মধ্যে যারা ক্লান্ত ক্ষুধার্ত, তাদের সে ডেকে নিয়ে আসে প্রকাশ্যে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে দুধ বিতরণ করে।"

আজিজন নগণ্য বেশ্যা। ইতিহাস তাকে ধরে রাখে নি। ঐতিহাসিক তার জীবন নিয়ে অনুসন্ধান করেন নি। কিন্তু সে রক্ত-ঝরা ভয়াল বিদ্রোহের দিনে আজিজন আপনাকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিল যে, তাকে একেবারে হারিয়ে ফেলবার উপায় নেই। অতীতের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে মুহূর্তের মত ঝিলিক মেরে

পরক্ষণেই আবার সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরবর্তী কালে বৃটিশ তদন্ত কমিটির কাছে কানপুরের বণিক জানকী প্রসাদের জবানবন্দীতে আর একবার আজিজনের উল্লেখ পাই। তিনি তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেনঃ

কুল্লুমল-এর রক্ষিত আজিজন, হ্যাঁ, চিনি বই কি তাকে। সে লাড়কি মাহলের উমরাও বেগমের বাড়ীতে থাকত। ২নং ক্যাভেলরির সওয়ারদের সঙ্গে তার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল, সওয়ারদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত। যেদিন সবুজ নিশান তোলা হয়েছিল সেদিন দেখে ছিলাম তাকে পুরুষের বেশে ঘোড়ার উপর বসে আছে। তার গলায় পদকের মালা ঝুলছে দুহাতে দুই পিস্তল। সেদিন সে জেহাদীদের দলে যোগ দিয়েছিল। সেদিন তাকে দেখেছিলাম শুধু আমি নই, হাজার হাজার দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ ছিল।"

আজিজনকে শেষবারকার মত দেখি তার নিজের জবানবন্দীর সময়। বিদ্রোহ শেষ হবার বছর দুই বাদে যে তদন্ত কমিটি বসেছিল তার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার বিদ্রোহে যোগদানের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গেল। স্বীকার করবেই বা কেন?

শুধু নিজেকেই নয়, যাদের উপর বিপদ আসবার আশঙ্কা ছিল, এ জবানবন্দীর মধ্য দিয়ে সে তাদের সবাইকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। নানা সাহেব ও আজিমুল্লাহ ধরা পড়েন নি, আর পড়লে ও তাঁদের চরম দন্ড থেকে অব্যা- হতি পাবার কোনই

সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই সে নিশ্চিন্ত মনে তাঁদের উপরেই সমস্ত দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

আজিজনের জবানবন্দীর যে-অংশটুকু পাওয়া গেছে, তা এখানে উপস্থিত করা হোলঃ

প্রশ্ন– বিদ্রোহের আগে ২নং ক্যাভেলরির কোন কোন সওয়ার তোমার কাছে যাওয়া আসা করত ?

উত্তর– আমি তখন কুল্লুমলের রক্ষিতা ছিলাম, কাজেই ২নং ক্যাভেলরির কোন সওয়ারই আমার কাছে আসতে পারত না।

প্রশ্ন– বিদ্রোহের দিন দুই আগে সওয়ার শামসুদ্দিন কি তোমার বাসায় গিয়ে বলেছিল যে, ২।১ দিনের মধ্যেই পেশোয়ার শাসন আবার কায়েম হবে এবং নানাই হবেন তার সর্বাধিনায়ক ?

উঃ– বিদ্রোহের আগে সওয়ার শামসুদ্দিন খাঁ আমার বাসায় কোন দিন আসেন নি। তাঁকে আমি চিনি না। যদি এসে থাকেন, আমার জ্ঞাতসারে নয়।

প্রঃ– কানপুরে যে-ধর্মীয় নিশান তোলা হয়েছিল, সে সম্পর্কে তুমি কি জান ?

উঃ– শুনেছি আজিমুল্ল্যাহ্ খাঁ এ নিশান তুলেছিলেন। মৌলবী আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আপত্তিতে কোনই কাজ হয় নি।

আজিমুল্লাহ্ শহরবাসীদের এ উৎসবে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলে দিয়েছিলেন; যারা না আসবে, তাদের তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

স্বাধীনতার সংগ্রামের দীপ্ত আভায় পতিতা আজিজন জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল। তারপর ? কোথায় গেল আজিজন ? যে তিমিরে, সে তিমিরে ? কে বলবে সে কথা! হঠাৎ জ্বলে ওঠা এ উল্কা ভস্ম হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল কে জানে!

সভ্যতার অবদান

অযোধ্যার কবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন ? আর ইলিয়াড রচনা করেছিলেন গ্রীসের কবি হোমার। লঙ্কার কবি ও ট্রয়ের কবির উপর যদি কাব্য রচনার ভার পড়ত, তাহলে সে কাব্যের রূপ কেমন হোত কল্পনা করা সহজ নয়।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় বিদ্রোহের ইতিহাস পড়তে পড়তে সে কথাই মনে পড়ে। এ ইতিহাস-সম্বন্ধে যাই ধারণা করি না কেন সব কিছুর উপর বৃটিশ ঐতিহাসিকের চিন্তা এসে প্রভাব বিস্তার করবেই। এ সম্বন্ধে যতই সজাগ থাকবার জন্য চেষ্টা করি না কেন, প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার কোনই উপায় নেই।

বৃটিশ ঐতিহাসিক সিপাইদের নিষ্ঠুর নারীহত্যা ও শিশুহত্যার যে- বর্ণনা দিয়েছেন তা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা হয়েছে। অতিরঞ্জিত হলেও, এর কিছুটা সত্য, একথা অস্বীকার করা যায় না। এগুলি অবশ্যই নিন্দনীয়। বিদ্রোহের পক্ষে এতে লাভ হয় নি, ক্ষতিই হয়েছে।

কিন্তু অপর দিকটা ?

"আঠারো শো সাতান্নের বিদ্রোহের" লেখক অশোক মেহতা লিখেছেন ঃ

"বৃটিশের কুকীর্তি আমাদের আচরণকে ম্লান করে দিয়েছে, অথচ তাদের মিথ্যা প্রচারকার্য আমাদের অপরাধকেই জোর তুলিতে অঙ্কিত করেছে, তাদের নিজেদের অপকার্য আছে চাপা।"

তাদের নিজেদের বহু অপকার্যই চাপা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু বৃটিশ ঐতিহাসিকদের নিজেদের লেখার মধ্যেও মাঝে মাঝে যে দুটো একটা খবর দেওয়া হয়েছে, যে দু' একটা মন্তব্য করা হয়েছে, তা পড়লে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। বাইরের মানুষের কথা দূরে থাক, আমাদের দেশের মানুষেরাও সে খবর রাখে না।

সুসভ্য ইংরাজের কীর্তি কাহিনীর কয়েকটি চিত্রঃ

দিল্লী

বাদশাহের সঙ্গে ছিলেন চার জন শাহ্জাদা–মীর্জা মোগল, মীর্জা আবুবকর, মীর্জা খিজির সুলতান এবং মীর্জা মেদ্দ। দুর্গ থেকে বাইরে এসে দাঁড়াতেই ইংরাজ সৈন্যরা তাঁদের ঘিরে ধরল। বাদশাহ্কে পাল্কীতে করে নিয়ে যাওয়া হোল। শাহ্জাদারা চললেন গরুর গাড়ীতে। ইংরাজ মহিলাও শিশুদের যেখানে হত্যা করা হয়েছিল সে দেওয়ান-ই-আম-এর সামনে গিয়ে পৌছলে পরই শাহ্জাদাদের গুলি করে মারা হোল। শহরের লাহোর গেট থেকে কাশ্মীর গেট পর্যন্ত সমস্ত এলাকা লুণ্ঠিত হয়ে গেল। মীর্জা বুখতওর শাহ্ পরে ধরা পড়লেন। তাঁকেও হত্যা করা হোল। বাদশাহের দেহরক্ষকদের নায়ক শাহ্ সাহাদ খাঁ কাশ্মীর গেট দিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। জুজ্জুরের রাজার সৈন্যদের সেনাপতি বলে সনাক্ত করা হলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হোল।

শহরে কারো জীবনই নিরাপদ ছিল না। যে-সব সমর্থ পুরুষকে পাওয়া গিয়েছে, তাদের সবাইকে বিদ্রোহী বলে গুলি করে মারা হয়েছে। দাদরার রাজার ভাইপো মহম্মদ আলী নিরাপত্তার জন্য দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কয়েকজন গুর্খাও গোরা

সৈন্য লুটপাট করছিল, তারা দেয়াল বেয়ে উপরে উঠল। একজন ধাত্রী ওদের দেখে এতই ভয় পেল যে, সে তার শিশুটিকে নিয়ে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাড়ীর অন্যান্য মহিলারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সে কুয়োতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করল।

মহম্মদ আলী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বন্দুক চালালেন। তাঁর গুলিতে তিন জন গোরা সৈন্য মারা গেল। তখন বড় একদল সৈন্য এসে সে বাড়ীটা আক্রমণ করল

এবং বাড়ীর সব ক'টি লোককে হত্যা করল। মহম্মদ আলী শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলেন।

অস্ত্রশস্ত্র সহ ষাট জন লোককে পাওয়া গিয়েছিল, তাদের সবাইকে মেরে ফেলা হোল। এদের মধ্যে মহামেডান কলেজের অধ্যাপক শেখ ইমাম বকস ও তাঁর ছেলেরা ছিলেন। যাঁরা যাঁরা মারা গেলেন তাঁদের মধ্যে সুপরিচিত হেকিম ফল্লাউল্লাহ খাঁও ছিলেন। বাদবাকী যাঁরা, তাঁরাও কেউ বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

মৌলবী ফরিদউদ্দীন সকালবেলার নামায সেরে বাড়ীর দিকে ফিরছিলেন। তখন ইংরাজ সৈন্যরা শহরে ঢুকে পড়েছে। পথে তাদের সঙ্গে দেখা। তাদের হাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। হাকিম আহমদ হোসেনও হাকিম রাজিউদ্দীন খাঁ একই ভাবে পথের উপর মারা গেলেন। মীর্জা ইউসুফ খাঁর অনেক দিন ধরেই মস্তিষ্কবিকৃতি চলছিল। বন্দুকের শব্দ শুনতে পেয়ে ব্যাপার কি দেখবার জন্য পথে বের হয়েছিলেন, তাঁকেও হত্যা করা হয়। এছাড়াও শহরের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে বিদ্রোহী সন্দেহে হত্যা করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নবাব মুজফ্‌ফরুদ্দৌলাহ্, মহম্মদ হোসেন খাঁ, মীর্জা আহমদ খাঁ, মীর মহম্মদ হোসেন খাঁ, আকবর খাঁ, মীর খাঁ, নৌশির খাঁ, হাকিম আবদুল হক, খলিফা ইসমাইল, মহম্মদ খাঁ, রিসালদার বেগ খাঁ ও আর্সবুজু ইয়ার খাঁ। এ ছাড়া বাদশাহের পরিবারের শাহ্‌জাদারা তো আছেনই। তরুণ বৃদ্ধ সবাইকে হত্যা করা হয়েছে, দোষী, নির্দোষ সকলেরই একই পরিণতি ঘটেছে। যারা কোন রকমে তরোয়ালের মুখ থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তাদের জন্য ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরি ছিল। যতদিন পর্যন্ত স্যার জন লরেন্স শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে আদালত খুলে না বসলেন, ততদিন কত লোক-যে মারা গেল তার হিসেব নেই। তারপর শুরু হোল অপরাধীদের বিচার। যার সঙ্গে যার শত্রুতা ছিল, সেই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে চলল। নির্দোষ ও অসহায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের হত্যার প্রতিহিংসা-যে এভাবে নেওয়া হবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

[মার্টিন-রচিত 'ইন্ডিয়ান এম্পায়ার']

দিল্লীর প্রাচীরের মধ্যে যারা বাস করছিল, তারা সকলেই এখন ইংরাজ পক্ষের সৈন্যদের শত্রু; সুতরাং তারা বধ্য বলে পরিগণিত হয়েছিল।

[লর্ড রবার্টস-রচিত 'ফরটিওয়ান ইয়ারস্ ইন ইন্ডিয়া']

৫৮

বিদ্রোহীরা প্রায় এক শত আহত ও রুগ্ন সিপাহিকে নিজেদের শিবিরে ফেলে রেখে গিয়েছিল। ক্যাপটেন হডসনের সৈন্যরা এ নিঃসহায় জীবদের সকলকেই হত্যা করে। কয়েক জন আহত সিপাই দরবার গৃহের বারান্দায় শুয়ে ছিল। ইংরাজ সৈন্যদের সঙ্গিনের আঘাতে এদেরও মৃত্যু হয়।একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার লিখেছিলন ঃ "তরোয়ালের আঘাতে একজন সিপাইর দুহাত কাটা গিয়েছিল, শরীরে বন্দুকের গুলি বিঁধেছিল, পেটের দুজায়গায় সঙ্গিনের আঘাত লেগেছিল। লোকটি তখনও বেঁচে ছিল। একজন ইংরাজ সৈনিক এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত, নিঃসহায় ও নিরবলম্বন লোককেও রেহাই দিল না। তার বন্দুকের গুলিতে এর মাথার ঘিলু বেরিয়ে পড়ল। এ দৃশ্য দেখে আমার মনে-যে কি ঘৃণা ও লজ্জার উদ্রেক

হয়েছিল, তা বলবার নয়।"

[মার্টিন-রচিত 'ইন্ডিয়ান এম্পায়ার']

দোষী আর নির্দোষ সবাই একই সঙ্গে মরেতে লাগল। ইংরাজ সৈন্যরা যাকে রাস্তায় দেখতে পেল তাকেই গুলি করে মেরে চলল। শহরে এমন ক'জন লোকও ছিলেন, যাদের তুল্য মানুষ কখনও জন্মায় নি জন্মাবেও না। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উৎকৃষ্ট লেখক মিএা মহম্মদ আমীন পনজকুশ, মৌলবী ইমাম বক্স সরভাই ও তাঁর দুই ছেলে, মীর নিয়াজ আলী প্রভৃতি। এঁদের এবং কুচাছেলানের অধিবাসীদের (শোনা যায় তারা সংখ্যায় ছিল চৌদ্দ শো) রাজঘাট গেটে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাদের গুলি করে হত্যা করে। মৃতদেহগুলি যমুনার পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হোল ঘরের মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সন্তানদের নিয়ে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিল। কুচাছেলানের সবগুলি কুয়ো মৃতদেহে ভর্তি হয়ে গেল। আমার কলম আর বেশী লিখতে সাহস করছে না।

[জহির দেহলভী রচিত 'দস্তন-ই-গদর']

কবি গালিবের লেখায় সেদিনকার দিল্লীর করুন অবস্থার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেনঃ

'শহর হো গৈ সাহারা। শহর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। উর্দু বাজার গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে, উর্দু ভাষা আর বলবে কে? দিল্লী আর সে মহানগরী নেই, তার দুর্গ, তার শহর, তার দোকানপাট, তার ফোয়ারা সব কিছুই গেছে। হিন্দু মহাজনেরা আছে, কিন্তু ধনী মুসালমান আর নেই বললেই চলে।"

"সম্মুখে আমার রক্তের মহাসমুদ্র, খোদাই শুধু জানেন আমাকে আরও কত কি দেখতে হবে! আমার হাজার হাজার বন্ধু আজ মৃত্যুশয্যায় লীন। আমি কার কথা স্মরণ করব, কার কাছে আমার প্রাণের ব্যথা জানাব! আমার জন্য চোখের পানি ফেলবে, এমন একটি প্রাণীও আজ জীবিত নেই।"

'দিল্লী কোতল-এ-আম-এ (পাইকারী হত্যাকান্ড) হাকিম রেজাউদ্দীনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আহম্মদ হোসেন ও তাঁর ছোট ভাইকেও হত্যা করা হোল

ঐ দিনই। তালিয়ার খানের দুই ছেলে তংক থেকে এসেছিল, বিদ্রোহ দেখা দেওয়াতে তারা আর ফিরে যেতে পারে নি। তাদের গুলি করে মারা হয়েছে আজ।"

কবি গালিবের চোখে ঘুম নেই। এ অন্ধকারের মধ্যে তিনি বিভ্রান্ত, দিশাহারা। সে আবেদন তাঁর কবিতায় ঝংকৃত হয়ে উঠেছে।

কোই উম্মীদ বাড় নাহি আতি,
কোই সুরৎ নজর নাহি আতি'
মৌত্‌কা একদিন মোয়াইন হ্যায়,
নিদ কিউ রাতভর নাহি আতি।

কোনখানে নেই আশার লেশ, কোনখানে নেই সুন্দরের আভাস, মরণের দিন স্থির হয়েছে,—সারারাত কেন কারো চোখে নামে নি ঘুম।

[গালিব-রচিত 'দস্তমবু']

বারাণসী

বারাণসীর সিপাইদের অভ্যুত্থানের পর জেনারেল নীল নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে "শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্য" ইংরাজ ও শিখ সৈন্যদের নিয়ে কয়েকটি "শান্তি বাহিনী" গঠন করলেন। এ শান্তিবাহিনীগুলো শান্তি রক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে ফিরত। যাকে দেখতে পেত, হয় কেটে ফেলত, নয়তো তার ফাঁসির ব্যবস্থা করত। ফাঁসির সংখ্যা দিন দিন এতই বেড়ে যেতে লাগল যে, একটা ফাঁসিকাষ্ঠ দিয়ে আর কুলানো যাচ্ছিল না, যদিও সারাদিনের মধ্যে তার কাজের কামাই ছিল না। তাই কাজের সুবিধার জন্য এক লাইন ধরে অনেকগুলো ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরি করানো হোল। কিন্তু অত্যধিক কাজের চাপে সবাইকে পুরোপুরি মেরে ফেলা সম্ভব হোত না, অনেককে আধমরা অবস্থাতেই ফেলে দিতে হোত।

ইংরাজরা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল, ক্রমাগত গাছ কেটে কেটে ফাঁসি-কাষ্ঠ তৈরি করার কোনই মানে হয় না। তখন তারা গাছগুলোকেই ফাঁসিকাষ্ঠে পরিণত করল। গাছের ডালে ডালে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে লাগল। দিনের পর দিন এ "সামরিক কর্তব্য" ও "খ্রীস্টান-দায়িত্ব" প্রতিপালনের গতি হু হু করে বেড়ে যেতে লাগল। এ গুরুতর প্রয়োজনীয় দায়িত্ব প্রতিপালন করতে গিয়ে মাঝে মাঝে যখন একঘেয়ে বলে মনে হোত, তখন বৈচিত্র্য ও আমোদ পরিবেশনের জন্য নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করতে হোত। মনে করুন, যাকে ফাঁসি দেওয়া হবে: হাতীর পিঠে বসিয়ে দেওয়া হোল। হাতীটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। গাছের ডাল থেকে যে-দড়ির ফাঁসটা ঝুলছে, সেটা গলায় এঁটে দিয়ে হাতীটাকে হঠাৎ সরিয়ে নেওয়া হোল।

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা কৌতুকের দিক রয়েছে। শিল্পীজনোচিত রুচিবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্যের অন্ধকারকে আলোকিত করে তোলবার জন্য যারা সভ্যতার মশাল নিয়ে বেরিয়েছে, তাদের দায়িত্ব বড় কঠিন। কিন্তু যতই

কঠিন হোক না কেন, এই দায়িত্ব পূর্ণ করতে তারা কখনোই পিছিয়ে পড়েনি।

কালো কুৎসিত লম্বিত দেহের একঘেয়ে ছবি দেখতে দেখতে চোখের ক্লান্তি জাগে। তাই তারা মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করত। "এ একঘেয়েমিকে ভাঙ্গবার জন্য তারা সোজাসুজি না ঝুলিয়ে দেহগুলোকে ভেঙ্গে চুরে বিকৃত করে, কোনটাকে ইংরাজী অঙ্ক চার-এর মত, কোনটাকে বা সাত-এর মত করে নিয়ে তারপর ঝোলাত।"

[কে এন্ড ম্যালেসন-রচিত 'হিস্টরি অব ইন্ডিয়ান মিউটিনি']

অবশেষে নতুন একটা কৌশল খুঁজে পাওয়া গেল। এ পন্থাটা এমন চমৎকার ও সহজ যে, এর পর থেঁকে ফাঁসি দেওয়ার রীতিটা তুলে দিয়ে এ নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যেই কাজ চলতে লাগল। এক দিক থেকে গ্রামের পর গ্রাম মাটির সঙ্গে সমান করে দেওয়া হতে লাগল। গ্রামের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চারদিক ঘেরাও করে বন্ধুক নিয়ে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে পাহারা দাও, হাজার হাজার মানুষ পুড়ে মরতে কতক্ষণ বা সময় লাগে! এতে শিকারের আনন্দ পাওয়া যায়, তা ছাড়া ব্যাপারটা কৌতুকপ্রদও বটে।

ইংরাজদের কাছে এ জিনিসটা এতই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল যে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চিঠির মধ্যে এ মজাদার কাহিনীগুলোকে বেশ রসিয়ে রসিয়ে লিখত। এমন নৈপুন্য ও দ্রুততার সঙ্গে আগুন লাগানো হোত যে, গ্রামবাসীরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ পেত না।

"হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মন-পন্ডিত-মৌলবী, স্কুলের ছাত্র, শিশুকে বুকে নিয়ে মা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অন্ধ-খোঁড়া সবাই এ অগ্নিকুন্ডে জ্বলে পুড়ে মরত। চলৎশক্তিহীন স্থবির বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আগুন দেখেও এক পা সরতে পারত না, জ্বলন্ত বিছানায় ছটফট করে মরত।"

[চার্লস বল-রচিত ইন্ডিয়ান মিউটিনি']

কোন লোক যদি এ অগ্নিবেষ্টনী ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারত, তাতেই বা কি! একজন ইংরাজ সৈন্য তার চিঠিতে লিখেছে ঃ

"আমরা জনপূর্ন বড় একটি গ্রামে আগুন লাগিয়ে চারদিক ঘেরাও করে রইলাম। আগুনের মুখ থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য অনেকেই ছুটে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গেই গুলি চালালাম।"

[চার্লস বল-রচিত ইন্ডিয়ান মিউটিনি']

একি শুধু দুটো চারটে গ্রামের কথা! গ্রামগুলোকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করবার জন্য এ উদ্দেশ্যে সংগঠিত বিভিন্ন দলকে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল। তাই একটি দলের একজন অফিসার তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, "শুনে খুশী হবে, আমরা কুড়িটি গ্রামকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছি।"

এ সমস্ত ঘটনা নিয়ে কোন ঐতিহাসিক বিস্তারিতভাবে কিছু লেখেন নি। কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে যে-সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, এসব তার থেকেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে একজন লিখেছেন, "জেনারেল নীলের প্রতিশোধ গ্রহণ-সম্পর্কে কোন কথা না লেখাই ভাল।"

বারাণসীতে বিদ্রোহীদের দ্রুত শাস্তি বিধানের জন্য মিলিটারী কোর্ট বসানো হয়েছিল। মিলিটারী কমিশনাররা ছোট বড় সমস্ত অপরাধীকেই ফাঁসির হুকুম দিয়ে চলতেন।

একদিন বিচারে কয়েকটি বালকের ফাঁসির হুকুম দেওয়া হোল। ওদের অপরাধ এই যে, বড়দের দেখাদেখি ওরা, খেলার সাথীরা মিলে সবুজ নিশান উড়িয়ে, ঢাক পিটিয়ে রাস্তায় মিছিল বের করেছিল। ছেলেমানুষ, আগুন নিয়ে খেলা করতে গেলে-যে কি কি বিপদ ঘটতে পারে, সেকথা ওদের জানা ছিল না। বিচারকদের মধ্যে একজন অফিসার একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন, ছেলে- মানুষ, বয়সের কথা বিবেচনা করে, দয়া করে এদের শাস্তি কমিয়ে দিলে ভাল হয়।" কম্যান্ডিং অফিসার দুর্বলচিত্ত লোক নন, কোন রকম দুর্বলতার প্রশ্রয় তিনি দেন না। তিনি দয়া দেখাতে রাজী হলেন না। অবিচলিত কণ্ঠে বললেনঃ এসকল বিষয়ে বয়সের হিসেব করা যুক্তিযুক্ত নয়। ইউরোপে আমরা যাদের বালক বলি, এদেশে তারা বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা। এ বয়সে তাদের বিয়ে হয়, পুত্রকন্যা জন্মে, যৌবনের সমস্ত শক্তি প্রবল থাকে, তারা তাদের স্বাধীনতা ও সমস্ত কাজের দায়িত্ব বুঝতে পারে।"

এলাহাবাদ

একজন বৃটিশ অফিসার তাঁদের এলাহাবাদের সাফল্য-সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে কিছুটা তুলে দেওয়া হোলঃ

"আমাদের এবারকার যাত্রা অদ্ভুত রকম উপভোগ্য হয়েছে। আমরা নদীপথে স্টীমারে চলেছি, আর শিখ ও ফুসিলিয়ার বাহিনীর সৈন্যেরা হেঁটে শহরের দিকে চলেছে। আমাদের সঙ্গে একটা কামান। ডাইনে বাঁয়ে দুদিকে কামান দাগতে দাগতে আমরা এগিয়ে চলেছি। কতদূর যাবার পর স্টীমার আর চলল না। আমরা নেমে হেঁটে চললাম। আমার সঙ্গে ছিল আমার পুরানো দোনলা বন্দুকটা। তাই দিয়ে

বেশ কয়েকটা নিগারকে ধরাশায়ী করলাম। প্রতিহিংসায় আমি তখন একবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছি। আমরা যে পথ দিয়ে যাই, দুদিকে আগুন লাগিয়ে যাই। অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করে, আর বাতাসের বেগে হুহু করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতদিনে বিশ্বাসঘাতক শয়তানগুলোর প্রতিশোধ নেবার দিন এসেছে। আমরা প্রতিদিন এ অভিযানে বের হই, বিক্ষুব্ধ গ্রামগুলোকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেই। আমরা আমাদের প্রতিহিংসা পূরণ করে চলেছি। নেটিভদের বিচারের জন্য যে কমিশন বসানো হয়েছে, আমাকে তার নেতা হিসেবে মনোনীত করেছে। এদের সবার পরমায়ু আমাদের হাতেই ঝুলছে। একথা তুমি স্থিরভাবে জেনে নিও, আমরা কাউকে রেহাই দেই না।"

"পথের দুধারে গ্রামগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। যে-গ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে চলেছি, তার চেয়ে শূন্যতার ছবি আর কল্পনা করা যায় না। পথের দুধারে পচা জলাভূমি, পুড়ে যাওয়া কুঁড়েগুলোর কালো কালো ধ্বংসাবশেষ, তার উপর ছাতা পড়েছে। মানুষের অস্তিত্বের পরিচায়ক এতটুকু শব্দও শোনা যায় না। শব্দের মধ্যে শুধু ব্যাঙের ডাক, শেয়ালের তীক্ষ্ণ চিৎকার, আর অদৃশ্য সহস্র সহস্র পতঙ্গের একটানা মৃদু গুঞ্জন। নিমফুলের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের ডালে গলিত মৃতদেহগুলো ঝুলছে, শুয়োরগুলো তাই নিয়ে মহোৎসবে মেতে গেছে, তারই উৎকট দুর্গন্ধ বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে। এ সমস্ত কিছু মিলে আমাদের মধ্যে যে-শূন্যতা, কালিমা ও বেদনার ছবি রচনা করে তুলেছে আমার মনে হয় যারা সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল তারা জীবনে কোনদিন তা ভুলতে পারবে না।"

মুসলমানদের শুয়োরের চামড়া দিয়ে সর্বাঙ্গ মুড়ে সেলাই করা হোত, তারপর ফেলে দেওয়া হোত নদীতে; কিংবা শুয়োরের চর্বিতে ভিজিয়ে তাঁদের ফাঁসি দেওয়ার হোত এবং মৃতদেহ আগুনে দগ্ধ করা হোত। হিন্দুদের ফাঁসি দেওয়ার আগে গোমাংস মুখে পুরে দেওয়া হোত। ফতেগড়ের দেওয়ানকে হত্যা করার আগে তার মুখে জোর করে গোমাংস পুরে দেওয়া হয়েছিল।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবের মিঞামীরের বিদ্রোহী সিপাইরা দুজন অফিসারকে হত্যা করে। নেটিভদের এমন স্পর্ধা! এমন শিক্ষা দেওয়া দরকার যাতে চিরদিন মনে থাকে। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার ফ্রেডারিক কূপার নিজের কীর্তিকাহিনী নিজের মুখেই প্রকাশ করেছেন ঃ

এক শো পঞ্চাশ জনকে হত্যা করবার পর ঘাতকের মধ্যে একজন মুর্ছিত হয়ে পড়ল। তাকে খানিকটা বিশ্রাম করতে দিলাম। তারপর আবার নিধনপর্ব শুরু হোল। নিহতের সংখ্যা যখন দুশো ছত্রিশ-এ এসে দাঁড়িয়েছে, তখন খবর পাওয়া গেল, বাকী যে সব বন্দীদের প্রাণদণ্ড দেবার অপেক্ষায় আটক রাখা হয়েছিল, তারা কেউ বাইরে বেরিয়ে আসতে চায় না। দরজা খুলে দেখা গেল হলওয়েলের অন্ধকূপহত্যার ঘটনা ঘটেছে। পঁয়তাল্লিশটি মৃতদেহ কুঠরীর ভিতর থেকে টেনে বাইরে নিয়ে আসা হোল। লোকগুলো ভয়ে ক্লান্তিতে পরিশ্রমে গরমে ও আংশিকভাবে শ্বাসকষ্টে আপনা হতেই মরে গেছে"

[ফ্রেডারিক কুপার-রচিত দি ক্রাইসিস্ ইন দি পাঞ্জাব']

ঝাঁসী

ঝাঁসীর পতনের পর সমস্ত নগরে নির্বিচারে হত্যাকান্ড চলতে লাগল। ঘটনার নায়ক হিউরোজ নিজেই সে সম্পর্কে বর্ননা করেছেন ঃ

"প্রাসাদ অধিকৃত হবার পর থেকে বিদ্রোহীরা শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল। নগর অবরোধের সাফল্য এ একটি কথাতেই বোঝা যায় যে, একজনকেও জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয় নি। নগরীর আশে পাশের বন বাগান রাস্তা বিদ্রোহীদের শবদেহে পরিপুর্ণ হোল।"

প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তর লো বলেছেন ঃ

"মৃত্যু ফিরতে লাগল ঘর থেকে ঘরে উল্কাগতিতে। একটি মানুষকেও ছেড়ে দেওয়া হোল না। রাস্তাগুলোতে রক্তস্রোত বইতে শুরু করল।'

ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মতে ঝাঁসী অধিকার করবার পর ঝাঁসীতে কম-পক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয়েছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রমাণাদি দেখে মনে হয় সংখ্যাটা খুবই কম করে ধরা হয়েছে।

নেটিভদের শিক্ষা দেওয়া দরকার

জেনারেল নীলের কাছ থেকে আমরা একটি বিবৃতি পেয়েছি। বিবৃতিটি তুলে ধরবার মত। নেটিভদের কি করে শিক্ষা দিতে হয় এ বিবৃতিতে তারই ব্যবস্থা দেওয়া

হয়েছে ঃ "আমি এদেশের লোকদের একবার আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে চাই। যে-দন্ড আমি তাদের দেব, তা হবে চরমতম দন্ড; যা তাদের অনুভূতিকে । উৎক্ষপ্ত করে তুলবে, যা তারা কোনদিন ভুলতে পারবে না। হ্যাঁ, এমনি দন্ডই আমি তাদের দেব। এজন্য আমি নিম্নোক্ত আদেশ জারী করেছি। ক্ষমাপ্রবণ শান্তস্বভাব বৃদ্ধ ভদ্রলোকদের কাছে হয়তো এ আদেশ খুবই আপত্তিজনক বলে মনে হবে, তবু আমি মনে করি, বর্তমান সংকটের অবস্থায় এ দন্ডই তাদের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী।"

"যে-সকল দুর্বৃত্ত বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল, তাদের দিয়ে নির্দোষদের রক্তে রঞ্জিত বিবিঘরের মেঝেকে সাফ করিয়ে নিতে হবে। অপরাধীর প্রতি

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হলে পরে তাকে একজন প্রহরীর সঙ্গে বিবিঘরে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে দিয়ে মেঝের একটা অংশ সাফ করাতে হবে। এ কাজটা যাতে তার কাছে অত্যন্ত ন্যক্কারজনক বলে মনে হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কেউ যদি এ কাজ করতে আপত্তি করে, তবে চাবুক মেরে তাকে শায়েস্তা করতে হবে। রক্ত মোছার কাজ শেষ হয়ে যাবার পরেই তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাতে হবে। এ উদ্দেশ্যে হাতের কাছেই একটি ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরি করে রাখতে হবে।"

"প্রথম যাকে নিয়ে আসা হোল সে হচ্ছে ৬নং নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির একজন সুবাদার। একটা মোটা জানোয়ার, জাতে উচ্চশ্রেনীর ব্রাহ্মণ। তাকে এ কাজ করতে বলায় সে আপত্তি জানাল। সঙ্গে সঙ্গেই শপাশপ নেমে এল চাবুক। জানোয়ারটা আর্তনাদ করে উঠল। শেষ পর্যন্ত সাফ তাকে করতেই হোল, না করে যাবে কোথায়! কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হোল। তার পর তার লাশটাকে পুঁতে ফেলা হোল সদর রাস্তার উপর।"

"আরও কয়েকজনকে নিয়ে আসা হোল। তার মধ্যে এক ব্যাটা মুসলমান। সিভিল কোর্টের একজন অফিসার। সে ব্যাটা বিষম পাজী, দলের একজন পাণ্ডাগোছের লোক।"

"হুকুম দেওয়া হোল, নে ব্যাটা উপুড় হ, মাথা নোওয়া, জিভ দিয়ে চেটে তোল এ রক্তের দাগ। উহুঃ শুনবে না কথা। সিধে আঙ্গুলে ঘি উঠবে কেন! শেষকালে চাবুকের এমনি গুণ, জিভ দিয়ে চেটে কূল পায় না।"

"অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আমার এ আদেশটা একটু উদ্ভটই বটে। কিন্তু যেমন কুকুর তেমনি মুগুর চাই তো! এটাই হচ্ছে ওদের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। ভগবানের আদেশ ও সহায়তায় আমি আমার এ কর্তব্য করে যাব। আমার এ কাজের পেছনে তাঁর পবিত্র অঙ্গুলীর নির্দেশ রয়েছে, এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

হা ভগবান, জেনারেল নীল তা'হলে তোমার আশীর্বাদ ও সাহায্য নিয়েই তাঁর এ পবিত্র দায়িত্ব প্রতিপালন করে চলেছিলেন! হা ভগবান, তুমি কাদের ভগবান? সাম্রাজ্যবাদীরা কি তোমাকে শুদ্ধ কিনে নিয়েছে?

কর্নেল জন নিকলসন কিন্তু এতেও তুষ্ট নন। কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়াই বল,আর ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়াই বল, যে-ভাবেই হত্যা করা হোক না কেন, এ মরণ। এতে শুধু মারাই চলে, শিক্ষা দেওয়া যায় না। এতে আর কতটুকু কষ্ট দেওয়া চলে, কতটুকু প্রতিহিংসা মেটানো চলে! তিনি দাবী করে বসলেন, নতুন একটা বিশেষ আইন পাশ করা চাই, যার সাহায্যে মৃত্যুকে আরও বেশী কঠোর করে তোলা যাবে। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা।

কর্নেল এডওয়ার্ডিসের কাছে তিনিএ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"আসুন, আমরা এমন একটা বিল উত্থাপন করি, যাতে দিল্লীর এ সমস্ত নারীঘাতক ও শিশুঘাতকদের জন্য জীবন্ত চামড়া তুলে ফেলা', জীবন্ত পুড়িয়ে মারা' প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যেতে পারবে। দুষ্কর্মকারীদের কেবলমাত্র ফঁসি দিয়ে মারবার কথা চিন্তা করলে আমার মেজাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আর আমি যদি আপনাদের ওখানে থাকতাম! প্রয়োজন বুঝলে আইন আমি আমার নিজের হাতেই তুলে নিতাম।"

"কিছুদিন পরে তাঁর এ মহৎ প্রস্তাবের কোনও সাড়া না পেয়ে তিনি তাঁর সে পরিকল্পিত বিলটিকে উপস্থিত করবার জন্য আরও জোরের সঙ্গে চাপ দিতে লাগলেন।"

"আমাদের মেয়েদের হত্যা ও ধর্ষণ করেছে যারা, সে সমস্ত দুর্বৃত্তদের নতুন ধরনের মৃত্যুর ব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্যে আমি যে-বিলটিকে আনবার জন্য প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলাম, কই, আপনি তার উত্তরে কিছুই লিখলেন না তো! যদি আপনারা কেউ এ বিষয়ে সাহায্য না করেন, আমি নিজেই এ প্রস্তাব তুলব। এ শয়তানগুলো কেবলমাত্র ফাঁসিতে ঝুলেই রেহাই পেয়ে যাবে এ আমি কোনমতেই সহ্য করতে পারব না।"

এর পর আর এক চিঠিতে তিনি লিখলেন ঃ

"আমাদের বাইবেল-এ আছে, অপরাধের মাত্রা বুঝে সে হিসেবে বেত্রদণ্ডের আদেশ দিতে হবে। এ সমস্ত হতভাগাদের জন্য ফাঁসিই যদি যথেষ্ট শাস্তি বলে গণ্য হয়, তাহলে সাধারণ বিদ্রোহীদের ফাঁসি দেওয়াটা কি অতিরিক্ত কঠিন সাজা হয়ে যাবে না? তারা যদি আমার হাতে থাকত, আর আমি যদি জানতাম যে, কালই আমাকে মরতে হবে, তা হলেও আমি ওদের যতদূর সম্ভব কঠিন যন্ত্রণা দিয়ে মারতাম। এজন্য আমার বিবেকে এতটুকুও বাধত না। আমাদের আইনে বিভিন্ন ধরনের চুরি, মারপিট, জালিয়াতী ও অন্যান্য অপরাধের জন্য বিভিন্ন রকম শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। খুনের বেলায়ই বা তা হবে না কেন? বিভিন্ন ধরনের খুনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে না কেন?"

পবিত্র হৃদয় ও গভীর বুদ্ধিমত্তার জন্য বিখ্যাত জনৈক খ্রীস্টান ভদ্রলোক বারাণসীর কমিশনার মিঃ টাকারকে উপদেশ দিয়ে লিখেছিলেন ঃ

"আপনার হৃদয়ের সহজাত কোমলতা সম্পর্কে আমার মনে একটু ভয় আছে। মনে রাখবেন, ইন্দ্রিয়প্রবণতার মতই এ স্নেহপ্রবণতাকেও আমাদের হত্যা করতে

হবে। ম্যাজিস্ট্রেট বৃথাই তাঁর তরবারী ধারণ করেন না। ভগবানের আদেশবাণী মানুষকে এ অধিকার কখনোই দেয় নি যে, সে তার আধুনিক মনের কোমলতার

বশীভূত হয়ে হত্যাকারীকে পর্যন্ত রেহাই দেবে। আপনার হৃদয়কে দৃঢ় ও স্থিরসংকল্প করে তুলুন, যাতে আপনি কঠিন চিত্তে চরম দন্ড দিতে পারেন। আইন-অনুসারে কাজ করে চলুন এবং ক্ষমাপ্রবনতার বিরুদ্ধে পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়ান।"

"আজ সমস্ত প্রাচ্য জগতে বৃটিশ গভর্নমেন্ট- সম্পর্কে আতঙ্ক ও সম্ভ্রমের প্রতিষ্ঠা করে তোলবার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবলমাত্র তাহলেই এরা এর হিতকারিতা বুঝতে পারবে। এ সমস্ত ষড়ুযন্ত্র, হিংসামূলক কার্যকলাপ ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করে চলতে হবে এবং এ কঠোরতর ঐতিহ্য ভবিষ্যতের জন্য রেখে যেতে হবে। তা না হলে এ রকমের বিপদ ফিরে ফিরেই দেখা দেবে।"

পাটনার বিদ্রোহ

বিদ্রোহের জোয়ারে সারা পাটনা টলমল করে উঠল।

জমিন আগে থেকেই তৈরি ছিল। ওহাবী আন্দোলনের শক্তিশালী কেন্দ্র পাটনা। বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব অনেকদিন থেকেই সেখানে দানা বেঁধে উঠেছিল। কোম্পানীর রাজত্বকে খতম করবার জন্য ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে এখানে প্রথম গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়।

নাগরিকদের উপর এই গুপ্ত সমিতির বিরাট প্রভাব ছিল। সমস্ত শ্রেণীর লোকেরাই, এমন কি ধনী ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কের মালিক, জমিদার–এরাও এ সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ফলে টাকা পয়সার জন্য তাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হোতনা। শহরের বিশিষ্ট মৌলবীরা এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন।

পুলিশদের মধ্যে অনেকে এদের সঙ্গে ছিল। কাজেই রাত্রিবেলা গোপন সভার কাজ চালাতে বিশেষ বেগ পেতে হোত না।

সারা দেশ জুড়ে সিপাইদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সেই ঢেউ দানাপুরেও এসে লাগল। গুপ্ত সমিতির সঙ্গে দানাপুরের সিপাইদের দহরম মহরম চলল।

কমিশনার মিঃ টেইলর বিশেষ চিন্তিত। মীরাট থেকে ভীষণ দুঃসংবাদ এসেছে, সিপাইরা নাকি বিদ্রোহ করেছে। শুধু কি মীরাট, দুদিন বাদেই দিল্লীর খবর এসে পৌছল। খবর তো শুধু টেইলর সাহেবের কাছেই আসে নি! চারদিকে চলেছে কানাকানি, ইংরাজদের রাজত্বের পরমায়ু নাকি শেষ হয়ে এসেছে। ১৮৫৭! পলাশীর যুদ্ধের ঠিক এক শো বছর পরে!

দানাপুরের সিপাইদের অবস্থা নাকি মোটেও সুবিধার নয়, বিষম ছটফট শুরু করে দিয়েছে, খবর এলো টেইলর সাহেবের কাছে। দানাপুরের সিপাইদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হ'লে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো। টেইলর সাহেব কি আর এই বিষয়ে কম চেষ্টা করেছেন! কিন্তু গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এ কথায়

একেবারেই কান পাততে চান না। যত গোলমাল বেধেছে এ নিয়ে।

তাই বলে কি আর এমন সময় চুপ করে বসে থাকা যায়! এ সময় নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার মানে নিঃশব্দে মৃত্যু বরণ করে নেওয়া। কিছু একটা করতেই হবে। মি টেইলর পাটনাকে রক্ষা করবার জন্য মিঃ র‍্যাটরের নেতৃত্বে দুশো শিখ সৈন্য আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন। রাজভক্ত শিখ সিপাই। ইংরাজরা এদের উপর নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করতে পারত।

এই দুশো প্রভুভক্ত শিখ সিপাই যে-পথ দিয়ে গিয়েছে লোকে তাদের ধিক্কার দিয়েছে, ঘৃণায় থুথু ফেলেছে। সমস্ত মানুষের অভিসম্পাতের বোঝা মাথায় নিয়ে তারা পাটনা শহরে এসে ঢুকল।

পাটনার স্বাধীনতাকামী নাগরিকেরা তাদের দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠলঃ ছি,ছি, গোলামের দল, নিজের ভাইদের খুন করতে এসেছ!

অন্যের কথা বলব কি স্বয়ং শিখ ধর্মমন্দিরের পুরোহিত এদের দেখে মন্দিরের কপাট বন্ধ করে দিলেন। না–মন্দিরে দেশদ্রোহীদের প্রবেশ নিষেধ।

যেই-মাত্র তারা শহরে এসে পা দিল সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে উন্মাদের মত এক ফকীর ছুটে এসে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াল। ক্রোধে ঘৃণায় তার চোখ দুটো জ্বলছে আগুনের মত। বেইমান, বিশ্বাসঘাতক!' ভীষণ মুখ- ভঙ্গি করে সে তাদের দিকে তর্জনী তুলে কটূক্তি আর অভিশাপ দিতে লাগল।

শিখ সৈন্যেরা পাটনায় এসে পৌছুলে মিঃ টেইলার এবার আসল কাজে হাত লাগালেন। বিদ্রোহের চেষ্টাকে অঙ্কুরেই শেষ করে দেবেন যাতে তারা আর কখনও মাথা তুলতে না পারে।

ত্রিহুত জেলার পুলিশের জমাদার ওয়ারিস আলীর সম্পর্কে সন্দেহজনক সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর বাড়ী ঘেরাও করে তাঁকে গ্রেফতার করা হোল। ওয়ারিস আলী তখন গয়ার বিদ্রোহী নেতা আলী করিমের কাছে চিঠি লিখছিলেন। সে অবস্থায় চিঠিশুদ্ধ তিনি ধরা পড়লেন। তাঁর বাড়ীতে তল্লাস করে আরও অনেক কাগজপত্র পাওয়া গেল।

ওয়ারিস আলীকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হোল।

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন ঃ "যদি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক এখানে কেউ থাকো, আমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাও।" তাঁর চিৎকার কারো কানে গিয়ে পৌছবার আগেই তাঁর মৃতদেহ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে লাগল।

৬৮

আলী করিমকে গ্রেফতার করবার জন্য গয়ায় একদল গোরা সৈন্য পাঠিয়ে দেওয়া হোল। দলের নেতা লুইস কাছে গিয়ে পৌছতেই আলী করিম লাফ দিয়ে হাতীর পিঠে চড়ে বসে হাতী নিয়ে সোজা দিলেন ছুট। পেছনে পেছনে তাড়া করে চললেন লুইস। দৌড়ের প্রতিযোগিতা চলল। কে কাকে হারাতে পারে!

এ দৃশ্য দেখবার জন্য রাস্তায় লোক জমে গেল। রাস্তার মানুষ মজা দেখে কেউ হাততালি দিতে লাগল, কেউ বা ফিরিঙ্গীদের লক্ষ্য করে টিটকারী দিতে শুরু করল। পথের লোক তাঁকে উত্ত্যক্ত করে তুলল, পথ জিজ্ঞাসা করলে ভুল পথ দেখিয়ে তাঁকে নাকাল করতে লাগল। কেউ কেউ বা আরও একটু উদ্যোগী হয়ে পেছন থেকে কয়েকটা খচ্চর চুরি করে নিয়ে পালাল।

ক্লান্তিতে হতাশায় হাল ছেড়ে দিয়ে লুইস সাহেব খালি হাতেই ফিরে এলেন।

সমস্ত বিহার জুড়ে একটানা গ্রেফতার চলল।

কিন্তু টেইলর সাহেব জানতেন সবচেয়ে বিপজ্জনক পাটনা শহরের গুপ্ত সমিতিটি। এটিকে খতম করাই হোল আপাতত প্রথম কাজ।

এ গুপ্ত সমিতি বহু দিন ধরেই গোপনে কাজ করে চলেছিল। রাত্রিবেলা এদের গোপন সভা বসত। সত্য কথা বলতে কি এদের সম্পর্কে টেইলর সাহেব খুব কমই জানতেন। কারা কারা এর সঙ্গে জড়িত আছে, এদের কর্মসূচীই বা কি এ সম্পর্কে তাঁর কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না, তবে শহরের তিন জন বিশিষ্ট মৌলবী-সম্পর্কে তাঁর মনে খুবই সন্দেহ ছিল।

এ তিনজন মৌলবীর নাম শাহ মাহমুদ হোসেন, আহমদ উল্লাহ ও ওয়াজউল হক। পাটনার মুসলমান সমাজে এঁদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল। হঠাৎ এঁদের বাড়ী চড়াও করে গ্রেফতার করলে সেটা শহরের অধিবাসীদের উত্তেজনার কারণ হয়ে উঠতে পারে এ আশঙ্কায় টেইলর সাহেব এঁদের ধরবার জন্য সোজা পথে না গিয়ে একটু বাঁকা পথ ধরলেন।

গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য-সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদের আমন্ত্রণ পত্র দিয়ে পাঠালেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে উপরিউক্ত তিন জন মৌলবীও ছিলেন। যথাসময়ে সবাই এসে উপস্থিত হলেন। সাময়িক অবস্থা নিয়ে সকলের সঙ্গেই কিছু কিছু আলাপ হোল। কিন্তু এ তো লোক-দেখানো ব্যাপার মাত্র। আলাপ আলোচনার পর একে একে সবাই বিদায় নিয়ে যাঁর যার ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্তু সে তিনজন মৌলবীকে আর ফিরে যেতে দেওয়া হোল না।

মিঃ টেইলর তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে, সাধারণের মঙ্গলের জন্য এ গোলযোগ যতদিন শান্ত না হয় ততদিন তাঁদের আটক করা হচ্ছে, তাহ'লে মিঃ টেইলরের সেদিন উত্তর দেবার মত কিছুই ছিল না। কিন্তু মৌলবীরা জানতেন এ প্রশ্ন তুলে

কোনই লাভ নেই, প্রবলের শাসন যুক্তির সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে না। কাজেই তাঁরা কোন বাদ-প্রতিবাদ না করেই এ আদেশ মেনে নিলেন।

শিখ সৈন্যদের দিয়ে ঘেরাও করে তাঁদের যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। যাবার আগে টেইলর সাহেব আহম্মদ উল্লাহ্‌কে একটু হুঁশিয়ারী দিয়ে দিলেন। মৌলবী আহমদ উল্লাহর পিতা মৌলবী ইলাহি বক্‌স তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অন্ধ বলে তাঁকে আটক করা হয় নি। মিঃ টেইলর তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মৌলবী আহমদ উল্লাহ্‌কে বলে দিলেন, 'মনে রাখবেন, আমি তাঁকে আটক করলাম না। কিন্তু তাঁর জীবন আপনার হাতে এবং আপনার জীবন তাঁর হাতে রয়েছে।' মিঃ টেইলরের এ উক্তির অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট, ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না।

মিঃ টেইলরের এ কাজের মধ্যে অনেকেই বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়েছিলেন। মিঃ টেইলর নিজেও তাঁর এ কৃতিত্বের-জন্য গর্ববোধ করেছেন। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক কে সাহেবের মতটা একটু উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেনঃ "সম্ভ্রান্ত লোকদের বন্ধুভাবে নিমন্ত্রণ করে যিনি এরূপ ব্যবহার করতে পারেন, তাঁকে বিশ্বাসঘাতকের তুল্য না বলে প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক বলাই বেশী সঙ্গত। যদি

মৌলবীরা কোনরূপ বাধা দিতে অগ্রসর হতেন, তাহলে বোধ হয় তরোয়ালের ঘায়ে সেদিন তাঁদের মাথা কাটা যেত।"

টেইলর সাহেব পাটনা শহরে আদেশ জারী করে দিলেন, যার হাতে যা কিছু অস্ত্র আছে সব জমা দিয়ে দিতে হবে। দু'নম্বর আদেশ, রাত্রি ন'টার পর কেউ বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে না। এ আদেশ কার্যকর করবার অর্থ গুপ্ত সমিতির কাজ বন্ধ করে দেওয়া।

পাটনার বিদ্রোহীরা আশা করেছিল দানাপুরের সিপাইরাই প্রথমে বিদ্রোহ করবে। সে নিশানা দেখে পাটনার বিদ্রোহীরা মাথা তুলে দাঁড়াবে। কিন্তু দানাপুরের সিপাইরা বড় বেশী দেরী করে ফেলেছিল। এদিকে সরকারের আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। নেতাদের গ্রেফতারের ফলে সকলেই উত্তেজিত। তা ছাড়া যেভাবে গ্রেফতারের পালা শুরু হয়েছে তাতে দুদিন বাদে টিকে থাকাই মুস্কিল হবে।

এসমস্ত চিন্তা করে তাঁরা ঠিক করল, আর দেরী করা যায় না। দানাপুরের জন্য অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা না করে যা করবার এখনই করতে হবে। দেরী করলে পরে আর সময় নাও মিলতে পারে।

৩রা জুলাই ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ।

মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল, দীন, বোলো দীন!

শহরবাসী চমকে উঠল। প্রায় দু শো জেহাদী মিছিল করে বেরিয়েছে। স্বাধীনতার সবুজ ঝান্ডা নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। তারা ছুটে চলেছে গীর্জার দিকে যেখানে সাহেবরা সবাই জমায়েত হয়েছে।

আফিম বিভাগের ডাঃ লায়াল ছুটে আসছিলেন সে পথ দিয়ে। বিদ্রোহীদের গুলিতে তিনি মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ র‍্যাটরে তার শিখ সৈনাদের নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জেহাদীরা প্রতিরোধ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করল। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অশিক্ষিত এক দল লোক হাতে অস্ত্র ছিল তাদের সামান্যই, সুশিক্ষিত সশস্ত্র সৈন্যদের বিরুদ্ধে আর কতক্ষণ দাঁড়াতে পারে!

এভাবে পাটনার অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পরিণত হোল। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে এ ঘটনাটি খুব বড় নয়, কিন্তু তবুও উল্লেখযোগ্য। পাটনার নাগরিকরাই প্রথমে অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিল। সিপাইরা বিদ্রোহ করেছিল পরে. তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে।

একটি বদমাইসের কাহিনী

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস পড়ছিলাম। পাটনার বিদ্রোহীদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে গ্রন্থকার এক জায়গায় লিখেছেন ঃ "কয়েক দিনের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত বদমাসকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন পুস্তক বিক্রেতা।"

সে বদমাসের কাহিনীই এখন বলব।

পাটনা শহরে একজন সাধারণ পুস্তক-বিক্রেতা, নাম পীর আলী। পাটনা শহরে অনেকেই তাঁকে চিনত। পথ দিয়ে যে-সব মানুষ চলাচল করত, তারা দিনের পর দিন দেখেছে পীর আলীকে। তারা কি কখনও ভাবতে পেরেছে এ রুক্ষমূর্তি অতি সাধারণ চেহারার মানুষটার মধ্যে কি এক আগুন অনির্বাণ দিবারাত্রি জ্বলছে! পরাধীনতার গ্লানি পীর আলীর জীবনে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বিদেশীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করবই, এ একটি কথা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ মন্ত্রে তিনি নিজে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, কত লোককে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন! পীর আলী তাঁর এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিলেন। সমিতিকে গড়ে তোলবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন।

পীর আলীর জীবন-ইতিহাস আমরা খুব কমই জানতে পেরেছি। পাটনার অভ্যুত্থানের আগে তাঁর সম্পর্কে গভর্নমেন্টের এতটুকুও সন্দেহ ছিল না। তারা ভাবতেও পারে নি সামান্য দরিদ্র এক পুস্তক- বিক্রেতার ছদ্মবেশে কত বড় একজন সংগঠক বৃটিশবিরোধী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলেছেন। তিনি ধরা পড়বার পর তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে যেসমস্ত তথ্য সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে আসে, তাতে তারা স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারা জানতে পারলো পীর আলী এবং তাঁর সহকর্মী শেখ ঘাসিতা তাঁদের কার্যোদ্ধারের জন্য নিয়মিত অর্থ যুগিয়ে বহুসংখ্যক কর্মীকে প্রতিপালন করতেন।

কিন্তু পীর আলী ও ঘাসিতা দুই জনেই অত্যন্ত গরীব। এত টাকা কোথায় পেতেন তাঁরা ? খোঁজ করতে করতে সূত্রটা বেরিয়ে পড়ল। সূত্রটা খুবই কাছে ছিল কিন্তু বিশ্বাস করা কঠিন। ঘাসিতার মনিব লুৎফা আলী খাঁ পাটনা শহরের সব চেয়ে বড় ব্যাঙ্কার। বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক আর তাঁর দরিদ্র ভৃত্য দুজনে একই মন্ত্রে দীক্ষিত। মিঃ টেইলর এ বিষয়ে নিঃসংশয় হয়েছিলেন। লুৎফা আলী খাঁকে ফাঁসাতে তিনি কম চেষ্টা করেন নি। কিন্তু প্রমানের অভাবের জন্যই হোক বা টাকার জোরেই

হোক, লুৎফা আলীকে ছুঁতেই জড়ানো গেল না, তিনি অক্ষত দেহে বেরিয়ে এলেন।

পাটনার বিদ্রোহের নেতাদের সম্পর্কে আগে যে ধারনাই থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, পীর আলীই ছিলেন বিদ্রোহের মূল পরিচালক। সামান্য একজন পুস্তক-বিক্রেতা হলেও বিদ্রোহীদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য। গুপ্ত সমিতির পরিচালনায় তিনি একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এবং এ বাহিনীর তিনিই ছিলেন নেতা।

মীরাটে সিপাইদের অভ্যুত্থানের পর কমিশনার মিঃ টেইলর পাটনার আসন্ন বিদ্রোহকে চাপা দেবার জন্য গ্রেফতার ও অত্যাচারের রোলার চালাতে শুরু করে দিলেন। পীর আলী অত্যন্ত কঠিন ও তেজস্বী প্রকৃতির লোক ছিলেন। দেশের উপর জুলুম হতে দেখে এতদিনকার পরিপক্ক বিদ্রোহী, যে-সময় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল, সে সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। তাঁর এ অধৈর্য টেইলরের জয়ের পথ প্রশস্ত করে দিল।

কথা ছিল দানাপুরের সিপাইরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, তবে তাঁরা অস্ত্র হাতে পথে নামবেন। দানাপুরকে পেছনে ফেলে অধৈর্য হয়ে তাঁরা একাই সামনে এগিয়ে গেলেন। তার ফলেই ঘটল ৩রা জুলাইর শোচনীয় পরিণতি।

পীর আলী ভুল করেছিলেন। সে ভুলের মাশুল দিতে তাঁদের সর্বস্বান্ত হতে হোল। তিনি পরে একথা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সে কথা স্বীকার করেছেন। বলেছেন, এ কাজ তাঁর সময়োচিত হয় নি, তাঁর অপেক্ষা করা উচিত ছিল।

পাটনার অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকবার অভিযোগে একত্রিশ জন লোককে আদালতে উপস্থিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে চৌদ্দ জনকে সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। এ চৌদ্দ জনের মধ্যে পীর আলী ও শেখ ঘাসিতাও ছিলেন।

হাতে পায়ে কঠিন শিকল দিয়ে বাঁধা পীর আলীকে কমিশনার টেইলরের কাছে উপস্থিত করা হোল। তাঁর গা দিয়ে রক্ত ঝরছে, রক্তে লাল হয়ে উঠেছে পরনের কাপড়। পীর আলীর তাতে দৃকপাত নেই—দৃঢ় কঠিন অবিচল।

মিঃ টেইলর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলেনঃ "পীর আলী, ভেবে দেখ এখনও বেঁচে যেতে পার যদি তোমাদের সমস্ত গোপনীয় কথা খুলে বল, তোমাদের আর সব নেতাদের নাম বলে দাও।"

পীর আলী স্থির শান্ত দৃষ্টিতে কমিশনারের দিকে তাকালেন, তারপর ধীর গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন ঃ "এমন কতগুলো অবস্থা আছে যখন নিজের প্রাণ বাঁচানোটাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়, আবার এমন কতকগুলো অবস্থা আছে, যখন জীবন বিসর্জন দেওয়াটাই একমাত্র কাম্য। আমি এখন দ্বিতীয় অবস্থার মধ্যে আছি। আমি যদি আজ মৃত্যুকে বরণ করি তা হলেই আমি শাশ্বত জীবনের সন্ধান পাব।"

তারপর তিনি স্পষ্টভাষায় ইংরাজদের অত্যাচার ও কমিশনারের দৌরাত্ম্যের কথা বর্ণনা করে বললেন ঃ "তোমরা আমাকে ফাঁসি দিতে পার, আমার মত অনেক লোককে তোমরা ফাঁসি দিতে পার, কিন্তু তোমরা আমাদের আদর্শকে ফাঁসি দিতে পারবে না। আমি মরে গেলে আমার রক্ত থেকে হাজার হাজার বীর জন্মলাভ করবে, তারাই তোমাদের ধ্বংস করবে।"

ফাঁসি হওয়ার আগে পীর আলী বললেন, 'আমার কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে।"

"বল।" কমিশনার অনুমতি দিলেন।

"আমার বাসগৃহ ?"

"ভূমিস্যাৎ করা হবে।"

"আমার সম্পত্তি ?"

"সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবেন।"

"আমার ছেলেমেয়েরা ?" পীর আলীর কণ্ঠস্বর একটু বিকৃত হয়ে এল! এই তাঁর প্রথম ও শেষ দুর্বলতা প্রকাশ।

"তারা কোথায় আছে ?"

"অযোধ্যায়।"

"অযোধ্যর বর্তমান অবস্থায় তাদের খোঁজ-খবর করা সম্ভব নয়।"

কমিশনার এ বিষয়ে কোন ভরসা দিতে পারলেন না।

পীর আলীর আর কোন কথা বলবার ছিল না। ফাঁসির মঞ্চে যখন উঠে দাঁড়ালেন, তাঁকে এতটুকু বিচলিত দেখা যায় নি। আমার এ কাহিনীর এখানেই শেষ।

কিন্তু আমরা শেষ করে দিলেই তো আর সব শেষ হয়ে যায় না।

"আমার রক্ত থেকে হাজার হাজার বীর জন্মলাভ করবে" মহান শহীদের এ কথাটি মিথ্যা হয় নি। তাঁদের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দানাপুরের সবচেয়ে প্রভুভক্ত বলে খ্যাত রেজিমেন্টটিও ২৫-এ জুলাই তারিখে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। গোরা রেজিমেন্ট ও গোলন্দাজ বাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বে তিনটি ভারতীয় রেজিমেন্টের সৈন্য ঘৃণাভরে কোম্পানীর উর্দী ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শোন নদীর দিকে যাত্রা করল।

কুমার সিং

পশ্চিম বিহারের জঙ্গলের মধ্যে বাঘ ওৎ পেতে বসে থাকে। শোন নদীর তীরে তীরে বাঘ শিকারের আশায় ঘুরে বেড়ায়। সুযোগ বুঝলেই শিকারের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। বুড়ো বাঘ, আশি বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু তাই বলে নখদন্তহীন নয়। তাঁর ভয়ে ওরা সন্ত্রস্ত, তাঁর আতঙ্কে ইংরাজ সেনাপতিদের ঘুম আসে না।

পশ্চিম বিহারের জঙ্গলের মধ্যে কুমার সিং তাঁর দলবল নিয়ে বসে থাকেন। শোন নদীর তীরে তীরে ফিরিঙ্গীদের গতিবিধি লক্ষ্য করে ঘুরে বেড়ান আর সুযোগ বুঝলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল লক্ষ্ণৌর উপর আক্রমণ চালাবার জন্য আজিমগড় থেকে গুর্খা ও ইংরাজ সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত মুহূর্ত! কুমার সিং নির্দেশ দিলেন– তৈরি থাকো! ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মার্চ রীভা থেকে বিদ্রোহীরা এসে যোগ দিল। মিলিত বাহিনী এট্রোলিয়ার দুর্গের কাছে এসে তাঁবু খাটিয়ে বসল।

আজিমগড় থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে। যাকে ধরবার জন্য কত জায়গায় কত না জাল ফেলা হয়েছে সে বাঘ আজ নিজেই চলে এসেছে হাতের মুঠোর মধ্যে। আরও খবর পাওয়া গেছে, সৈন্যসংখ্যা বেশী নয়, সঙ্গে একটা কামান পর্যন্ত নেই। এ সুযোগ ছাড়া যায় না। মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে!

উপযুক্ত মুহূর্ত! মিঃ মিলম্যান নিদের্শ দিলেন–এট্রোলিয়া!

তিন শো পদাতিক ও সওয়ার সৈন্য আর সঙ্গে দুটি কামান। মিঃ মিলম্যান পাকা শিকারী; বাঘ শিকারে ছুটলেন। বুড়ো বাঘটা বিষম জ্বালাতন করছে।

এট্রোলিয়ার ময়দানে দুদলে সংঘর্ষ বাধল। একদিকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হাল আমলের সুশিক্ষিত সৈন্য, অন্য দিকে এখান থেকেও খান থেকে কুড়িয়ে কাচিয়ে সংগ্রহ করা কতগুলো মানুষ, যাদের না আছে সামরিক শিক্ষা না শৃঙ্খলা। কতক্ষণ আর টিকে থাকবে! কুমার সিং-এর বহিনী এক ধাক্কাতেই কাত। চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। মিলম্যান আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। সঙ্গে একটু আফসোসও ছিল। বুড়ো বাঘটাকে ধরা গেল না। কোথায় কতদূরে কোন জঙ্গলে গিয়ে আবার সেঁদিয়েছে কে জানে! ধরতে পারলে নাম ও ইনাম দুইই মিলত।

যাক গে! ইংরাজ সৈন্যরা পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে বসল। কেটলীতে চায়ের পানি টগবগ করে ফুটছে! আঃ, সবাই পরিশ্রান্ত, যুদ্ধের পরে খানাটা ভালই জমবে।

ও কি, ও কিসের শব্দ! ওদিক থেকে কারা সব ছুটে আসছে? বাঘ! বাঘ! আর সন্দেহ নেই, পালে বাঘ পড়েছে। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত কুমার সিং বাঘের মতই এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মিলম্যান! মিলম্যান! দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও! এমন সাজানো আসরটা ভেঙ্গে-চুরে ছারখার হয়ে পড়ল যে! আহা এমন সুন্দর খানাটা! মদের পেয়ালাগুলো কি

এমনি করেই গড়াগড়ি যাবে?

কিন্তু মিলম্যান দাঁড়ালেন না। এক ছুটে আজিমগড় ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কোথায় আর বাঁচলেন! কুমার সিং পেছন পেছন ধাওয়া করে একেবারে আজিমগড়ের দুয়ার পর্যন্ত এসে পৌঁছে গেছেন।

খবর পেয়ে বারাণসী ও গাজীপুর থেকে তিন শো' পঞ্চাশ জন তরতাজা সৈন্য নিয়ে কর্নেল ডেম্‌স্ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই হবে। ২৮-এ মার্চ কর্নেল ডেম্‌স্ কুমার সিংকে আক্রমণ করে চেপে ধরলেন। কুমার সিং যথারীতি পরাজিত হলেন। তারপর? তারপর সে একই খেলা, একই ইতিহাস। কর্নেল ডেম্‌স্ এমন মার খেলেন যে, আজিমগড়ে ফিরে এসে ধুঁকতে শুরু করলেন।

ব্যাপারটা গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে পর্যন্ত চিন্তিত করে তুলল। বৃটিশ প্রেষ্টিজ কোথায় নেমে এসেছে! কালো লোকগুলোর সাহস বেড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা বিহিত করা দরকার। লর্ড ক্যানিং-এর নির্দেশে লর্ড মার্ক কের সসৈন্যে আজিমগড়ের দিকে ছুটলেন। খবর পেয়ে কুমার সিং তাঁর ব্যূহ শিথিল করে সৈন্যদের ছড়িয়ে দিলেন। শত্রুপক্ষের কামানগুলো অগ্নি উদ্‌গিরণ করে চলল। এদিকে কুমার সিং-এর হাতে একটিও কামান নেই। এ বড় বিচিত্র যুদ্ধ।

একদিকে অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল আয়োজন, অপর দিকে রণপ্রতিভা। শেষ পর্যন্ত প্রতিভাই জয়ী হোল। গোড়ার দিকে মার্ক কের কুমার সিংহের সৈন্যবাহিনীর সম্মুখভাগকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু কোন্‌টা 'সম্মুখ' আর কোন্‌টা 'পেছন' এ নিয়ে কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। কিছু বাদেই দেখা গেল কুমার সিং এর সৈন্যদলের সম্মুখভাগ ইংরাজবাহিনীর পশ্চাৎভাগকে আক্রমণ করে চেপে ধরেছে। ইংরাজদের হাতীগুলো উদভ্রান্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। লর্ড মার্ক কের বিস্ময়ে আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন তাঁদের পশ্চাৎভাগ ভীষণভাবে আক্রান্ত।

উপায়ান্তর না দেখে লর্ড মার্ক কের যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে আজিমগড়ে ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন। সেদিন রাত দুপুরে তিনি তাঁর সৈন্যদের আজিমগড়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

লর্ড মার্ক কের-যে এ যুদ্ধে শুধু জয়ী হতে পারলেন না তাই নয়, আজিমগড়কে মুক্ত করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হোল না। তখন পর্যন্ত সমস্ত শহর বিদ্রোহীদের দখলে।

ইংরাজ সৈন্যরা দুর্গের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল! কিন্তু কুমার সিং একবারও দুর্গ অধিকার করতে চেষ্টা করলেন না। তাঁর মাথায় তখন এক নতুন পরিকল্পনা। শত্রুপক্ষ তা কল্পনাও করতে পারে নি।

আজিমগড়ে অবরুদ্ধ ইংরাজ সৈন্যদের সাহায্যের জন্য ইংরাজ সেনাপতি লুগার্ড ঝড়ের বেগে ছুটে আসছেন। সেনাপতি লুগার্ড তাঁর সামরিক জীবনে অনেক বাঘই শিকার করেছে। এবার দেখে নেবেন কুমার সিংকে।

লুগার্ডকে আজিমগড়ে আসতে হলে তনু নদীর সেতু পার হয়ে আসতে হবে।

কুমার সিং তাঁর সৈন্যদের মধ্য থেকে বাছা একটা দলকে সেতু পাহারা দেবার জন্য মোতায়েন করলেন। লুগার্ডের সৈন্যদের তারা শেষ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখবে, যতক্ষণ না– ।

যে সৈন্যদলকে সেতু রক্ষার কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল, তারা অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ করে চলল। শেষে যখন বুঝল কুমার সিং এখন নিরাপদ, এতক্ষণে সসৈন্যে গাজীপুরের পথে বহু দূর এগিয়ে গিয়েছেন, তখন তারা আগেকার ব্যবস্থামত সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হটে ভিন্ন পথ ধরে মূল বাহিনীর সঙ্গে এসে যোগ দিল।

লুগার্ড সসৈন্যে নদী পার হয়ে এলেন। কুমার সিং বড় বেশী জ্বালাতন করে চলেছে, এবার তার সঙ্গে শেষবারকার মত বোঝাপড়া করতেই হবে। ঘোড়সওয়ার, পদাতিক, কামান, বন্দুক, গোলাগুলী, কোন কিছুর অভাব তাঁর নেই। দেখে নেবেন তিনি বাঘ এবার কি করে ফাঁক দিয়ে পালায়।

কিন্তু হায় হায়, কোথায় কুমার সিং? কে জানে কোন্ মায়ার বলে কুমার সিং তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। এ কি ভোজবাজির খেলা!

তবে কি তারা গাজীপুরের পথে? সর্বনাশ! জগদীশপুরের দিকে নয় তো? কে জানে কোন্ মতলব নিয়ে চলেছে! বুড়ো বাঘকে বিশ্বাস নেই। ওকে পথের মধ্যেই আটকাতে হবে।

ছুটল একদল ঘোড়সওয়ার। সঙ্গে কামান নিয়ে চলেছে। কোথায় যাবে কুমার সিং? যেখানেই যাক যত দূরেই যাক তার আর নিষ্কৃতি নেই। পায়ে হেঁটে কত দূরেই বা আর যাবে! সওয়ার দল মাইলের পর মাইল এগিয়ে চলেছে, তবু তাদের দেখা নেই। অবশেষে বারো মাইল পথ ছাড়াবার পর তারা কুমার সিং-এর নাগাল পেল।

কে-যে শিকারী আর কে-যে শিকার বোঝবার উপায় ছিল না। কুমার সিং এমন প্রবলভাবে প্রতি-আক্রমণ চালালেন যে, তাদের থ' খেয়ে যেতে হোল। এমনটা তারা কখনোই ভাবতে পারে নি। বহু চেষ্টা করেও কুমার সিং-এর ব্যূহে ভাঙ্গন

ধরানো গেল না। বরঞ্চ তাঁর পাল্টা আক্রমণে ইংরাজ পক্ষের কয়েকজন সৈন্য, এমন কি অফিসার পর্যন্ত প্রাণ হারাল। তাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ করে কুমার সিং আবার গঙ্গার দিকে ছুটে চললেন।

ভগ্নদূতের মুখে এ শোচনীয় সংবাদ শুনে জেনারেল ডগলাস আরও পাঁচ-ছ'টা কামান নিয়ে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে চললেন।

মধ্যরাত্রে কুমার সিং-এর বাহিনী যাত্রা করল সোজা সেকেন্দরপুরের দিকে। সেখানে ঘোগরা নদী পার হয়ে তারা মীর্জাপুরে ঢুকল।

কিন্তু বিদ্রোহীরা এ অমানুষিক পরিশ্রমের পর ক্ষুধার্ত ক্লান্ত অবসন্ন। এক পা চলবার সামর্থ্য নেই। বিশ্রাম নিতেই হবে। গ্রামের নাম মনোহর। সে গ্রামেই তারা বিশ্রাম নিতে বসল।

কিন্তু বিশ্রাম তাদের বরাতে ছিল না। জেনারেল ডগলাস পেছন পেছন কামান উঁচিয়ে ছুটে আসছেন। একটু বাদেই জেনারেল ডগলাস মনোহরে এসে পৌঁছলেন।

কুমার সিং দেখলেন তাঁর সৈন্যদল নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। ঝড়ের তান্ডবে নৌকো যখন ডুবুডুবু নিপুণ মাঝির মত ঝড়কে ফাঁকি

দিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন। সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে ছোট ছোট কতগুলো দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলের দলপতিকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়। যে জায়গায় তারা সবাই এসে আবার একত্রে মিললেন শত্রুপক্ষ তার খোঁজ পায় নি।

আজিমগড় থেকে যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল এবার কুমার সিং তাতে বিজয়ী হলেন। ইংরাজ সৈন্যরা অবশ্য পেছনেই ছিল। গঙ্গা পার না হওয়া পর্যন্ত হাঁফ ফেলবার যো নেই।

কুমার সিং এবার একটা নতুন চাল চাললেন। তিনি সে অঞ্চল জুড়ে একটা গুজব রটিয়ে দিলেন যে, তাঁর সৈন্যরা বালিলা-নামক স্থানে গঙ্গা পাড়ি দেবে। নৌকো না থাকায় তাঁরা হাতীর পিঠে চড়ে নদী পার হবেন।

জেনারেল ডগলাস বালিলাতে গিয়ে কুমার সিংকে ধরবার জন্য ওৎ পেতে বসে রইলেন। ওদিকে বালিলা থেকে সাত মাইল দূরে শিউপুরঘাটে তখন গঙ্গা পার হবার জন্য তোড়জোড় চলছে।

কিন্তু কি করে পার হবেন ? শিউপুরঘাটে একটি নৌকোও তো নেই। কিন্তু কুমার সিং সেখানে এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে, নৌকোর ভাবনা তাঁকে আর ভাবতে হোল না। খবর পেয়ে গ্রামের লোকেরা নিজেরাই এগিয়ে এল। বলল, ভয় কিসের, আমরা দিচ্ছি নৌকো। দেখতে দেখতে তাদের চেষ্টায় অনেক নৌকো এসে জড় হোল।

ঠিক সে সময় ইংরাজদের 'মেঘনা' নামে একটা সশস্ত্র স্টীমার কুমার সিংকে বাধা দেবার জন্য গঙ্গার বুকে টহল দিয়ে ফিরছিল।

শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে কুমার সিং গঙ্গা পার হলেন। শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে ইংরাজ সৈন্যরা সদলবলে শিউপুরঘাটে এসে জমায়েত হোল। কিন্তু কুমার সিং-এর প্রায় সমস্ত সৈন্যই তখন ওপারে চলে গিয়েছে।

কুমার সিং তখনও ওপারে যান নি, নদীর মাঝামাঝি একটা নৌকোর উপরে ছিলেন। ইংরাজ সৈন্যরা এপার থেকে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। তারই একটা গুলি কুমার সিং-এর হাতের কব্জিতে গিয়ে বিঁধল। আশী বছরের বৃদ্ধ কুমার সিং তাতে একটুও ঘাবড়ালেন না। শোনা যায়, হাতটাকে বাদ দিতেই হবে একথা বুঝতে পেরে তিনি নাকি নিজের হাতেই ওই হাতটাকে কনুই পর্যন্ত কেটে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন।

কুমার সিং আবার তাঁর সাহাবাদের বনাঞ্চলে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন তাঁর নিজের জগদীশপুরে। ২২-এ এপ্রিল তিনি তাঁর পুরানো রাজধানীতে এসে প্রবেশ করলেন। আট মাস আগে এখান থেকে তঁকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল।

গঙ্গা পার হবার আগেই তাঁর ভাই অমর সিং দেশপ্রেমিক কৃষক ও গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি দেশরক্ষী বাহিনী গঠন করে তুলেছিলেন। তাঁর সে বাহিনী নিয়ে তিনি কুমার সিং-এর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন।

এমন দ্রুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে জগদীশপুরের ঘটনাটা ঘটে গেল যে, আরা

শহরে যে-সমস্ত ইংরাজ অফিসাররা ছিলেন, ব্যাপারটা টের পেতে তাঁদের কিছুটা সময় লেগে গেল। অথচ বিশেষভাবে জগদীশপুরের উপর নজর রাখবার জন্যই তাঁদের সেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল।

খবরটা পেয়ে সেখানকার জেনারেল লা গ্রাণ্ড প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন। শেষে ২৩-এ এপ্রিল তারিখে আরা থেকে চার শো ইংরাজ সৈন্য দুটো কামান নিয়ে জগদীশপুর আক্রমণ করল। ইংরাজদের কামান দুটো জগদীশপুরের দিকে লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠল। কিন্তু জগদীশপুরের পক্ষ থেকে কামানের প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না।

সম্মুখ আক্রমণের হুকুম পেয়ে ইংরাজ সৈন্যরা সঙ্গিন উচিয়ে দুর্দমবেগে ছুটে গেল। কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। সাহসী ইংরাজ সৈন্যরা কে জানে কেন, হঠাৎ বিভ্রান্তের মত ঊর্ধ্বশ্বাসে পেছন দিকে ছুটতে লাগল। এর কারণ কি আজও জানা যায় নি। শিকারীর তাড়া খাওয়া হরিণের মত তারা বনাঞ্চল থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর যে যে-দিকে পারল ছুটে পালাল। কুমার সিং-এর সৈন্যরা তাদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করে চলল।

একজন ভুক্তভোগীর কাছে থেকে এ জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া গেছে ঃ

"এর পর যা ঘটল, তা বর্ণনা করতে আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে আমরা পালিয়ে আসতে লাগলাম। শত্রু আমাদের পদে পদে পরাজিত করে চলল। তখন আমাদের কারো মধ্যে লজ্জা বলে কোন পদার্থ ছিল না। যে যেখানে নিরাপদ মনে করেছে সেদিকেই ছুটে পালিয়েছে। উপরওয়ালার হুকুম শুনবে কে, শৃঙ্খলার কোন বালাই তো ছিল না। চারদিকে দীর্ঘশ্বাস, অভিসম্পাত আর বিলাপ ছাড়া আর কোন কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। যারা পালাচ্ছিল তাদের মধ্যে দলে দলে লোক সর্দি- গর্মি হয়ে মারা যাচ্ছিল। ওষুধ দেবে কে ? তার তো কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কারণ কুমার সিং ইতিপূর্বেই আমাদের ডাক্তারখানাকে দখল করে নিয়েছে। কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গেই মরে যাচ্ছিল। বাকী সবাইকে এক দিক থেকে কেটে চলেছিল শত্রুরা। বাহকেরা ডুলি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। চারদিকে বিশৃঙ্খলা, চারদিকে আতঙ্ক! স্বয়ং জেনারেল লা গ্রান্ড শত্রুর গুলিতে ধরাশায়ী। শিখরা এ গরমে অভ্যস্ত। তারা আর সবাইকে ফেলে হাতীগুলো নিয়ে পালিয়েছে। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কেউ থাকতে রাজী নয়। একশো নিরানব্বই জন শ্বেতাঙ্গের মধ্যে মাত্র আশিজন প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। গরুগুলোকে যেমন জবাই করবার জন্য কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, আমাদেরও যেন সে উদ্দেশ্যেই জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।"

[চার্লস বলা-রচিত ভারতীয় বিদ্রোহ']

এর দু-এক দিনের মধ্যে কাটা হাত দূষিত হয়ে যাবার ফলে কুমার সিং- এর মৃত্যু হয়।

বিদ্রোহী রোহিলা

রোহিলা!

ভারতের ইতিহাসের অতি অর্বাচীন ছাত্র, সেও তাদের নাম জানে। মুক্ত স্বাধীন বীর পাঠানজাতি। শান্তিতে বসবাস করছিল, ইংরাজের লুব্ধ দৃষ্টি তার উপরে গিয়ে পড়ল। তার শান্তির সংসারে আগুন লাগল। ইংরাজের কূট চক্রান্ত। মুক্ত রোহিলা পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ল।

কিন্তু রোহিলারা সে কথা ভুলতে পারেনি। এ লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা সুযোগের অপেক্ষায় বসে ছিল। বেরিলী তথা সমগ্র রোহিলাখন্ড জুড়ে বৃটিশ-বিরোধী প্রচারণা গোপনে গোপনে কাজ করে চলেছিল। অসন্তোষ আর বিক্ষোভের চাপা আগুন ধুমায়িত হয়ে উঠতে উঠতে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে তার চরম রূপ ধারণ করল।

রোহিলাখন্ডের সিপাইদের কাছে স্বাধীন দিল্লী থেকে আহ্বান এসেছে ভারতের স্বাধীনতার পতাকাকে ঊর্ধে তুলে ধরবার জন্য ঃ

"দিল্লীর সৈন্যবাহিনীর সেনাপতির পক্ষ থেকে বেরিলীর সৈনাবাহিনীর সেনাপতিকে সাদর আলিঙ্গন! ভাইসব, দিল্লীতে ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলছে। আল্লাহ্‌র রহমতে প্রথম যুদ্ধে হেরে গিয়ে ওদের মন ভেঙ্গে গিয়েছে। অন্য সময় দশ বার হারলেও মনের অবস্থা এমন হোত না। বীরগণ দলে দলে দিল্লীর দিকে

চলে আসছে। যদি তোমরা এখন খেতে বসে থাকো, খত পেয়েই অবিলম্বে চলে এসো, এখানে এসে হাত ধোবে। শাহান্‌শাহ্‌ দিল্লীর সম্রাট তোমাদের বিপুল অভিনন্দন জানাবেন, তোমাদের কাজের জন্য যথোচিত পুরস্কৃত করবেন। তোমাদের কামানের গর্জন শুনবার জন্য আমাদের কান উৎসুক হয়ে আছে, তোমাদের দেখবার জন্য আমাদের চক্ষু পিপাসিত। এসো, অবিলম্বে চলে এসো। ভাইসব, বসন্ত যদি না আসে, গোলাপের ডালে কি করে ফুল ধরবে! দুধ যদি না পাওয়া যায়, শিশু বাঁচবে কি করে!

শেষ স্বাধীন রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমতের বংশধর খান বাহাদুর খান গুপ্ত সমিতির জাল বুনে চলেছেন। তিনি পেনসনভোগী। হাফিজ রহমতের বংশধর হিসেবে একটা পেনসন পান আর একটা পেনসন পান ইংরাজের অধীনে বিচার বিভাগের প্রাক্তন কর্মচারী হিসেবে।

ইংরাজের পেয়ারের লোক বলে সারা প্রদেশ জুড়ে তিনি পরিচিত। তাঁর উপর সরকারের গভীর বিশ্বাস। আবার তিনিই হচ্ছেন বেরিলীর গোপন সংগঠনের মধ্যমণি।

দিল্লী থেকে ডাক এসেছে অবিলম্বে চলে এসো।

কিন্তু তা কি করে হয়! ৩১-এ মে-যে নির্ধারিত দিন। সে পর্যন্ত-যে অপেক্ষা করতেই হবে। ক'দিন আগে এক শো জন মীরাট বিদ্রোহী এসেছিল। তারা সিপাইদের লাইনেই থাকত গোপনে, বাইরের লোকের চোখ এড়িয়ে। মীরাটের কাহিনী বর্ণনা করে এখানকার সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে।

তারপর ঘুর্ণি হাওয়ার মত চলে গেছে স্থানান্তরে। সিপাইদের মধ্যে গভীর উত্তেজনা, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই। অক্ষুণ্ন শান্তি বিরাজ করছে। ২৯-এ মে তারিখে একটা গুজব শোনা গেল, সকালবেলা নদীতে গোসল করতে গিয়ে সিপাইরা নাকি কসম করেছে যে, তারা ইংরাজদের কেটে শেষ করবে। সারা দিন চলে গেল। কোন সাড়া শব্দ নেই। সিপাইরা কোন কিছুই করল না। ২৯-এ গেল, ৩০-এ গেল, কোন ঘটনাই ঘটল না। বিশেষ করে শেষের দিনটায় সিপাইদের ব্যবহার যেন আরও মধুর হয়ে উঠল।

কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলেন, বিপদটা এবারকার মত ভালোয় ভালোয় উতরে গেছে, আপাতত ভয় করবার কিছুই নেই।

৩০-এ মের রাত্রি ভোর হোল। ৩১-এ মের রক্ত-রাঙ্গা সূর্য দিগন্তের বেড়া ডিঙ্গিয়ে আকাশের বুকে দেখা দিল, আর সব দিনকার মতই। তবু এ দিনটি আর সব দিনের মত নয়। কি একটা নতুন আশা, নতুন সুর বয়ে নিয়ে এসেছে। কত লোক উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে এ দিনটির দিকে। -কি হয়, কি হয়।

বেলা এগারটা বাজল। সিপাই লাইনে একটা তোপের আওয়াজ শোনা গেল। তার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই কতগুলি রাইফেলের ঝন্‌ঝনা শোনা গেল। আর শোনা গেল আকাশ ফাটানো তীক্ষ্ণ চিৎকার।

বেরিলীর বিদ্রোহীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাদের পরিকল্পনা রচনা করেছিল।

অত্যন্ত নিখুঁত ও সুশৃঙ্খল। কে কোন্ অফিসারকে হত্যা করবে, তাও আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট ছিল। মাত্র বত্রিশ জন অফিসার সেদিন প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন। তাঁরা ওখান থেকে নিরাপদে নৈনিতাল গিয়ে পৌছেছিলেন। ইংরাজের প্রভুত্বের সমস্ত চিহ্ন মাত্র ছ'দিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেল।

যেখানে যেখানে ইউনিয়ন জ্যাক ছিল, টেনে টেনে নামানো হতে লাগল, আর তার জায়গায় উড়তে লাগল জাতীয় পতাকা।

গোলন্দাজ বাহিনীর সুবাদার বখ্‌ত্ খাঁ সমস্ত সৈন্যবাহিনীর উপরে সেনাপতির পদে নিযুক্ত হলেন।

শাহজাহানপুরের সিপাইরা ১৫ই মে তারিখে মীরাটের সংবাদ পেয়েছিল। কিন্তু সিপাইদের চালচলন ও কথাবার্তার মধ্যে কোনই পরিবর্তন দেখা গেল না। কর্তৃপক্ষ তাই নিশ্চিন্ত ছিলেন। ৩১-এ মে'র সকালবেলাও অন্যান্য দিনের মতই শান্ত। বিদ্রোহের কোনই আভাস পাওয়া যায়নি। অথচ সেদিন সন্ধ্যার আগেই শাহজাহানপুর স্বাধীনতার ঝান্ডা উড়ল।

বেরিলীর উত্তর-পশ্চিম দিকে আটচল্লিশ মাইল দূরে মোরাদাবাদ শহর। কর্তৃপক্ষ সংবাদ পেলেন ১৮ই মে তারিখে একদল মীরাট-বিদ্রোহী মোরাদাবাদের কাছাকাছি কোথাও এসে আস্তানা নিয়েছে।

২৯নং রেজিমেন্টকে সে রাত্রিতেই তাদের উপর আক্রমণ করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হোল। বিদ্রোহীরা নাকি বনের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল। উপরওয়ালাদের নির্দেশে ২৯নং রেজিমেন্ট তাদের উপর আক্রমণ করল। কিন্তু বিদ্রোহীদের কেশস্পর্শ করা গেল না। সব পালিয়েছে। গভীর অন্ধকার রাত্রি। চোখে কিছুই দেখা যায় না, সিপাইরা আর কি করতে পারে!

২৯নং রেজিমেন্ট ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল। কর্তৃপক্ষও তাই বিশ্বাস করলেন। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল যে, আক্রমণটা নেহায়েৎ লোকদেখানো।

আরও মজার কথা এই যে, যাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই নাকি মোরাদাবাদের সিপাইদের আশ্রয়েই সে রাত্রিটা কাটিয়েছিল।

সেদিনকার এ আক্রমণের ফলে ২৯নং রেজিমেন্টের উপর ইংরাজদের ষোল আনা বিশ্বাস এসে গিয়েছিল। পুরো মে মাসটা তাদের চালচলন থেকে সন্দেহ করবার কোনই কারণ ঘটে নি।

৩১-এ মে সকালবেলা কোন যাদুমন্ত্রে সব কিছু উল্টে গেল। ইংরাজ অফিসাররা হতবুদ্ধি হয়ে দেখলেন সিপাইরা দলে দলে প্যারেডের ময়দানে গিয়ে জমায়েত হচ্ছে। অফিসাররা এর কৈফিয়ৎ চাইলে সিপাইরা অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিলঃ "কোম্পানীর রাজত্ব আজ থেকে শেষ হয়ে গেল। তোমাদের আজনই, এখনই এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তা-না হলে একজনও প্রাণে বাঁচবে না। এ মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করা তোমাদের পক্ষে যদি সম্ভব না হয়, তৈরি হবার জন্য দুঘন্টা পার হবার আগেই তোমাদের মোরদাবাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

মোরাদাবাদ পুলিশ জানিয়ে দিল, এখন থেকে তারা আর ইংরাজদের হুকুম

মান্য করে চলবে না। শহরের লোকেরাও তাদের কথায় সমর্থন জানাল। সিপাইরা তোষাখানা ও অন্যান্য সরকারী সম্পত্তি অধিকার করে নিল।

সন্ধ্যার আগেই মোরাদাবাদের আকাশে সবুজ নিশান পত পত করে উড়তে লাগল।

বখ্‌ত্‌ খাঁর নেতৃত্বে সমস্ত সিপাই দিল্লীর দিকে যাত্রা করল। খান বাহাদুর খান রাজধানী তথা সারা প্রদেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্য নতুন করে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে লাগলেন। নাগরিকদের মধ্যে অনেকেই এ বাহিনীতে যোগ দিলেন।

বেসামরিক বিভাগে যিনি যে-পদে কাজ করতেন, তিনি সেখানেই কাজ করতে লাগলেন। প্রধান প্রধান পদগুলো এতদিন ইংরাজদের হাতেই ছিল, ভারতীয়রা এখন সে সমস্ত পদে নিযুক্ত হলেন। দিল্লীর সম্রাটের নামে নতুনভাবে ভূমি-কর ধার্য করা হোল। এক কথায় বলতে গেলে বিদ্রোহের ফলে কোনরূপ ভাঙ্গন ধরল না। একমাত্র তফাৎ হল এই, আগে যেখানে বড় বড় পদগুলো ছিল ইংরাজদের হাতে, এখন ভারতীয়দের দিয়ে সে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করা হোল।

খান বাহাদুর খানের নামে প্রকাশিত ইশ্‌তাহার সমস্ত রোহিলা খন্ডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হতে লাগল ঃ

"হিন্দুস্থানের অধিবাসিগণ, বহুদিনের প্রত্যাশিত স্বাধীনতা উৎসব আজ সমাসন্ন। আপনারা কি তাকে গ্রহণ করবেন, না ফিরিয়ে দেবেন ? আপনারা কি এই বিরাট সুযোগ কাজে লাগাতে চান, না অবহেলা করে তাকে হাতছাড়া করবেন।

হিন্দু- মুসলমান ভাইসব, একথা আপনারা সবাই জেনে রাখুন, এ ইংরাজরা যদি আমাদের দেশে টিকে থাকতে পারে তারা আমাদের সবাইকে হত্যা করবে, আমাদের ধর্মকে বিনষ্ট করবে।'

"হিন্দুস্থানের অধিবাসিগণ, এতদিন ধরে আমরা ইংরাজেদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে নিজেরা নিজেদের গলায় ছুরি মেরে এসেছি। এখন থেকে আমরা দেশদ্রোহিতার কলঙ্ক থেকে নিজেদের মুক্ত করব। ইংরাজরা তাদের সে পুরানো কায়দায় আমাদের প্রতারিত করবার চেষ্টা করবে, একথা জেনে রাখবেন।

"কিন্তু হিন্দু ভাইসব, ওদের এই জালে পা দেবেন না। আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা বুদ্ধিমান। তাদের এ কথা বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন করে না যে, ইংরাজরা কখনোই তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে না। তারা কৌশল, চালবাজি ও শঠতায় পারদর্শী। তারা আগাগোড়া এ চেষ্টাই করে আসছে যাতে পৃথিবীর বুক থেকে একমাত্র তাদের ধর্ম ছাড়া আর সমস্ত ধর্মকে উন্মূল করে দিতে পারে। দত্তক সন্তান গ্রহণের অধিকারকে কি তারা ঠেলে ফেলে দেয় নি ? আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলোকে কি তারা একটির পর একটি গ্রাস করে নেয় নি ? নাগপুর রাজ্য কেড়ে নিয়েছে ? কে/ কে কেড়ে নিয়েছে লক্ষ্মৌ? হিন্দু আর মুসলমানকে পদদলিত করেছে কে ?"

"মুসলমান, যদি তোমার কোরআনের উপর ভক্তি থেকে থাকে, হিন্দু গোমাতার উপর যদি তোমার ভক্তি থাকে, তাহ'লে তোমাদের মধ্যে যে-সামান্য বিভেদ রয়েছে, তা ভুলে গিয়ে পবিত্র জেহাদের জন্য ঐক্যবদ্ধ হও। একই পতাকার নীচে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়, রক্তের বন্যায় ভারতের বুক থেকে ইংরাজের নাম ভাসিয়ে নিয়ে যাও। এ যুদ্ধে হিন্দু যদি মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলায়, আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য তারাও যদি যুদ্ধের ময়দানে নেমে আসে, তাহলে তাদের দেশাত্মবোধের পুরস্কার স্বরুপ গোহত্যা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে। যাঁরা এ পবিত্র জেহাদে যোগদান করবেন বা অর্থ দিয়ে অপরকে যুদ্ধ করতে সাহায্য করবেন তাঁরা ঐহিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করবেন। কিন্তু যারা এই স্বাধীনতার যুদ্ধে বাধা দেবে, তারা নিজেদের মাথায় নিজেরা কুড়াল মারবে এবং আত্মহত্যার অপরাধে অপরাধী হবে।"

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা

গভীর রাত্রি। দরজার উপর বারে বারে ঘা পড়তে রাগল। কে যেন ডাকছে। কমিশনার এডওয়ার্ডিস ও মেজর নিকলসন একই ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। শব্দ শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন।

দরজা খুলে দিতে এক জন লোক এসে ঢুকল। জরুরী সংবাদ। দুঃসংবাদ! ৫৫ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের অর্ধেক ব্যাটালিয়ান বিদ্রোহী হয়ে দলত্যাগ করে পালিয়েছে।

যা ভয় হয়েছিল তাই! পেশোয়ারেও তাহলে শুরু হয়ে গেল। তাঁরা তখনই জেনারেল কটনের কাছে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, একমাত্র ২১ নং বেঙ্গল ইনফ্যানট্রিকে বাদ দিয়ে আর সমস্ত সৈন্যকে নিরস্ত্র করুন। ২১ নং বেঙ্গল

ইনফ্যানট্রি সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

সকাল হতেই অস্ত্র কেড়ে নেবার কাজ শুরু হয়ে গেল। সিপাইরাও অবস্থা সঙ্গীণ দেখে কোন উচ্চবাচ্য না করে যার যার হাতের অস্ত্র জমা দিয়ে দিল।

অফিসারদের অনেকেরই এতে মত ছিল না। তাঁরা মনঃক্ষুণ্ণ হলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বৃটিশ ইররেগুলার ক্যাভেলরি ও মুলতান ক্যাভেলরি মর্দানে গিয়ে উপস্থিত হোল। ৫৫ নং রেজিমেন্টের কিছু লোক মর্দানেও ছিল। এ রেজিমেন্টের কর্নেলের নিজের সৈন্যদের উপর অখন্ড বিশ্বাস। তিনি বারে বারেই জেনারেল কটনের কাছে এদের সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করবার জন্য অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু তাতে কোনই ফল হোল না।

২৪-এ রাত্রিতে অধীন দেশী অফিসাররা কার্নেলকে চেপে ধরল। পেশোয়ার থেকে মর্দানে একদল সৈন্য আসছে। কেন? তাদের উদ্দেশ্যই কি, এরা তাঁর কাছ থেকে ভাল করে জেনে নিতে চায়। সকলের মনেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কর্নেল কি বললেন! বলবার মুখ যে তাঁর নেই। প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে দেশী অফিসাররা অপ্রসন্ন ও সন্দিগ্ধ চিত্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কর্নেল মাথা নীচু করে বসে রইলেন। এমন গ্লানি তিনি জীবনে কখনো বোধ করেন নি।

বসে বসে আকাশ-পাতাল কত কি-যে ভাবছিলেন। তাঁর সামরিক জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। যাদের তিনি একান্তভাবে আপন বলে মনে করেন, নিজের মতই বিশ্বাস করেন, তারা আজ তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছে না, শত্রুপক্ষ বলে মনে মনে সন্দেহ করছে। নাই বা করবে কেন? তিনি তো তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে পারছেন না। কতক্ষণ পরে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হাসলেন। তারপর? তারপর হাতের রিভলবারাটার নলটা কপালের উপর চেপে ধরে, রিভলবারের ঘোড়াটা টেনে দিলেন। দ্রুম করে একটা শব্দ, একটু ধোঁয়া, তারপর আবার সবচুপ। সর্বগ্লানিমুক্ত কর্নেল গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর এ ঘুম আর ভাঙ্গবে না।

পরদিন সকালবেলা পেশোয়ার থেকে কর্নেল চুতের বাহিনী এসে পৌছল! তাদের আসতে দেখেই ৫৫নং রেজিমেন্টের এক ব্যাটালিয়ান তাদের নিশান, অস্ত্রশস্ত্র আর টাকা পয়সা নিয়ে সোয়াদের দিকে পালিয়ে গেল।

মেজর নিকলসন একদল ঘোড়সওয়ার নিয়ে তাদের পেছনে পেছনে ছুটলেন। পলাতক সিপাইদের মধ্যে এক শো বিশ জন মারা পড়ল, এক শো পঞ্চাশ জন বন্দী হোল, আর বাকী চার শো জন সৈন্য মেজর নিকলসনের হাত এড়িয়ে সোয়াদে গিয়ে পৌছল।

এক সপ্তাহ আগে ৫১ নং বেঙ্গল ইনফ্যানট্রি থেকে বারো জন সিপাই দলত্যাগ করে পালিয়েছিল। তাদের ধরে এনে প্যারেডের ময়দানে সবার সামনে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এবার ৫৫ নং এর পালা। মেজর নিকলসন যে এক শো পঞ্চাশ জনকে বন্দী করে এনেছেন, তাদের মধ্যে বাছাই করে চল্লিশ জনের উপরে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হোল।

১০ই জুন, সকাল সূর্যোদয়ের সময়। কামানগুলোকে একটির পর একটি লাইন করে সাজানো হয়েছে। ওদের দুরন্ত ক্ষুধা, খাদ্য চাই! মনে হয় যেন অধীর হয়ে উঠেছে।

ডাইনে বাঁয়ে দু'দিক দিয়ে ঘোড়সওয়ার আর পদাতিক দল লাইন বেঁধে

দাঁড়িয়ে। সিপাইরা ছাড়াও সীমান্তের হাজার হাজার অধিবাসী এসে জমায়েত হয়েছে, এমন দৃশ্য দেখবার সুযাগ তো আর সব সময় হয় না। দেখবার জন্যেই তাদের বিশেষভাবে দাওয়াত দিয়ে আনা হয়েছে। বৃটিশ শক্তি বিদ্রোহীদের আক্রমণে বেসামাল হয়ে পড়েছে, এ ধারণার মূলোচ্ছেদ করতেই হবে।

এ নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে নাটকীয় ভঙ্গীতে ব্রিগেডিয়ার নিকলসন এসে দাঁড়ালেন। শৃঙ্খলিত চল্লিশ জন বন্দীকে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের দন্ডাজ্ঞা পড়িয়ে শোনানো হোল। তারপর কামানের মুখে বেঁধে দেওয়া হোল তাদের।

"ফায়ার।"

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দবেদনা, আশা-আকাঙ্খায় ভরা চল্লিশটি মানুষ টুকরো টুকরো হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল!

এরা মরল। মরে বাঁচল। কিন্তু এদের সাথী, বিদ্রোহের সাথী, যারা মেজর নিকলসনের হাত এড়িয়ে সোয়াদে গিয়ে পৌছেছিল, চরম দুঃখ ও লাঞ্ছনা তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এ ইতিহাস বড়ই মর্মান্তিক।

সে সময় সোয়াদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন। দেশের মধ্যে অন্তবিরোধ ভয়াবহ মুর্তি ধারণ করেছে। একদিকে ঐহিক শক্তির পরিচালন 'পাদিশাহ' অপরদিকে আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচালক 'অখন্দ' এ দুয়ের মধ্যে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা চলছে।

চার শো জন বিদ্রোহী সিপাই যুদ্ধের আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়ল। বাঁচতে হলে এক পক্ষের সঙ্গে যোগ দিতে হবেই। তারা পাদিশাহের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করল। কিন্তু তাতে জীবনযাত্রার কোনই সুরাহা হোল না। পাদিশাহের কোষে অর্থ নেই, বিদ্রোহীদের কোন সাহায্যই তিনি করতে পারলেন না।

সহায়সম্বলহীন নিরাশ্রয় বিদ্রোহীরা প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় ঘাটে ঘাটে ফিরতে লাগল, কোথাও ঠাঁই মিলল না। পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলছে, পরণের কাপড় শতচ্ছিন্ন, মাথা বাঁচাবার জায়গাটুকু নেই।

এই দুর্গম বন্ধুর দেশে এ অবাঞ্ছিত মেহমানের দল নিরুদ্দেশ যাত্রীর মত বৃথাই ঘুরে ঘুরে মরতে লাগল। যেদিকে চাও আশার চিহ্ন মাত্র নেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু আলোর রেখা নেই। তারা কোথায় যাবে, কে তাদর আশ্রয় দেবে!

একদিন দেখা গেল, যাকে তারা নেতা বলে নির্বাচিত করেছিল সেই শ্বেতশ্মশ্রু সুবাদারের মৃতদেহ নদীর পানিতে ভাসছে। আর কোন পথ খুঁজে না পেয়ে এ অন্তিম পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন।

বিদ্রোহীরা হতাশ হয়ে এবার শেষ চেষ্টা হিসেবে কাশ্মীরের দিকে মুখ ফেরাল। এ সিপাইরা অধিকাংশই ছিল হিন্দু। তারা মনে মনে ভেবেছিল হাজার হলেও কাশ্মীরের রাজা গোলাপ সিং হিন্দু। এ দুঃসময়ে হিন্দু কি হিন্দুর দিকে মুখ তুলে তাকাবে না! কিন্তু তারা জানত না যে, এ বিদেশী শত্রুদের দালাল যারা, তারা মুসলমানও নয়, হিন্দু ও নয়, তারা একটা আলাদা জাত।

মেজর বেচার কমিশনার এডওয়ার্ডিস সাহেবের কাছে এ পলাতকদের শোচনীয় অবস্থা-সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এ চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ "ওরা প্রথমত খাগানের দিকে যাত্রা করল। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ফিরল এবং

কোহিস্তানের মধ্য দিয়ে আরও দুর্গম পথ ধরে এগিয়ে চলল গিরগিটের দিকে। তাদের মনে আশা যে, কাশ্মীরে গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়তো তাদের আশ্রয় মিলবে।"

অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীণ, কোন দিকে কোন আশার আলো দেখতে না পেয়ে তাদের একজন অফিসার গুলী করে আত্মহত্যা করল। আরও দুএকজন এর আগেই মার গেছে। কয়েকজন খুবই অসুস্থ। ওদের সঙ্গে কোনই যানবাহন নেই ওরা ক্ষুধার্ত! . . . পথ অত্যন্ত দুর্গম, সে দেশের লোকরাও সাধারণত এ পথ দিয়ে চলাচল করে না। ওদের কোন আশ্রয় নেই, আমার বিশ্বাস খুব কম লোকই এখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে।"

"এ ছাড়া মহারাজ গোলাপ সিং সংবাদ পেয়ে গিলগিট সীমান্তের দিকে এক রেজিমেন্ট সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, পলাতকেরা সে পথ দিয়ে গেলে তিনি তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। তিনি গুজর এবং ওখানকার অন্যান্য উপজাতীয়দের হুঁশিয়ারী দিয়ে দিয়েছেন যে, তারা বিদ্রোহী সিপাইদের পেলেই যেন সাবাড় করে দেয়।"

"আমার কয়েকজন বার্তাবহ এদের স্বচক্ষে দেখেছে। এর অধিকাংশই হিন্দু। উলঙ্গ কঙ্কালসার বিকৃতদেহ লোকগুলোকে দেখে সবাই ভয়ে শিউরে ওঠে। ছেলেমেয়েরা ঢিল ছোঁড়ে , মেয়েরা গালি দেয় –গোল্লায় যা, অসভ্য কালো কাফেরের দল!"

৮৬

"পাকলি ও হাজারার লোকেরা আমার ডাকে আশ্চর্যভাবে সাড়া দিয়েছে! আমার শিবিরে তাদের ভীড় বেড়েই চলেছে। . . . . সীমান্তের সর্দাররা সবাই এ ব্যাপারে আমাকে আশ্বাস দিয়েছে। খাগানের সৈয়দরা যদি তাদের সীমান্তে কড়া পাহারার ব্যবস্থা না রাখত, তাহলে পলাতকেরা-যে সে সহজ পথ দিয়েই পালাত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। অবশ্য সে পথ দিয়ে গেলেও তাদের অব্যাহতি ছিল না, কারণ মুজফ্‌ফরাবাদের গোলাপ সিং-এর সৈন্যরা তৈরি হয়েই ছিল।"

পলাতকেরা দলে দলে ধরা পড়তে লাগল। মিলিটারী আদালতের বিচারে তারা সবাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হোল। এদের মধ্যে কাউকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, কাউকে বা তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্যারেডের ময়দানে সকলের সামনেই এ দণ্ড দেওয়া হোত, যাতে তা অন্যান্যদের মনে হুঁশিয়ারী ও আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি করতে পারে।

মেজর বেচার তাই উল্লসিত হয়ে সদম্ভে বলেছেনঃ "এ ভাবে ৫৫নং রেজিমেন্টের শেষ লোকটি পর্যন্ত বন্য পশুর মত আমাদের জালে ধরা পড়ল। এরই মধ্য দিয়ে আমরা বিদ্রোহী রেজিমেন্টগুলোর কাছে হিতকরী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছি। তাদের কাছে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পেরেছি কি সুদূরপ্রসারী আমাদের শক্তি! সীমান্তের ওপারে গিয়েও অব্যাহতি নেই, সেখানে গেলেও আশ্রয় মিলবে না।"

আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এর কেউ ভয় বা দুর্বলতা প্রকাশ করে নি। নির্ভীকচিত্তে, অবহেলার সঙ্গে তারা মৃত্যুকে বরণ করেছে। মরবার আগে একটি মাত্র ইচ্ছা তারা জানিয়েছিল যে, তাদের কুকুরের মত ফাঁসিতে না লটকিয়ে তোপের মুখে যেন উড়িয়ে দেওয়া হয়। এভাবে হাজারা অঞ্চলে দুশো লোককে হত্যা করা

হয়েছিল।

কামানের মুখে দাঁড়িয়ে, জীবনের শেষ হিসেব নিকেশ করতে গিয়ে শহীদেরা হয়তো মনে মনে ভেবেছিল, ব্যর্থ হয়েছে আমাদের এ জীবনদান। আমরা ও আমাদের দেশের লোকেরাও হয়তো সে কথাই মনে করি।

কিন্তু আমাদের কবি সে কথা বলেন না।

তিনি বলেন– না,না,না,

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

উজনালার অন্ধকূপ হত্যা

অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী।

কল্পিত অন্ধকূপের কাহিনী থেকেও নৃশংস, ইচ্ছাকৃত ও বীভৎস! প্রতিপক্ষের ঐতিহাসিকের প্রচার নয়। এ অন্ধকূপ হত্যার অনুষ্ঠাতা যিনি তিনি নিজের মুখেই তাঁর এ কীর্তিকাহিনী প্রচার করে গেছেন। করবেন নাই বা কেন ? তখনকার দিনে এ-যে মহা গৌরবের কথা। তাঁর এ অপূর্ব কৃতিত্বের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁকে বীরের সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর নাম ফ্রেডারিক কুপার। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার।

কল্পিত অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী নিয়ে দেশবিদেশে কতই না প্রচারের ঢাক বাজানো হয়েছে! সে ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের পশু-প্রকৃতিকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উদঘাটিত করে দেখাবার জন্য কত চেষ্টাই না হয়েছে!

কিন্তু কই, এ বাস্তব অন্ধকূপ হত্যার মর্মান্তিক কাহিনী দেশবিদেশের লোক জানে কি ? বেশী কথা বলে লাভ নেই, আমরাই কি জানি ?

ঘটনাটা ঘটেছিল পাঞ্জাবের উজনালায়।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে মিঞামীরের ২৬ নং ইনফ্যান্ট্রিকে নিরস্ত্র করবার আদেশ দেওয়া হয়। তারা শান্তভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে হাতের অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখল। বিনা কারণে এভাবে লাঞ্ছিত হয়ে ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় তারা মাটিতে মিশে যেতে চাইল। কিন্তু হতভাগ্য সিপাইরা সেদিন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মত ভাষা খুঁজে পায় নি।

নিরস্ত্র সিপাইর জীবন বড়ই দুর্বহ। তাকে দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হয় না, নিশ্চিন্তমনে স্বাধীনভাবে থাকতেও পারে না। গোরা সৈন্যরা ও রাজভক্ত শিখ সৈন্যরা সব সময় এদের চোখে চোখে রাখত। মনেমনে সন্দেহ ছিল কি জানি কখন কি করে বসে! এ অকর্মন্য নজরবন্দী জীবন তাদের কাছে ক্রমশঃই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। খাঁচার পাখী বাইরে বেরোবার জন্য পাখা আছড়ে মরতে থাকে।

সুযোগও মিলে গেল।

৩০-এ জুলাই। সেদিন হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে– ধূলোর ঝড়, যাকে বলে আঁধি। চোখে কিছুই দেখা যায় না। ধূলোর ঝাপটা এসে শন শন করে চাবুক মারছে। আতঙ্কে সবাই ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। কিসের বা নিয়ম, আর কিসের বা শৃঙ্খলা।

২৬ নং ইনফ্যানট্রি এ সুযোগ নষ্ট করল না। খাঁচার বেড়া ভেঙ্গে তারা বেরিয়ে পড়ল। টের পেয়ে শিখ সৈন্যরা দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে নির্বিচারে গুলি চালাতে লাগল। মেজর স্পেন্সার তাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন। সিপাইদের হাতে ছোরা-ছুরি ছাড়া কোন অস্ত্রই ছিল না। তাই দিয়ে তারা তাদের পালাবার পথ মুক্ত করল। মেজর স্পেন্সার ও সার্জেন্ট মেজর নিহত হলেন। ফ্রেডারিক কুপার নিজেই বলেছেন যে শিখদের এ নির্বিচার গুলি চালনার ফলেই ব্যাপারটা এমন গুরুতর হয়ে দাঁড়াল, ভাল

মন্দ মাঝারি সব রকমের সিপাইরাই একই পথের পথিক হতে বাধ্য হোল।

২৬নং ইনফ্যান্‌ট্রি ধূলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘটনার এ হোল সূচনা।

ঘটনার নায়ক অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার ফ্রেডারিক কুপার এ সময় রঙ্গমঞ্চে এসে প্রবেশ করলেন।

সিপাইরা প্রাণের ভয়ে ইরাবতী নদীর দিকে ছুটে চলেছে, নদীর ওপারে গিয়ে যদি কোন মতে রক্ষা পাওয়া যায়। পেছন পেছন তাড়া করে আসছেন ফ্রেডারিক কুপার। তাঁর সঙ্গে সত্তর আশি জন সশস্ত্র সওয়ার।

নদীতীরে এসে সিপাইরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। নৌকো নেই, পার হবে কি করে! গ্রামের লোক ভয়ে সাহায্য করতে এগোল না। এর মধ্যে খবর পেয়ে উজনালা থেকে তহশিলদার সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে এসে হাজির।

নিরস্ত্র সিপাইদের উপর তারা এসে চড়াও করল। সে আক্রমণে দেড় শো সিপাই সেখানে প্রাণ দিল। ইরাবতীর বালুভূমি অসহায় সিপাইদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেডারিক কুপার তাঁর সওয়ারদের নিয়ে নদীতীরে এসে উপস্থিত হলেন। এর পরে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, তার বিবরণ ফ্রেডারিক কুপারের নিজের জবানী থেকেই তুলে দেওয়া হোল ঃ "সিপাইদের মধ্যে অনেকেই নদীতে ডুবে যায়। নদীর মাঝামাঝি ছোট একটা দ্বীপ ছিল। অনেকে কাঠের টুকরোর উপর ভর করে ভেসে সেই দ্বীপের দিকে যেতে থাকে। এরা সবাই অনাহারে অবসন্ন ও পথশ্রমে ক্লান্ত। তার উপর হঠাৎ আমরা গিয়ে যখন আক্রমণ করলাম তখন সবাই প্রাণের আশা ছেড়ে দিল। বুনো পাখীগুলো যেমন নদীর মধ্যে সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করে, এরাও সেরকম সাঁতার কাটতে লাগল। ওদের ধরে আনবার জন্য দু'খানা নৌকো পাঠালাম। বিশ মিনিটের মধ্যে নৌকো দু'টি সে দ্বীপে গিয়ে ভিড়ল। ভয়ে আর নিরাশায় কোন পথ খুঁজে না পেয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ জন সিপাই আবার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তাদের ধরবার জন্য যে-সওয়ারেরা গিয়েছিল তারা ওদের মাথার দিকে তাক করে গুলি করতে গেল আমি যখন তাদের গুলি করতে নিষেধ করলাম, তখন গলাভক সিপাইরা ভাবল ডেপুটি কমিশনার সাহেব বোধ করি তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করবেন। এ কথা মনে করে তারা সওয়ারদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। তারা হাত বাঁধবার সময় কোনরকম বাধা দিল না! তারা মনে করেছিল সামরিক আদালতে তাদের যথারীতি বিচার হবে এবং বিচারের আগে অন্তত একবার তাদের পেট ভরে খেতে দেওয়া হবে।"

৮৯

"রাত দুপুরের সময় দুশো বিরাশী জন বন্দী সিপাইকে উজনালার থানায় নিয়ে আসা হোল। এ ছাড়া তাঁবুর বাহক ডুলি বেহারা প্রভৃতি অনুচরদের গ্রামের লোকদের জিম্মায় রাখা হোল। তার পরদিন অল্প অল্প বৃষ্টি ছিল বলে এদের মেরে ফেলবার কাজটা স্থগিত রাখতে হয়।"

"এ কাজের জন্য ১লা আগস্ট দিন ধার্য করা হোল। এ দিন বক্‌র ঈদের দিন। মুসলমানদের একটি প্রধান পর্ব। এ দিনেই বন্দী সিপাইদের হত্যার আয়োজন করা হোল।"

"আমি সিপাইদের বাঁধবার জন্য বেশী করে দড়ি সংগ্রহ করে আনতে বলে

দিয়েছিলাম। শিখ সৈন্যরা দড়ি নিয়ে এলো। সে জায়গায়টায় বেশী গাছ ছিল না। কাজেই এতগুলো সিপাইকে ফাঁসি দেওয়া সম্ভব হোত না। প্রতিবারে দশ জনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গুলি করে মারাই স্থির হোল। সিপাইরা একথা ভাবতেও পারে নি। যখন জানতে পারল, খুবই বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।"

"প্রতিবারে দশ জন করে দড়ি দিয়ে বাধা সিপাইকে বধ্যভুমিতে নিয়ে আসা হতে লাগল। শিখ সৈন্যরা গুলি করবার জন্য তৈরি হয়েই ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট থানায় বসে সমস্ত তদারক করছিলেন। তাঁর কর্মচারীরা তাঁর চার পাশে বসে সে ভয়ংকর ঘটনা দেখছিল। দন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত সিপাইরা এদের নিকট দিয়ে যাবার সময় ম্যাজিস্ট্রেট ও শিখ সৈন্যদের গালি দিতে লাগল। প্রতিবারে দশ জন করে সিপাই প্রাণ দিতে লাগল। এভাবে এক শো পঞ্চাশ জন সিপাই যখন মারা গেল, তখন একজন ঘাতক মূর্ছিত হয়ে পড়ল।"

"কিছুক্ষণ সময়ের জন্য বন্ধ রাখবার পর আবার আগেকার মতই কাজ আরম্ভ হোল। দুশো সাইত্রিশ জন সিপাইকে এভাবে মারা হলে পর একজন কর্মচারী ম্যাজিস্ট্রেটকে এসে জানাল যে, আবশিষ্ট সিপাইরা প্রাচীরের ভেতরকার ছোট্ট ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে না। এদের ঐ ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল। সংবাদ পেয়ে আমি নিজেই সেখানে গেলাম। ঘরের দুয়ার যখন খোলা হোল তখন দেখা গেল যে, হলওয়েলের বর্ণিত ব্যাপার এখানেও ঘটেছে। ভয়ে শ্রান্তিতে আবসন্নতায় অতিরিক্ত গরমে এবং আংশিকভাবে শ্বাসরোধের ফলে ঐ ঘরের পয়তাল্লিশ জন সিপাই প্রাণত্যাগ করেছে। স্থানীয় মুর্দাফরাসদের দিয়ে লাশগুলোকে বের করা হোল। থানার এক শত গজ দূরে একটি গভীর কুয়ো ছিল ঃ নিহত সিপাইদের লাশগুলো ঐ কুয়োতে ফেলে দেওয়া হোল। কানপুরে যেমন একটি কুয়ো আছে উজলাতেও তেমনি একটি কুয়ো রইল।

[কুপার-লিখিত 'ক্রাইসিস ইন দি পাঞ্জাব']

কুপার তাঁর এ অপূর্ব কৃতিত্বে ইংরাজ জাতির মুখ উজ্জ্বল করলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে এ ব্যাপারে তাঁর সমঝদারের অভাব হয় নি। এজন্য উপরওয়ালাদের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। অনেক বড় বড় লোকদের কাছ থেকে প্রশংসাপত্রও পেয়েছেন।

চীফ কমিশনার স্যার জন্য লরেন্স এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে পত্র লিখে-ছিলেন। স্বয়ং গভর্নর জেনারেল তাঁকে প্রশংসা জানালেন। প্রধান বিচারপতি রবার্ট মন্টগোমরি প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কুপারকে লিখে পাঠান, যতদিন কুপার সাহেব জীবিত থাকবেন, ততদিন তাঁর টুপিতে জয়চিহ্ন বর্তমান থাকবে। মন্টগোমারি সাহেব আরও লিখেছিলেন যে, লাহোরের তিন রেজিমেন্ট সিপাইও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদেরও ঠিক এ রকম ব্যবস্থা করাই দরকার।

লাহোরের সিপাইদের মধ্যে চাঞ্চল্য মন্টগোমারি সাহেবের বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পেছনকার ব্যাপারটা হচ্ছে এই ঃ ঘোড়সওয়ার সিপাইরা যে-সমস্ত ঘোড়াগুলোকে ব্যবহার করত সেগুলো ছিল তাদের নিজেদের সম্পত্তি। নিরস্ত্র করা উপলক্ষে গভর্নমেন্ট তাদের নিজেদের ঘোড়াগুলোকে পর্যন্ত নিয়ে নিলেন। এতে সিপাইরা স্বাভাবতঃই উত্তেজিত হয়ে উঠল। সিপাইদের এ অন্যায় ব্যবহারে মন্টগোমারি সাহেব খুবই বিরক্তি বোধ করছিলেন। কুপারের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে তিনি মনে মনে আশা করছিলেন উজনালার মতই লাহোরের তিন হাজার সিপাইকেও উৎসন্ন করে দেওয়া যাবে। সমাজের এ জঞ্জালগুলোকে সাফ্ করে সমাজটাকে ভদ্রলোকের বাসযোগ্য করে দিয়ে যাবেন, এ কামনা হয়তো তাঁর

মনে ছিল। এ কাজটি সুসম্পন্ন করতে পারলে তিনিও যতদিন বেঁচে থাকতেন তাঁর টুপীতে জয়চিহ্ন পরে যেতে পারতেন। কিন্তু বিচারপতির জীবনে এ সুযোগ খুবই কম।

কুপারের এ হত্যাকান্ড সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখেছেন ঃ "কুপারের বর্ণনা থেকে মনে হয় উজনালার অন্ধকূপে জীবিত ব্যক্তিও ছিল। এদের অদৃষ্টে কি ঘটেছিল তার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। একজন আহত সিপাইকে মহারানীর সাক্ষী স্বরূপ রাখা হয়েছিল। মন্টগোমারির অনুরোধে তাকে লাহোর পাঠনো হয়। এর পর আরও একচল্লিশ জন সিপাই ধরা পড়ে। তাদেরও এ সঙ্গেই লাহোরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে এদের সবাইকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হোল। এ সকল অসহায়-কর্তৃপক্ষের নিজের ভাষায়-নিরস্ত্র ভয়বিহ্বলচিত্ত নাহারে বিশুষ্ক এবং ক্লান্তিতে অবসন্ন লোকের ধ্বংস সাধন কোন্ অপরাধে কোন্ আইনে হয়েছিল ?"

[মার্টিন- লিখিত 'ইন্ডিয়ান এম্পায়ার, ২য় খন্ড']

ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেব প্রশ্ন তুলেছেন এদের ধ্বংসসাধন করা হোল কোন্ আইনে ?

সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদল দেশের পর দেশ আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে, সোনার দেশ লুটেপুটে ছারখার করে দিয়েছে শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আজও করছে।

পৃথিবীর নির্যাতিত মানবতা বার বার এ প্রশ্ন তুলেছে আজও তুলছে- কোন্ আইনে ?

এ আইন পশুবলের আইন।

মানব-সমাজে এইটাই কি শেষ কথা, এটাই কি শেষ উত্তর ?

না, কখনো না, হতে পারে না। পৃথিবীর অত্যাচারিত জনগণ আর্জ বুকের রক্ত ঢেলে সে জবাবের পাল্‌টা জবাব দিচ্ছে। দস্যুদের কথা কখনোই শেষ কথা হতে পারে না।

একটি গুপ্তচরের কাহিনী

প্লাম-কেক চাই প্লাম-কেক, বাড়িয়া কেক, তাজা কেক!'

নাইনটি -থার্ড হাইল্যান্ডার্স এর সার্জেন্ট ফররেস মিচেল তাঁর তাঁবুতে সংবাদপত্রের মধ্যে ডুবে আছেন। কাগজগুলো সদ্য বিলাত থেকে এসেছে। হঠাৎ তাঁর কানে এল

"প্লাম-কেক !"

মিচেল মুখ তুলে কেক-বিক্রেতার দিকে তাকালেন। বয়সে তরুণ, দিব্যি সুপুরুষ লোকটি। পরণে পরিষ্কার ফিটফাট পোশাক। কালো কোকড়ানো গোঁফ দাড়ি সযত্নে সজ্জিত চোখ দু'টিতে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। পেছনে একটি কুলী প্লাম কেকের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে চলেছে।

লোকটি তাদের নিজেদের বাজারের কেউ নয় বাইরে থেকে এসেছে। কাজেই এর সম্পর্কে একটু ভাল করে খোঁজখবর নেওয়া দরকার। যে-দিনকাল পড়েছে কাকেও কি বিশ্বাস আছে! নাঃ খবরের কাগজের মায়া ছাড়তেই হোল। সার্জেন্ট মিচেল জেরা করবার জন্য তৈরি হয়ে বসলেন। তাঁবুর জিম্মাদারী তাঁরই উপরে পড়েছে।

"তাঁবুর মধ্যে যে এসেছ, তোমার সঙ্গে পাস আছে তো ?" মিচেল প্রশ্ন করলেন।

"আছে বই কি সার্জেন্ট সা'ব। খোদ ব্রিগেডিয়ার আড্রিয়ান হোপ সাহেবের দেওয়া পাস আমার সঙ্গে রয়েছে। আমার নাম জ্যামি গ্রীন। আমি-নং রেজিমেন্টের মেস খানসামা ছিলাম। কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পরিচয়-পত্র নিয়ে আমি উনাওয়ে এসেছি।"

সার্জেন্ট মিচেল লক্ষ্য করলেন জ্যামি গ্রীন শুধু চেহারাতেই সুপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত নয়, সে অতি স্বচ্ছন্দে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে কথা বলে চলেছে।

জ্যামি তার পাশে বসে বিলাতী কাগজগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বিলাতের কাগজওয়ালারা সিপাইদের বিদ্রোহ-সম্পর্কে কি লিখেছে, তা জানবার জন্য তার বিশেষ কৌতূহল দেখা গেল। লক্ষ্মৌ আক্রমণের জন্য কি-রকম প্রস্তুতি চলছে এবং ইউরোপীয় সৈন্যদের যে-নতুন চালান এসে গেছে তারা এ আবহাওয়া কতদূর

পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে সমস্ত প্রশ্ন করতে লাগল।

মিচেল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এমন ভাল ইংরাজী বলতে কি করে শিখলে তুমি ?"

'আমার আব্বাও একটি ইউরোপীয় রেজিমেন্টের খানসামা ছিলেন। সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করবার ফলে ছেলেবেলা থেকেই আমি ইংরাজীতে কথা বলতে পাকা হয়ে উঠেছিলাম। তা ছাড়া রেজিমেন্টের স্কুলে আমি লেখাপড়া শিখেছি। আমাকে অনেকদিন মেসের রাইটার হিসেবে কাজ করতে হয়েছে, সেখানে হিসেবপত্র ইংরাজীতেই রাখতে হোত।"

ইতিমধ্যে তাঁবুর বাসিন্দারা অনেকেই কেকের সদ্ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। একজন তো কেক খেয়ে দিব্যি হাত মুখ মুছে বসে আছে, একটি পয়সাও বের করতে চায় না। এ নিয়ে জ্যামির কুলীর সঙ্গে তার রীতিমত বচসা বেধে উঠল।

ব্যাপার দেখে জ্যামি বলে উঠল, "ঠাট্টা ঠাট্টাই, সে কথা কি আমরা বুঝি না ? কিন্তু এক গুচ্ছের কেক খেয়ে নিয়ে শেষে পয়সা দিতে স্রেফ অস্বীকার করে বসা এ ঠাট্টা তো দেখছি হাইল্যাণ্ডী ঠাট্টা!"

জ্যামির কথায় সবাই হেসে উঠল। যে-লোকটা পয়সা দিতে চাইছিল না' তাকে চাপ দিয়ে পয়সা আদায় করে ছাড়ল।

এর পরেই জ্যামি ও লোকটি কেক বিক্রি করবার জন্য অন্য এক তাঁবুতে চলে গেল। যাবার সময় জ্যামি সার্জেন্ট মিচেলের কাছ থেকে পড়বার জন্য কয়েকটা সংবাদপত্র চেয়ে নিয়ে গেল।

জ্যামির সঙ্গে সার্জেন্ট মিচেলের প্রথমবারের সাক্ষাৎ এ ভাবেই শেষ হোল।

সে দিনই সন্ধ্যার সময় মিচেল যখন তাঁর ডিউটি দিচ্ছেন, এমন সময় এক চমকপ্রদ খবর পাওয়া গেল, কেক বিক্রেতা জ্যামি আর তার সে সংগী দুজনেই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। গুপ্তচরের কাজ করবার জন্যই ওদের লক্ষ্ণৌ থেকে পাঠানো হয়েছে। তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। মেজর ব্রিগেডিয়ারের অফিসে তাদের জেরা চলছে। রাত্রি অনেকটা হয়ে গেছে বলে আজ রাত্তিরে আর তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে না; এ রাত্রিটির জন্য তাকে মিচেলের জিম্মায় রাখাই স্থির হয়েছে, এজন্য অতিরিক্ত পাহারা মোতায়েন করা হবে।

খবরটা পেয়ে তাঁর মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল। গুগুপ্তচরকে সবাই ঘৃণা করে, দারুণ ঘৃণা করে। তাদের জন্য কারো মনেই দয়া বা অনুকম্পার ভাব থাকে না। তবু

কাল যেটুকু আলাপ হয়েছিল তারই মধ্য দিয়ে লোকটি সম্পর্কে মিচেলের মনে গভীর শ্রদ্ধার ভাব জেগেছিল আর তার কর্মক্ষমতা- সম্পর্কে একটা উঁচু ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। তারই তাঁর মনের মধ্যে একটা খট্‌কা লেগেছিল যে, এ রকম চেহারা ও শিক্ষা যার সে এক জন ফিরিওয়ালার সাধারণ কাজে নামতে যাবে কেন। সম্প্রতি এ খবরটা পেয়ে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

একটু বাদেই কয়েকজন প্রহরী জ্যামি গ্রীনকে মিচেলের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে গেল। পরদিন সকাল পর্যন্ত তাকে সেখানে রাখতে হবে। যে-লোকটি কেকের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে চলেছিল, তার নাম মিকি। তাকেও সেখানেই আটক করে রাখা হোল। তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে কানপুরে যে নৃশংস হত্যাকান্ড হয়েছিল, এ লোকটি নাকি তাতে অংশ গ্রহণ করেছিল।

মিচেলের হাতে বন্দীদের রাত্রির মত সমর্পণ করেই প্রহরীরা ক্ষান্ত হোল না। তারা বাজার থেকে শুয়োরের গোশত আনবার ব্যবস্থা করতে লাগল। ফাঁসিতে ঝোলাবার আগেই এ গোশ্ত আনবার ব্যবস্থা করতে লাগল। ফাঁসিতে ঝোলাবার আগেই এ গোশ্ত খাইয়ে তাদের ধর্ম নষ্ট করতে হবে। মিচেল তাদের এ কাজে বাধা দিলেন। তিনি প্রহরীদের এ বলে শাসিয়ে দিলেন যে, বন্দীদের উপর যদি কোনরকম জুলুম করা হয়, তবে তা কোনমতেই বরদাস্ত করা হবে না এবং শৃঙ্খলা-ভঙ্গের অপরাধে তাদের গ্রেফতার করা হবে।

মিচেলের এ কথায় জ্যামি গ্রীন কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল "আপনার কাছ থেকে এতটা দয়া আমি আশা করি নি। আল্লাহ্ ও রসুল আপনার মঙ্গল করবেন।"

মিচেল তাদের হাতের বাঁধন খুলে দেবার জন্য নির্দেশ দিলেন, যাতে তারা মুক্তভাবে নামাজ পড়তে পারে। তাদের জন্য বাজার থেকে ভাল ভাল খানা ও সুগন্ধি তামাক আনিয়ে দেওয়া হোল। জ্যামি গ্রীন পরম আনন্দে তাদের সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেলে মিচেল জ্যামি গ্রীনকে তার নাম ধাম পরিচয় কার্যকলাপ ইত্যাদি খুলে বলবার জন্য অনুরোধ করলেন। জ্যামি আপত্তি করল না। কম্বল পেতে আরাম করে বসে সে তার জীবনের ইতিহাস বলতে শুরু করলো।

"খোদাকে বহুত শোকরিয়া জানাই যে, এমন সহৃদয় এক সাহেবের সঙ্গে তিনি আমার জীবনের শেষ রাত্রিটি কাটাবার সুযোগ দিয়েছেন। সার্জেন্ট সাহেব এ আমার কিসমৎ। আপনি আল্লাহর এ মজলুম বান্দাহ্র প্রতি যে-দয়া দেখিয়েছেন, সেজন্য আল্লাহ্ আপনাকে আখেরে পুরস্কৃত করবেন।"

"আপনি আমার জীবনকাহিনী জানতে চেয়েছেন, জানতে চেয়েছেন আমি সত্য সত্যই একজন গুপ্তচর কিনা। তবে শুনুন গুপ্তচর বলতে যাদের বোঝায় আমি ঠিক

সে পর্যায়ের লোক নই। আমি বেগমের বাহিনীর একজন অফিসার, লক্ষ্ণৌর সৈন্যবাহিনীর চীফ ইঞ্জিনিয়ার আমি। আপনাদের সৈন্যসংখ্যা কত, আপনারা সঙ্গে সীজ ট্রেন' নিয়ে এসেছেন কিনা, আপনাদের সম্পর্কে এ-সমস্ত খোঁজখবর নেবার জন্যই লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ আমার সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে দিলেন না। আমার কথা ছিল আজ বিকেলেই ফিরে যাবো। তাহলে কাল সকালে সূর্য উঠবার আগেই আমি লক্ষ্ণৌ পৌছতে পারতাম। যে-সমস্ত খবর আমার জানবার ছিল, সবই জানা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার কেমন একটা ঝোঁক এসে গেল আর একবার উনাওটা ঘুরে যাই। আপনাদের সীজ ট্রেন আর এ্যামিউনিশন পার্ক' লক্ষ্ণৌর পথে চলতে শুরু করেছে কিনা, নিজের চোখে দেখে যাবার জন্য আমি খুবই উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম। ঠিক সে সময়ই আমি এক হতভাগার দৃষ্টিতে পড়ে গেলাম।"

"যে-লোকটা আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে, সে প্রথমত ইংরাজদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। এখন ফাঁসির হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের সাফাই গাইবার উদ্দেশ্যে তার দেশের ভাইদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কিন্তু আল্লাহ্ ন্যায় বিচারক, এ দেশদ্রোহিতার জন্য একদিন তাকে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে। (যে-লোকটি জ্যামি গ্রীনকে গুপ্তচর বলে ধরিয়ে দিয়েছিল, পরের বছর মে মাসে তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে বেরিলীতে যখন প্রথম

বিদ্রোহ দেখা দেয়, তখন সে তার ইংরাজ প্রভুকে হত্যা করেছিল)"

"আপনি আমার নাম জানতে চেয়েছেন, আপনার স্কটল্যান্ডের বন্ধুদের কাছে আপনি আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী লিখে জানাতে চান। বেশ তো, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। লন্ডন ও এডিনবার্গ শহরে আমাকে দু'দু'বার যেতে হয়েছে। সেখানে আমার কয়েকজন পুরানো বন্ধুও আছেন।"

"আমার নাম মহম্মদ আলী খাঁ। রোহিলাখন্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম। আমি বেরিলী কলেজে পড়তাম। বেরিলী কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে আমি রুরকী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষায় আমি সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করি। যে সমস্ত ইউরোপীয় ছাত্র সেখানে পড়তেন তাঁদের চেয়ে কি সিভিল কি মিলিটারী দুটো বিভাগেই আমি অনেক বেশী ভাল ফল দেখিয়েছিলাম।"

"কিন্তু তাতেই বা লাভ কি হোল ? কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে জমাদারের র‍্যাংক-এ আমাকে নিয়োগ করা হোল। ফলে আমাকে এমন একজন ইউরোপীয়ান সার্জেন্টের অধীনে কাজ করতে হোত, যে আমার চেয়ে একমাত্র গায়ের জোর ছাড়া আর সব বিষয়েই হীন ছিল। শিক্ষা বলতে তার প্রায় কিছুই ছিল না। ইংল্যান্ডে থাকলে মিস্ত্রীর চেয়ে উঁচু পদে উঠবার সুযোগ সে কখনোই পেত না। মূর্খ লোকের হাতে ক্ষমতা পড়লে যা হয় তার বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ইউরোপীয়ানদের

মধ্যে যে-সমস্ত দোষ দেখা যায়, তার সবগুলোই তার মধ্যে প্রখর হয়ে ফুটে উঠেছিল। তার গোঁয়ার্তুমী ঔদ্ধত্য আমাদের সব চেয়ে বেশী উত্ত্যক্ত করে তুলত।"

"কেবলমাত্র টাকার লোভে আমি কোম্পানীর চাকরিতে ঢুকি নি, আশা ছিল একটা সম্মানজনক কাজ পাব। কিন্তু ঢুকেই পেলাম শুধু অপমান আর লাঞ্ছনা। যাকে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতাম তারই অধীনে তারই হুকুম মেনে আমাকে কাজ করতে হোত। সমস্ত অবস্থা খুলে জানিয়ে বাড়ীতে আব্বার কাছে চিঠি লিখলাম। লিখলাম, মান-সম্মান নিয়ে এখানে আর কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। আব্বা আমার অবস্থাটা বুঝলেন, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন- কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এস। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।"

"ভেবেছিলাম অযোধ্যার নবাব নাসিরুদ্দিনের সরকারে কাজ নেব। কিন্তু লক্ষ্ণৌতে এসে পৌঁছতেই শুনি লক্ষ্ণৌ বিরাট সংকটের মুখে। কোম্পানী বাহাদুর লক্ষ্ণৌ শহরের উপর যথেচ্ছ লুণ্ঠন শুরু করে দিয়েছেন। আর তাদের সে মহৎ কাজে সাহায্য করবার জন্য নেপালের জঙ্গ বাহাদুর সসৈন্যে সেখানে উপস্থিত আছেন। সেখান থেকে তিনি বিলাত যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শুনতে পেলাম তাঁর নাকি একজন ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী প্রাইভেট সেক্রেটারীর প্রয়োজন। শুনেই প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদের জন্য দরখাস্ত করে দিলাম। কোন বেগ পেতে হোল না। সঙ্গে সঙ্গেই দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেল।"

"যথাসময়ে এ নতুন চাকরি নিয়ে মহারাজার সঙ্গে রওয়ানা হলাম। এ আমার প্রথম বিলাতযাত্রা। লন্ডন থেকে যখন এডিনবার্গ গিয়ে পৌঁছলাম তখন আপনাদের এ নাইনটি-থার্ড হাইল্যাণ্ডার্সই মহারাজার সংবর্ধনা উপলক্ষে 'গার্ড অব অনার' দেয়। তখন কি একবার স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম যে, একদিন হিন্দুস্থানে এ রেজিমেন্টেরই তাঁবুতে আমাকে মৃত্যুপ্রতীক্ষায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে! নসিবে কি আছে কেই বা তা বলতে পারে, আর কেই বা তাকে রুখতে পারে!"

"ভারতে ফিরে এসে আমি ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নানা জায়গায় নানা রকমের কাজ করেছি। এ সময় আজিমুল্লাহ্ খাঁ বিলাত যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তাব করলেন। আমি সম্মতি জানালাম। বিদ্রোহের প্রসঙ্গে আজিমুল্লাহ্ খাঁর নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন। পেশোয়ার মত্যুর পর নানা সাহেব আজিমুল্লাহ্ খাঁকে তাঁর এজেন্ট নিয়োগ করেছিলেন। আজিমুল্লাহ্ খাঁ ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে খুবই আশাবাদী ছিলেন যে, একবার বিলাতে যেতে পারলে নানা সাহেবের মামলাটা তিনি ফতে করে আসতে পাবেনই।"

"আজিমুল্লাহ্র সঙ্গে লন্ডন গেলাম। পানির মত অজস্র টাকা খরচ করা হোল। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে আমরা গিয়েছিলাম, তাতে আমরা সম্পূর্ন ব্যর্থ হলাম। নানা সাহেবের আপীল টিকল না, লর্ড ডালহাউসীর রায়ই বহাল রয়ে গেল। বিলাত যাত্রা

থেকে শুরু করে কনস্ট্যান্টিনোপল্ হয়ে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ব্যয় হয়েছিল।

"কনস্ট্যান্টিনোপল্ থেকে আমরা রুশ দেশের ক্রাইমিয়ায় গেলাম। সেখানে তখন ইংরাজদের সঙ্গে রাশিয়ানদের তুমুল লড়াই চলছে। ১৮ই জুন তারিখে ইংরাজরা এ যুদ্ধে পরাস্ত হয়। যুদ্ধের দৃশ্য আমরা সেখানে বসেই দেখতে পেয়েছিলাম! সিবাস্তোপলে দু'পক্ষের সৈন্যদের চূড়ান্ত দুরবস্থা দেখে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমরা কনস্ট্যান্টিনোপল্-এ ফিরে এলাম। এখানে কয়েকজন রুশ এজেন্টের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা আমাদের খুবই ভরসা দিলেন যে আজিমুল্লাহ্ যদি হিন্দু স্থানে কোম্পানীর রাজত্ব ধ্বংস করবার জন্য বিদ্রোহের সৃষ্টি করে তুলতে পারে, তা'হলে তাঁরা প্রচুর সামরিক সাহায্য দেবেন।"

"এর পরেই আজিমুল্লাহ্ খাঁ ও আমি কোম্পানীর রাজত্বকে খতম করবার জন্য সারা হিন্দুস্থানব্যাপী বিদ্রোহ সৃষ্টি করে তোলবার জন্য দৃঢ়-সংকল্প গ্রহণ করলাম। শুক্র্ খোদা, আমরা সে কাজে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছি। আপনার কাছ থেকে যে-খবরের কাগজগুলো আমি নিয়েছি তার মধ্যে দেখতে পেলাম, কোম্পানীর রাজত্ব তুলে নেওয়া হচ্ছে। এতদিন ধরে কোম্পানী যে-দস্যুবৃত্তি চালিয়ে আসছিল, তা আর চলতে দেওয়া হবে না। ইংরাজের হাত থেকে আমরা আমাদের দেশকে মুক্ত করতে পারি নি, একথা সত্য, তবে হ্যাঁ, কিছুটা ভাল কাজ আমরা করতে পেরেছি। আমি আশা রাখি, আমাদের এ জীবনদান একবারে ব্যর্থ হবে না। আমি বিশ্বাস করি, কোম্পানীর রাজত্বের চেয়ে পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ শাসনব্যবস্থা নিশ্চয়ই অনেকটা ভাল হবে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের নির্যাতিত ও পদানত দেশবাসীর সম্মুখে এখনও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। অবশ্য সে সুন্দর দিনটিকে দেখবার জন্য আমি আর বেঁচে থাকব না।"

মিচেল জিজ্ঞাসা করলেন, "কানপুরে যখন বিদ্রোহ শুরু হয়, আপনি কি তখন সেখানে ছিলেন?"

"না, শুক্র খোদা, আমি তখন রোহিলাখণ্ডে আমার বাড়ীতে গিয়ে ছিলাম। বিশ্বাস করুন, যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করে যাদের হত্যা করতে হয়েছে, তাদের ছাড়া আর

কারো রক্তে আমার এ হাত রঞ্জিত হয় নি। যখন বুঝলাম ঝড় ওঠবার সময় এসেছে, আমি তখন আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিরাপদ জায়গায় রেখে আসতে গিয়েছিলাম। গ্রামে বসেই আমি মীরাট ও বেরিলীর সংবাদ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমি বেরিলী ব্রিগেডে যোগ দেবার জন্য চলে গেলাম। সেখান থেকে বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে দিল্লী যাই।"

দিল্লীতে আমাকে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পদ দেওয়া হয়। রুরকী ও মীরাটে কোম্পানীর যে- সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল তাদের সাহায্যে আমি দিল্লীর রক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুললাম। সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজেরা দিল্লী পুনরাধিকার

করে! সে পর্যন্ত আমি দিল্লীতেই ছিলাম। দিল্লী ছেড়ে আমরা প্রথমত মথুরার দিকে যাত্রা করলাম। যমুনার তীরে গিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। সেখানে পারাপার করবার জন্য আমি একটি নৌকার পুল তৈরি করলাম। তখনও আমাদের সঙ্গে ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। শাহজাদা ফিরোজ শাহ ও জেনারেল বখ্‌ত খাঁ তাদের পরিচালিত করছিলেন।"

"লক্ষ্ণৌতে আসবার পর আমি সেখানকার চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হই। নভেম্বর মাসে আপনাদের রেজিমেন্ট যখন লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সীতে অবরুদ্ধ ইংরাজ সৈন্যদের সাহায্য করতে গেল, সে পর্যন্ত আমি লক্ষ্ণৌতেই ছিলাম। সেকেন্দ্রাবাগের সে ভীষণ হত্যাকাণ্ড আমি নিজের চোখে দেখেছি। তার আগেকার রাত্রিতেই আমি সেখানকার রক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলাম। আপনারা যখন আক্রমন করলেন আমি তখন শাহ নযীফের উপর দাঁড়িয়ে সব কিছুই দেখছিলাম। যখন দেখলাম, পতাকাদন্ড থেকে আমাদের সবুজ পতাকা জোর করে টেনে নামানো হচ্ছে, আমার মনে হোল আমি যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে এল। বুঝলাম, আর আশা নেই, সবই শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন আমি শাহ নযীফ থেকে সেকেন্দ্রাবাগের উপর তোপ দাগাবার জন্য আদেশ দিলাম।"

"আচ্ছা, কানপুরে ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদের হত্যা করবার আগে তদের উপর ধর্ষন করা হয়েছিল, একথা কি সত্য ?" মিচেল প্রশ্ন কললেন।

জ্যামি উত্তর দিল ঃ সাহেব, আপনারা এদেশে নতুন এসেছেন, এদেশের হালচাল কিছুই প্রায় জানেন না,তাই এ প্রশ্ন করেছেন। এদেশের লোকদের আচার বিচার জাতের কড়াকড়ি সম্পর্কে যারা কিছু জানে, তারাই বুঝতে পারবে যে, এটা মনগড়া গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। এদেশের লোকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব জাগিয়ে তোলবার জন্যই এ কাহিনীর সৃষ্টি করা হয়েছে। কানপুরে স্ত্রীলোকও শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল, একথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু কোন মেয়ের উপর ধর্ষণ করা হয় নি। এ রটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি জানি কানপুরের একটি বাড়ীর দেয়ালের গায়ে লেখা ছিল, আমরা এখন বর্বরদের দয়ার উপর নির্ভর করে আছি। তারা বৃদ্ধা যুবতী নির্বিশেষে সকলের উপর বলাৎকার করছে। এ লেখাটি প্রথমত ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জেনারেল আউটরাম ও হ্যাভেলক-কর্তৃক কানপুর পুনরাধিকারের পর হিন্দুস্থানের লোকদের বিরুদ্ধে জঘন্য

অপপ্রচার চালাবার উদ্দেশ্যেই এই দুরভিসন্ধিমূলক জাল রচনা তৈরি করা হয়। আমি অবশ্য সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে আলাপ করে আমি এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, আমি যে-কথা বলছি, সেটাই সত্য।"

"নানা সাহেব এরকম নৃশংস ও কাপুরুষোচিত হত্যাকান্ডের হুকুম দিয়েছিলেন কেন, এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?"

৯৮

"আমার নিজের ধারণা নানা সাহেবের আগে থেকেই এ ধরনের হীন কাজ করবার পরিকল্পনা ছিল না। ব্যাক্তিগতভাবে তিনি এ অসহায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের হত্যা করতে চান নি। বিবিঘরের এ শোচনীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর দুর্বলচিত্ততাই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর অন্তঃপুরর একটি শয়তান প্রকৃতির মেয়েমানুষ এ ব্যাপারের জন্য প্রথমত দায়ী! তা ছাড়া সে সময়ে নানা সাহেবকে ঘেরাও করে এমন কয়েকজন লোক ছিলেন যাঁরা যে-কোন ভাবেই হোক এ ধরনের গুরুতর কাজের মধ্যে তাঁকে এমন ভাবে সংশ্লিষ্ট করে রাখতে চাইছেন, যাতে দুর্বলচিত্ত নানা সাহেব কোন মতেই বিদ্রোহের পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ভাল মানুষ সাজবার সুযোগ না পান। কাজেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সেই শয়তানীকে সাহায্য কর-বার মত শক্তিশালী হস্ত এর পেছনে ছিল, যার ফলে তার পক্ষে এ হত্যাকান্ডের অনুমতি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। ৬ নং নেটিভ ইন্‌ফ্যান্‌ট্রির সিপাইরা, এমন কি নানা সাহেবের নিজস্ব প্রহরীরাও এ জঘন্য কাজ করতে অস্বীকার করল। তখন এ শয়তান মেয়েলোকটা কতগুলো বিবেকহীন ভাড়াটে ঘাতক সংগ্রহ করে এ কাজ সম্পন্ন করে।"

"আমি তাঁতীয়া টোপীর নিজের মুখ থেকে এ কথা শুনেছি। এ ব্যাপার নিয়ে নানা সাহেবের সঙ্গে তাঁতীয়া টোপীর মনোমালিন্য ঘটেছিল আমি আপনাকে যা বলছি, তার মধ্যে এতটুকু অসত্য নেই। কানপুরের ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ও শিশুদের এ জঘন্য হত্যাকান্ডের পেছনে ছিল এই রাক্ষসীর হিংস্র প্রবৃত্তি। সার্জেন্ট সাহেব, একটা কথা জানবেন স্ত্রীলোক যখন শয়তান হয়, তার চেয়ে বড় শয়তান আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু সেই দুর্ভাগিনীদের বিরুদ্ধে তার এ ভয়ানক শত্রুতার কারণ কি, সে কথা জানবার সুযোগ আমার হয় নি।"

"এ কাহিনীর শেষ অংশটুকু বর্ণনা করতে গিয়ে সার্জেন্ট মিচেল বলেছেনঃ আমি আর আমার বন্দী সারারাত্রি ধরে মুখোমুখি বসে এ ভাবে কথা বলে চললাম। কথা বলতে বলতে রাত্রি ভোর হয়ে এলো। হঠাৎ চমকে উঠলাম, ভোরের পাখীগুলো একসঙ্গে কিচির-মিচির করে উঠেছে। আর একটু সময়, তার পরেই সব শেষ!"

"সকালবেলা আমি তাকে ওজু করবার ও নামাজ পড়বার ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার বন্দী আমার মেহেরবানীর জন্য আমাকে আবার ধন্যবাদ জানালেন। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন, তার এ মজলুম বান্দার উপর যে-লোক এমন দয়া দেখিয়েছে, তাঁর রহমত যেন তার উপর এমনি ভাবেই বর্ষিত হয়।"

"একবার, শুধু একবার মাত্র তাঁর মধ্যে একটু দুর্বলতার চিহ্ন দেখেছিলাম। রোহিলাখণ্ডের কোন দূর এক প্রান্তে অবস্থিত তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছেলের কথা বলতে গিয়ে ধরা গলায় তিনি একবার বললেন যে, তাদের অভাগা বাপের ভাগ্যে কি ঘটেছে,এ কথাটুকু তারা কোনদিন-কোনদিন জানতে পারবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই

তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন ঃ ইংল্যান্ডের ইতিহাসের মত ফরাসী দেশের ইতিহাসও আমি পড়েছি। আজিকার এই মুহূর্তে আমি বিপ্লবী বীর ডান্টনকে স্মরণ করব। আমি কোন দুর্বলতা দেখাব না।"

গল্প শেষ হয়ে এল। মিচেল তাঁর শেষ কথা বলেছেন ঃ 'সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ পেলাম সূর্যোদয়ের পরেই আমাদের ডিভিশনকে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করতে হবে। আমাদের দল থাকবে সবার পেছনে। আমাদের সামনে থাকবে সীজ ট্রেন' আর "এ্যামিউনিশন পার্ক'। আমরা পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করে চলব।

তাঁবু ছেড়ে আমরা যখন যাত্রা করলাম তখন সূর্য আকাশের কিছুটা উপরে উঠেছে। কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌর দিকে যে-রাস্তাটা গিয়েছে তারই ধারে একটা গাছের তলা দিয়ে চলেছি। কেন যেন একবার উপরের দিকে তাকালাম-শিউরে উঠলাম। দেখলাম, আমার ভূতপূর্ব বন্দী আর তার সঙ্গী গাছের শাখায় ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে। দুটি আড়ষ্ট কঠিন মৃতদেহ! আমি চলছি, দু' চোখে অশ্রু বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছে, সামলাতে পারছি না।"

নাম-না-জানা বিদেশী বন্ধু

আমরা তোমার নাম জানি না। কোন দিন জানব না। তুমি বৃটিশ জাতির কলঙ্ক। সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যান্ডের চোখে তুমি দেশদ্রোহী। ঘৃণার পাত্র। কিন্তু আমরা তোমার কথা ভুলব কি করে! পরাধীন ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধে তুমি জীবন পণ করে সংগ্রাম করেছিলে। সেদিন তোমাকে অস্ত্র ধরতে হয়েছিল তোমার দেশের ভাইদের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহী সিপাইরা সেদিন তোমাকে তাদের আপন জন বলেই জেনেছিল। আজ তারই এক শো বছর পরে বন্ধু বলে আমরা তোমায় স্মরণ করছি।

সার্জেন্ট মিচেল সিপাই দুর্গা সিং-এর কাছ থেকে এ কাহিনীটিকে উদ্ধার করেছিলেন। সার্জেন্ট মিচেল, তোমাকে ধন্যবাদ! তোমার জন্যই আমরা আমাদের এ নাম-না-জানা বিদেশী বন্ধুকে ফিরে পেয়েছি।

বেরিলীতে একজন ইংরাজ অফিসার বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়ে-ছিলেন এবং তিনি শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে ছিলেন। সিপাই দুর্গা সি নাইনটি-থার্ড হাইল্যান্ডার্স-এর সার্জেন্ট মিচেলের অনুরোধে এ কাহিনীটি তাঁকে বলেছিলেন।

সিপাই দুর্গা সিং বলেছেন ঃ

আমি তাঁর নাম জানতাম। কিন্তু অনেক দিন হয়ে গিয়েছে এখন আর নামটা মনে করতে পারছি না। বেরিলীর সৈন্য-দলে তিনি ছিলেন সার্জেন্ট মেজর। বেরিলীতে বিদ্রোহ দেখা দিল। দেখতে দেখতে সমস্ত রোহিলাখন্ড মুক্ত হয়ে গেল। জয়োন্মত্ত বেরিলী বিগ্রেড দিল্লীর দিকে ছুটল। সাহেবও সেদিন এই বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গেই ছিলেন। তাঁদের ভাগ্যের সঙ্গেই নিজের ভাগ্যকে যুক্ত করে নিয়েছিলেন।

দিল্লীতে আসবার পর বাদশাহ্ তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পদোন্নতি করে দেন। সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল বখ্‌ত্ খাঁ। পদ হিসেব তাঁর পরেই ছিল সাহেবের স্থান। দিল্লী শহর অবরোধের সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনিই গোলন্দাজ বাহিনীকে পরিচালিত করে এসেছেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে এ বিষয়ে তাঁর মত অভিজ্ঞ আর কেউ ছিল না। সেনানায়ক হিসেবে তিনি যে সাহসিকতার ও তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন, তা খুবই উল্লেখযোগ্য।

বিদ্রোহী সিপাইদের হৃদয় তিনি জয় করে নিয়েছিলেন। তারা তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত, তাদের এই শ্রদ্ধা শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। দিল্লী শহর অবরোধের সময় প্রতিটি দিন তিনি প্রত্যেকটি ব্যাটারিকে ব্যক্তিগতভাবে তদারক করতেন। কামানগুলো বসানো সম্পর্কে যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি বেরিয়ে পড়ত, তবে তিনি নিজ হাতে তা সংশোধন করে দিতেন। তাঁর কাজে কোন ত্রুটি ছিল না।

১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজরা যখন দিল্লী আক্রমণ করল, আমার মনে আছে, শয়তানের মতই দুর্ধর্ষভাবে তিনি লড়াই করেছিলেন। ঘাঁটি থেকে ঘাঁটিতে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়িয়েছেন, সিপাইয়া যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যাচ্ছে, তিনি তখন তাদের ডেকে উৎসাহ দিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন, তাদের সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে তুলেছেন, যেখানে যেখানে হামলা হচ্ছে সেই সব জায়গা নতুন সৈন্য যুগিয়ে তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। একটা মানুষ কিন্তু যেন শতহস্তে কাজ করে চলেছেন। যে দেখেছে, অবাক হয়ে গেছে।

দিল্লী আক্রমণের পর তাঁর সঙ্গে আমার কয়েকদিন দেখা হয় নি। ইংরাজরা দিল্লী শহর পুনরায় দখল করে নিল। আমরা পরাজিত হয়ে দিল্লী ছেড়ে মথুরায় এসে দাঁড়ালাম। এখানে আবার সাহেবের সঙ্গে দেখা হোল। দেখলাম যমুনা নদী পারাপার করবার ব্যবস্থা তদারক করতে ব্যস্ত আছেন। এখানে বখ্‌ত খাঁ ও ফিরোজ শাহের পরিচালনায় ত্রিশ হাজার সিপাই জমায়েত হয়েছিল।

সিপাইরা তাদের সেনাপতিদের চেয়ে সাহেবকেই সম্মান করত বেশী এবং যে-কোন নেতার চেয়ে তাঁর আদেশকেই তারা সবচেয়ে বেশী মান্য করে চলত। যমুনা পার হবার পর থেকে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি বিদ্রোহী ফৌজের সঙ্গেই ছিলেন, এ পর্যন্ত খবর আমি বলতে পারি।

দিল্লীর যুদ্ধে জখম হবার দরুন সকলের সঙ্গে হেঁটে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। কাজেই আমি দল থেকে খসে পড়তে বাধ্য হলাম এবং পায়ে হেঁটে লক্ষ্ণৌ চলে এলাম। লক্ষ্ণৌ শহর থেকে পরে আমি আমার নিজের গাঁয়ে চলে যাই। কিন্তু ইংরাজ সৈন্য ক্রমশই এগিয়ে আসছিল। তাদের হাতে ধরা পড়লে আমার অব্যাহতি পাবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। অবস্থা সংকটাপন্ন বুঝে আমি আর কয়েকজন সিপাই লক্ষ্ণৌ শহরে ফিরে এসে আমাদের পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিলাম।

অনেকদিন সাহেবের দেখা পাই নি। লক্ষ্ণৌ পতনের পর রুইয়ার দুর্গে আবার তাঁদের সঙ্গে দেখা হোল। সেখানে সিপাইদের পরিচালনার ভার ছিল তাঁরই উপরে। রুইয়ার রাজা নৃপৎ সিং-এর তিনি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। ইংরাজরা জেনারেল ওয়ালপোলের মারফত রাজা নৃপৎ সিং-এর কাছে সন্ধির শর্ত পাঠালেন। সাহেবের চেষ্টার ফলে নৃপৎ সিং এই শর্তাধীন সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

তাঁর শেষ দেখা পাই অযোধ্যায় নবাবগঞ্জের যুদ্ধে। এই যুদ্ধে বখ্‌ত খাঁ নিহত হন এবং বহুসংখ্যক সিপাই তাড়া খেয়ে রাপ্তি নদী পেরিয়ে গিয়ে নেপাল রাজ্যের এলাকায় ঢুকে পড়ে। এখানে এসে সিপাইরা তাদের কাউন্সিলের সভা ডাকে। এই সভায় তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তারা আর তাদের নেতাদের কথা অনুসরণ করে চলবে না। তখন মহারানীর ঘোষণা বেরিয়ে গেছে। তারা স্থির করল

যে, তারা এই ঘোষণার শর্ত অনুসারে ইংরাজদের হাতে আত্মসমর্পণ করবে।

সাহেব আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তাদের আত্মসমর্পণ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য। তিনি তাদের বললেন, "ওদের কথার উপর ভরসা করে যদি তোমরা আত্মসমর্পণ কর তাহলে ওরা শেষ পর্যন্ত তোমাদের কুকুরের মত ফাঁসিতে ঝোলাবে, নয় তো কালাপানিতে চালান করবে।"

কিন্তু দিনের পর দিন দুঃখকষ্ট সহ্য করতে করতে সিপাইরা এমন অস্থির ও অধৈর্য হয়ে উঠেছিল যে, সাহেবের কথায় এবার আর কোনই কাজ হোল না। এরই মধ্যে এই দলেরই এক সিপাই সংবাদ নিয়ে এল যে, যে-সকল সিপাইরা তাদের অফিসারকে হত্যা করে নি তাদের সবাইকে ক্ষমা করা হচ্ছে। সবাইকে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যাবার জন্য অনুমতিপত্র ও পথ খরচ বাবদ দু'টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।

এর পর তাদের আর সামলে রাখা সম্ভবপর হোল না। সিপাইরা সাহেবকে বলল, তারা আর সাহেবের কথামত চলবে না, সবচেয়ে কাছে যেখানেই ইংরাজের ঘাঁটি মিলবে সেখানেই আত্মসমর্পণ করে যে যার গ্রামের দিকে যাত্রা করবে।

একে একে সবাই চলে গেল। শুধু তারাই পড়ে রইল, যাদের অপরাধ এতই গুরুতর যে, তাদের ক্ষমা পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই। আর বাকী রইলেন সাহেব।

একে একে সবাই যে যার পথে চলে গেল। সাহেব একলা বসে রইলেন। আজ আর কেউ তাঁর কথা শুনবে না। আজ আর কেউ তাঁর দিকে বন্ধু বলে, ভাই বলে হাত বাড়াবে না। সবাই তাঁকে ফেলে চলে গেল। কেউ তাঁর দিকে ফিরে চাইবে না। আত্মীয় নেই, স্বজন, নেই, বন্ধু নেই, যতদিন মৃত্যু তাঁকে মুক্তি না দেয়, ততদিন মৃত্যুর পরোয়ানা মাথায় নিয়ে বুনো পশুর মত বনে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হবে।

সাহেবের চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে পথহারা বালকের মত আপনার কাছে আপনি প্রশ্ন করছিলেন, এরা সবাই যে যার

ঘরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কোন ঘর নেই, আমার তো কোন দেশ নেই। আমি কোথায় যাব, বল, আমি তবে কোথায় যাব!"

এর পরে দূর্গা সিং আর কোনদিন সাহেবের দেখা পায় নি।

ঝাঁসীর রানী

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ।

ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈর দরবার বসেছে। সমস্ত দরবার প্রতীক্ষায় থম থম করছে। আজই ডালহাউসীর ঘোষণা প্রকাশিত হবে। আজকেই জানা যাবে রানীর দত্তকপুত্র দামোদরের অধিকার ন্যায্য বলে স্বীকৃত হবে, না কোম্পানী নাগপুর, সাতারা ইত্যাদি রাজ্যের মত ঝাঁসীকেও আত্মসাৎ করে নেবেন।

কোম্পানীর প্রতিনিধি মেজর এলিস দরবার গৃহে এসে ঢুকলেন। তাঁর হাতে সরকারী ঘোষণা।

পর্দার আড়ালে রানী লক্ষ্মীবাই আর বাইরের দরবারের লোকেরা উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন।

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে মেজর এলিস ঘোষণা পাঠ করে গেলেন দত্তকপুত্রের অধিকারের দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বুন্দেলখন্ডের অন্যান্য রাজ্যগুলোর মতই ঝাঁসীও এখন থেকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নরের শাননাধীনে চলে যাবে।

ঘোষণা শুনে সমস্ত দরবার স্তব্ধ হয়ে রইল।

শুধু পর্দার পেছন থেকে তেজোদৃপ্ত সংযত দৃঢ়কণ্ঠে একটি কথা শোনা গেল, মেরী ঝাঁসী দুংগী নেহী।

ডালহাউসারী আমলে কত রাজাই তো এ রকম রাজ্য হারিয়েছেন, কিন্তু এমন কথা এমন করে কে বলেছেন! মেজর এলিস চমকে উঠলেন। রানী লক্ষ্মীবাঈর এই বিখ্যাত উক্তি না জানে কে! আজও ঘরে ঘরে এই কথাটি সুপরিচিত। আজও ঝাঁসীর বুড়োবুড়ীরা পুরানো দিনের সেই ছড়া আওড়ায়,

বঢ়ি, বড়িয়া থে য়ো রানী
যিননে ঝাঁসী ন ছোড়েঙ্গী বোলী।
যিননে সিপাইয়োঁকে লিয়ে লড়াই কিয়ে
ঔর আপনি খায়ে গোলী॥

রানীকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝাঁসীকে ছাড়তেই হোল। ডালহাউসীর ঘোষণা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পেলেন না। কিন্তু যদি তিনি নতমস্তকে এই অবিচার মেনে নিয়ে চলতেন তাহলে কেই বা মনে রাখত তাঁকে আর কেই বা মনে রাখত তাঁর সেই চিরস্মরণীয় 'মেরী ঝাঁসী দুংগী নেহী?'

সেই থেকে তিনটি বছর ঘুরে এসেছে।

মাত্র তিনটি বছর, কিন্তু এরই মধ্যে জমানা বদলে গেছে, হাওয়া গেছে উলটে। অবাধ্য ঘোড়া আরোহীকে চিৎপাত করে তার আসন থেকে ছিটকে ফেলে দিয়ে ঝড়ের মত বেগে ছুটে চলেছে। তার ছেঁড়া লাগাম টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে পথের পাশে। আরোহী উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়ছে। ফন্দি আটছে মনে মনে আবার কি করে ওকে পাকড়াও করবে।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ ভারতে ইতিহাসে এক রক্তে রাঙা অধ্যায়। বিদ্রোহের ঘূর্ণিবায়ুর

টানে, ঘটনাস্রোতের দুরন্ত প্রবাহে রাজা, নবাব, জমিদার, তালুকদার, সিপাই, ব্যবসায়ী, কারিগর, চাষী—হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক এসে জমায়েত হয়েছে একই মোরচায়।

ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ সেই মোরচার সমুখ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিন বছর আগেকার 'মেরী ঝাঁসী দুংগী নেহী' আওয়াজ আজ 'খুলক্ খোদাকা, মুলক্ বাদশাহ্‌কা হুকুম নানা সাহেব ফোজ বাহাদুরকা' আওয়াজের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্বার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠেছে। ছোট্ট ঝাঁসীর আত্মরক্ষার লড়াই আজ ভারতব্যাপী মহাবিদ্রোহের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লক্ষ্মীবাঈর ঝাঁসী বিদ্রোহীদের শক্তিশালী প্রতিরোধের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। ঝাঁসী তখন সমগ্র মধ্যভারতে বৃটিশবিরোধী অভ্যুত্থানের প্রধান সামরিক ঘাঁটি।

আয়ার্ল্যান্ড, সিরিয়া, ক্রাইমিয়া ও সিবাস্তপোলের যুদ্ধে অভিজ্ঞ বিচক্ষণ সেনাপতি হিউ রোজের ডাক পড়ল ঝাঁসী আক্রমণ করার জন্য। বিনা বাধায় ঝাঁসী পর্যন্ত পৌছানো গেল না; রাথগড় থেকে ঝাঁসী পর্যন্ত পথে পথে বহুবার তাকে আক্রান্ত হতে হয়েছে। পথে পথে অনেক খণ্ড যুদ্ধের মধ্যে তাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। এই সমস্ত খন্ড যুদ্ধগুলোকে ঝাঁসীর যুদ্ধেরই বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ বলে মনে করা যেতে পারে।

রাথগড়ের যুদ্ধ। পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বিদ্রোহীরা তিন দিন পর্যন্ত যুদ্ধ করে চলল। কিন্তু এ তো যুদ্ধ নয়, এ-যে শুধু আত্ম-বিসর্জন। যোদ্ধাদের মধ্যে সিপাই ছিল কমই। অধিকাংশই সাধারণ চাষী। কাজেই কামান, বন্দুক বনাম তলোয়ার বা বর্শার লড়াইয়ের ফল যা' হতে পারে। তাই হোল। তিনদিন পর্যন্ত তারা ইংরাজ সৈন্যদের উদ্ব্যস্ত করে রাখল। তার জন্য তাদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। যুদ্ধে তাদের পক্ষে দুশোর বেশী লোক মারা গিয়েছিল। আর একশো সাতাশ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করেন মহম্মদ ফজিল খাঁ। মহম্মদ ফজিল খাঁ ভূপালের বেগমের আত্মীয় ছিলেন। ইংরাজের পরম বন্ধু ভূপালের বেগম সে সময় ইংরাজদের বিপুল অভ্যর্থনা জানান। যুদ্ধে হিউ রোজকে তিনি সাত শো সৈন্য দিয়ে সাহয্য করেছিলেন। তাঁর এই সৈন্যরাই মহম্মদ ফজিল খাঁকে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। নেতৃস্থানীদের মধ্যে মহম্মদ ফজিল খাঁ, নবাব কামদার খাঁ, কিষেণরাম ও ওয়ালিদাদ খাঁকে ফাঁসী দেওয়া হয়।

বারোদিয়ার প্রতিরোধে ঝাঁসীর রানী ও বানপুরের রাজা যুক্তভাবে পরামর্শ করে যুদ্ধের ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। বানপুরের রাজা ঠাকুর মর্দন সিং বারোদিয়ার যুদ্ধে নিজেই নেতৃত্ব করেছিলেন। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পক্ষের অনন্ত সিং ও কাজি মোহাম্মদ খাঁ নিহত হলেন। ডান কাঁধে বন্দুকের গুলিতে জখম হয়ে ঠাকুর মর্দন সিং যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রায় পাঁচ শো জন লোক মারা গেল। এদের মধ্যে তিন শো জনই ছিল কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ। এরা পাথর, তীর, ধনুক ও বর্শা নিয়ে ইংরাজের গুলি রুখতে এগিয়ে গিয়েছিল।

এইভাবে রাথগড়ের পর বারোদিয়া, বারোদিয়র পর খুবই, বানপুর, শাহগড় একটি একটি করে বিদ্রোহীদের ঘাঁটি হিউ রোজের আক্রমণে ভেঙ্গে পড়তে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি, এ যেন খালি হাতের লড়াই, তবু তারা বিনাযুদ্ধে হিউ

রোজকে পথ ছেড়ে দেয়নি।

সমস্ত বুন্দেলখণ্ডের মানুষ আশা করে তাকিয়ে আছে ঝাঁসীর দিকে। বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র ঝাঁসী শেষ পর্যন্ত মৃত্যুপণ প্রতিরোধ দেবে এ বিষয়ে বুন্দেলীদের মনে কোন সংশয় নেই। কবি ভূপৎলাল তাঁর কবিতায় তাদের প্রাণের কথা বলেছেন :

"কহত ভূপৎলাল যব্ তক্ বুন্দেলা শূর রহে জীউ
তব্ তক্ আংরেজ ক্যায়সে লেবত ঝাঁসী, সবী দেখ লেও।
ঝাঁসী কিল্লা ঔর বাঈসাহেব যব্ তক্ রহে জীউ
তব্ তক্ আংরেজ ক্যায়সে লেবত ঝাঁসী হামে দেখ লেও।"

"ভূপৎলাল বলেছেন, যতদিন বুন্দেলা বীরেরা জীবিত থাকবে ততদিন দেখে নেব ইংরাজ কি করে ঝাঁসী নিয়ে নেয়! ঝাঁসীর কেল্লা আর বাঈ-সাহেব যতদিন থাকবেন দেখে নেব ইংরাজ কি করে ঝাঁসী নিয়ে নেয়!" ব্যক্তিগত সাহস ও শৌর্যই রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। তার চেয়েও বড় কথা তাঁর দূরদৃষ্টি, তাঁর সংগঠনী ক্ষমতা, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা। বিদ্রোহের অন্যান্য নেতাদের কারো মধ্যে এতগুলো গুণের একত্র সমাবেশ দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ।

উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ, হিন্দু ও মুসলমান তাঁর ডাকে সমানভাবে সাড়া দিয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান সিপাইরা তাঁকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে আফঘান সৈন্যদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য। শেষ দিন পর্যন্ত এই আফঘান সৈন্যরাই তাঁকে ঘিরে রয়েছে। পরাজয় ও চরম দুর্দশার দিনেও তাঁকে ছেড়ে যায়নি। বাঈ-সাহেবকে রক্ষা করবার জন্য তারা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে।

"তাঁর প্রজাসাধারণের উপর তিনি এক বিরাট প্রতিপত্তি অর্জন করে ছিলেন। এই প্রতিপত্তি এবং চরিত্রের এই দৃঢ়তার সঙ্গে প্রেরণাসঞ্চারী শৌর্যের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন হয়েছিল তাঁর মধ্যে। তারই ফলে হিউ রোজের সৈন্যদের তিনি এমন প্রতিরোধ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যা আপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী কোন সেনাপতির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হলে সার্থক হতে পারত।"

২৩-এ মার্চ থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ২৩-এ থেকে ২৯-এ এই কয় দিন ধরে যুদ্ধ চলল। দুই পক্ষের গোলন্দাজরা অজস্রধারায় অগ্নি ও মৃত্যু বর্ষণ করে চলল। ইংরাজের গোলায় নগরের যেখানে ঘনবসতি সেখানেই আগুন জ্বলে উঠতে লাগল। এদিকে ঝাঁসীর গোলন্দাজদের নেতা গোলাম ঘৌসের গোলায় শঙ্করমন্দির ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এইখানেই ইংরাজরা তাদের নতুন ব্যাটারী বসিয়েছিল।

২৯-এ মার্চ ঝাঁসীর দুর্দিন দেখা দিল। একই দিনে গোলন্দাজদের নেতা গোলাম ঘৌস ও তাঁর উপযুক্ত শিষ্য খুদাবক্স খাঁ যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিলেন। তাঁদের মৃত্যুতে রানীর চোখে অশ্রু দেখা দিল। সমস্ত ঝাঁসীবাসীর মুখে কালো ছায়া নেমে এল।

"কেল্লার ভেতরে বীরের সম্মানে গোলাম ঘৌস ও খোদাবক্সকে সমাহিত করা হোল। কেল্লার চতুরা মহলের দক্ষিণ কোণে আজও সেই সমাধি রয়েছে। ২৯-এ মার্চ তার জিয়ারৎ হয় আর চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়। ঝাঁসীর মানুষ আজও সেখানে এসে এই দুই বীর সৈনিককে শ্রদ্ধা জানায়।

[মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য রচিত 'ঝাঁসীর রানী']

যুদ্ধ চলল। আঘাতের পর আঘাতে ঝাঁসীর কেল্লা থরথর করে কেঁপে উঠতে লাগল। শেষ পরিণতির দিন এগিয়ে এসেছে। তবু তারা মৃত্যু পণ করে লড়াই করে যেতে লাগল। ইংরাজ ঐতিহাসিক এইচ, রোজ লিখেছেন : "বহুজন অপরাগ, বহুজন নিহত ও আহত, তবুও শত্রুরা যুদ্ধ করে চলেছে।"

শেষ পর্যন্ত আর ঠেকিয়ে রাখতে পারা গেল না; ২রা এপ্রিল শেষ রাত্রিতে ইংরাজ সৈন্যরা নগরের মধ্যে প্রবেশ করল। রাজপথের উপরে, প্রতিটি বাড়ীর মধ্যে সিপাই ও নাগরিকেরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। চল্লিশ জন আফঘান রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল। মরবার আগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা লড়াই করে গিয়েছিল। হিউ রোজ তাঁর মিলিটারী ডেসপ্যাচে লিখে গিয়েছেন :

"তাদের দেহ অর্ধদগ্ধ। কাপড়ে আগুন জ্বলছে। সেই অবস্থায় তারা ছুটে বেরিয়ে এল। দুই হাতে দুই তলোয়ার নিয়ে আক্রমণকারীদের উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। গুলি বা সঙ্গিনের আঘাতে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তারা লড়াই বন্ধ করে নি। মরতে মরতেও তারা লড়াই করেছে।"

চারদিকে শত্রুসৈন্য ঘেরাও করে আছে। তারই মধ্য দিয়ে রানী আর তাঁর সঙ্গী চার শো আফগান সৈন্য কি করে কেল্লা ছেড়ে পালালেন সে এক বিস্ময়কর কাহিনী।

রানী ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন, ঘোড়ার পিঠে বেঁধে দিয়েছেন তাঁর আদরের ধন বালক দামোদরকে।

রানী পলাতকা, এই সংবাদ যখন হিউ রোজের কাছে গিয়ে পৌছল, তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু রানী তখন বহু দূরে। এবার শুরু হোল দারুণ প্রতিহিংসার পালা। প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তার লো বলেছেন :

"মৃত্যু ফিরতে লাগল ঘর থেকে ঘরে উল্‌কাগতিতে। একটি মানুষকেও রেহাই দেওয়া হোল না। রাস্তাগুলোতে রক্তস্রোত বইতে শুরু করল।"

সমস্ত নগরে নির্বিচারে হত্যাকান্ড চলতে লাগল। হিউ রোজ নিজেই সে সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন :

"প্রাসাদ অধিকৃত হবার পর থেকে বিদ্রোহীরা শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল। নগর অবরোধের সাফল্য এই একটি কথাতেই বোঝা যায় যে, একজনকেও জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয় নি। নগরীর আশেপাশের বন, বাগান, রাস্তা বিদ্রোহীদের শবদেহে পরিপূর্ণ হল। বিদ্রোহী সৈন্যরা সাধারণত জাতিতে আফঘান ও পাঠান।"

"তখন যে তান্ডবলীলা শুরু হোল, তাতে আতংকগ্রস্ত হয়ে ধর্মহানির ভয়ে মেয়েরা শিশুদের কোলে নিয়ে প্রসাদের কুয়োতে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। প্রত্যক্ষদর্শী কেশব ভাস্করের চোখের সামনে কতজন যে এইভাবে প্রাণ হারালেন, তা বলা যায় না। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে, ইংরাজ সৈন্যরা বা তাদের দেশী সৈন্যরা মেয়েদের গায়ে হাত দেয় নি। কিন্তু কেশব ভাস্কর বলেছেন, "সৈন্যরা মেয়েদের হাত, কান, গলা, নাক থেকে গহনা ছিঁড়ে নিচ্ছিল এবং বেয়নেট উচিয়ে তাড়া করছিল।" ইংরাজরা মেয়েদের সম্মান রক্ষা করেছে বলে গর্ব করে থাকে। ঝাঁসী ও অন্যত্র তারা-যে মেয়ে ও শিশুদের যথেচ্ছ হত্যা করেছিল, তার প্রমাণ আছে বৃটিশ পার্লামেন্টের কাগজে। ইতিহাসে সে কথা কিন্তু তারা লেখে নি। বারো বছর

থেকে পঞ্চাশ বছর অবধি সমস্ত পুরুষ ও বালকদের প্রত্যহ হাজারে হাজারে ধরে এনে রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত অঙ্গনে দাঁড় করিয়ে মাথা কেটে ফেলা হোত।" "ঝাঁসীর আশেপাশের গ্রামবাসীরাও-যে রানীর প্রতিরোধ সংগ্রামে সাহায্য করেছিল, তা হ্যামিলটন ও ডিউ রোজ ভাল করেই জানতেন। নিত্যই তাদের বন্দী করা হোত। নিত্যই তাদের ধরে আনা হোত ঝাঁসীর কেল্লার বাইরের মাঠে। বিচারের পর ফাঁসি হোত তাদের। দিবারাত্র বন্দীরা আসছে, বিচার হচ্ছে এবং হুকুম আসছে)–লটকাও লটকাও।"

"ঝাঁসী শহরে রানীর সমস্ত সৈন্য এবং বহুলাংশে নাগরিকরাও নিহত হোল। সমস্ত নগরীর পথে কর্দমাক্ত রক্ত জমে রইল। শকুনি উড়তে লাগল সমৃদ্ধ নগরীর আকাশে। হিউ রোজের কঠিন নিষেধ ছিল ভারতীয়েরা কোনমতেই যেন তাদের শবদেহের সৎকার করতে না পারে। সাতই এপ্রিলের পর সমস্ত নগরী যখন

পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, গলিত শবদেহের লোভে শৃগাল ও শকুনি বিচরণ করতে লাগল, তখন হিউ রোজ আদেশ দিলেন, এবার শবদেহের সৎকার করা যেতে পারে।"

[মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য-রচিত 'ঝাঁসীর রানী']

পরিব্রাজক বিষ্ণুভট্ট গোডসে সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর লেখায় সে সময়কার ঝাঁসীর প্রকৃত রূপটি ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন ঃ

"সমস্ত শহরকে প্রেতভূমি ও মহাশ্মশান বলে বোধ হল। জ্বলন্ত বাড়ীগুলো থেকে লেলিহান অগ্নিশিখা ঊর্ধ্বে উঠে রাত্রির আকাশকে ভয়াল করে তুলল। আগুন ও বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে আর্ত নরনারীর ক্রন্দনের রোল উঠল। প্রিয়জনের মৃতদেহের পার্শ্বে বসে রমণী কাঁদছেন আর তার সামনে বেয়নেট ঠুকে গোরা সিপাই অলংকার খুলে দিতে বলছে। দীন-দরিদ্র, ধনীর ঘরণী শ্রেষ্ঠীর শিশুপুত্র সবাই একসঙ্গে একমুষ্টি অন্ন চেয়ে কাতর কণ্ঠে কেঁদে ফিরছে। কোথাও বালকপুত্রের মৃতদেহ নিয়ে মা শোকে বিহ্বল। কোথাও পিতার দেহের পাশে বসে শিশুপুত্র ছোট ছোট হাতে পিতাকে আঘাত করে ডাকছে। হালোয়াইপুরার জ্বলন্ত অট্টালিকার কাঠের বরগাগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাতাসে উড়ছে ছাই আর গলিত শবদেহের তীব্র গন্ধ।"

ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মতে ঝাঁসী অধিকার করবার পর ঝাঁসীতে কম পক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয়েছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রমাণাদি থেকে মনে হয় সংখ্যাটা খুবই কম করে ধরা হয়েছে। রাণী লক্ষ্মীবাঈ সমস্ত রাত্রি ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। ঝাঁসী থেকে ভাণ্ডীর এক শো মাইল পথ। তাঁর সঙ্গে আছে বিশ্বস্ত চার শো আফঘান সৈন্য, যারা বাঈসাহেবার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে চলেছে, শেষ লোকটি পর্যন্ত। পেছনে পেছনে মেজর ফরবেশ ও ক্যাপ্টেন রবিনসনের নেতৃত্বে তিন দল ঘোড়সওয়ার কামান নিয়ে ছুটে আসছে। জীবিত কি মৃত যে-কোন অবস্থায় রানীকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।

সারা রাত্রি ঘোড়া ছুটিয়ে ভাণ্ডীরে এসে সবেমাত্র বসেছেন, অমনি খবর পাওয়া গেল শত্রু এসে পড়েছে, বিশ্রামের সময় নেই। আফঘান সৈন্যদের সর্দার এসে জানালেন, আপনারা কালপির দিকে চলে যান, আমরা এগিয়ে গিয়ে ইংরাজ সৈন্যকে

ঠেকিয়ে রাখি।

আফগান সৈন্যরা ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ইংরাজ সৈনাদের বাধা দিতে লাগল। এই খন্ড যুদ্ধগুলোতে চারশো আফঘান সৈন্যের মধ্যে আড়াই শো সৈন্য প্রাণ দেয়। আফঘান সৈন্যরা এভাবে আত্মদান না করলে সেদিন রানীর রক্ষা পাবার কোনই আশা ছিল না।

লেফটেন্যান্ট ডাওকার দু'শো সওয়ার নিয়ে রানীর পেছনে ছুটেছিলেন। ভান্ডীর ছাড়িয়ে কালপি রোডের উপর রানীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তখন রানীর সঙ্গে ছিলেন রঘুনাথ সিং. গুল মহম্মদ আর রানীর দুই সহচরী মান্দার ও কাশী। আর ছিলেন

দশজন আফঘান সৈন্য। এখানে ডাওকারের সঙ্গে রানীর মুখোমুখী লড়াই হয়। রানীর তলোয়ারের চোট খেয়ে ডাওকার ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। রানীও সেই সুযোগে নিজের পথ দেখলেন। এ সম্বন্ধে ডাওকার পরে বলেছিলেন যে, সেদিন তার কোমরে ঝোলানো রিভলবারের উপর তলোয়ারের চোটটা পড়েছিল বলেই তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন, তা না হলে তাকে সেদিন দুটুকরো হয়ে যেতে হোত।

এই বিপদসংকুল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রানী লক্ষ্মীবাঈ অবশেষে কালপিতে এসে পৌছলেন। ওদিকে হিউ রোজের সৈন্যবাহিনী কালপি লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। স্থির হোল কুঁচে গিয়ে তাদের বাধা দিতে হবে।

৬ই এপ্রিল কুঁচের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে রানী ছিলেন সৈন্যাধ্যক্ষ আর তাঁতীয়া টোপী তাঁর সহকারী। হিউ রোজের প্রবল আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভবপর হোল না। একদিন যুদ্ধের পর রানী পশ্চাদপসরণ করে কালপিতে ফিরে এলেন।

এরপর কালপিতে প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে তোলা হোল। বুন্দেলখন্ডের বিদ্রোহী নেতারা নিজ নিজ শক্তি নিয়ে এখানে এসে জমায়েত হলেন। রাও সাহেব এবার সৈন্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন। বান্দার নবাব দক্ষিণে রইলেন, পশ্চিমে রইলেন বানপুরের রাজা ঠাকুর মর্দন সিং ও শাহগড়ের রাজা বখতব আলী। অযোধ্যা ও রোহিলাখন্ডের বিদ্রোহী সিপাইরা শহরও কেল্লা রক্ষার কাজে নিয়োজিত রইল। আর কালপির উত্তর প্রান্ত রক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়ে রইলেন রানী।

এই প্রবল নির্মম শত্রুকে প্রতিরোধ করবার জন্য কালপিতে সেদিন কি রকম প্রস্তুতি ছিল, তার অনেক কিছুই আমরা জানি না। কিন্তু কবির গানের মধ্যে একটি কথা আজও রয়েছে, যার উল্লেখ না করে পারা যায় না। ঝাঁসীর পতনের পর ইংরাজরা ঝাঁসীর অধিবাসীদের উপর যে-হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছিল, রানী তার কিছুটা স্বচক্ষে দেখেছেন, কিছুটা বা শুনেছেন। কালপিতে এসে তিনি সে কথা ভুলতে পারেন নি। করিব গানে তাই দেখতে পাই,

"পেড় গিরবাও কহত রানী ঝাঁসী।
না তেলেঙ্গা দেব হানৈ সিপাহীকে ফাঁসী।
বেহিস্মতসে ন কহ্ পাওয়ে লটকাও।
ন ধূপ অধূপ মেলি মিলবত ছাঁব॥"

ঝাঁসীর রানী বললেন–'গাছ কেটে ফেল. যাতে তেলেঙ্গা আমার সিপাইদের ফাঁসি দিতে না পারে। বে-হিম্মত (ইংরাজ যেন লটকাও লটকাও' না বলতে পারে। প্রখর রোদে যেন তাদের ছায়া না মেলে।"

তিনদিন যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা পরাস্ত হোল। 'কালপির শহর ও কেল্লা ইংরাজ সৈন্যরা দখল করে নিল।

রানী লক্ষ্মীবাঈকে আমরা শেষবারের মত দেখতে পাই গোয়ালিয়রের যুদ্ধে। সমগ্র কোটাই-কি-সরাই রক্ষার দায়িত্ব রাণীর উপর পড়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিটিকে রক্ষা করবার জন্য তাঁকে দশ হাজার সৈন্যের পরিচালনার ভার নিতে হয়েছিল। ১৭ই জুন তারিখে গোয়ালিয়রের যুদ্ধ হয়। সমস্ত দিন ধরে প্রবল যুদ্ধ চলল। এই যুদ্ধে দুই পক্ষের যোদ্ধারাই যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটিশের উচ্চতর সামরিক সংগঠনই সাফল্য লাভ করল।

যুদ্ধ করতে করতে রানী, মান্দার, রঘুনাথ সিং ও আরও কয়েকজন সৈন্য একটু দূরে সরে এসে পড়েছিলেন। ঠিক সেই সময় একদল ইংরাজ সৈন্য তাঁদের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁরা মূল বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। আর রক্ষা নেই!

ছোটাও, ঘোড়া ছোটাও, যত জোরে পার, যত দূরে পার! মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা, গায়ে-গায়ে-ঘেঁষা তীব্র কঠিন প্রতিযোগিতা। পেছন থেকে যারা ধাওয়া করে আসছে, তাদের এড়িয়ে যেতে হবে। রানীর ঘোড়া বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটছে, তার খুরে খুরে আগুনের কণা ঠিকরে উঠছে। হঠাৎ একটা আর্তনাদ শোনা গেল। রানী পেছনে ফিরে চেয়ে দেখলেন, তাঁর চিরদিনের সহচরী মান্দার গুলিতে আহত হয়ে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। তার অন্তিম উক্তি শোনা গেল—বাঈ সাহেব, চললাম।

দাঁড়াবার সময় নেই, ছোটাও, ঘোড়া ছোটাও, যত জোরে পার, যত দূরে পার! একটা গুলি রানীর গায়ে এসে বিধঁল, পেছন থেকে একটা তলোয়ারের চোট এসে পড়ল তাঁর কাঁধের উপর। দাঁড়ারবার সময় নেই, ছোটাও, ঘোড়া ছোটাও। রানী ঘোড়ার পিঠের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। রক্তের ধারা তাঁর গা বেয়ে, ঘোড়ার গা বেয়ে পথের মাটি লাল করে তুলল। শত্রুরা শেষ পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পায় নি। রানীর সহচরেরা খোঁজ করতে করতে ঐ অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেল! সবাই তাঁকে ধরাধরি করে ঘোড়া থেকে নামাল! রানী একবার চোখ মেলে তাকালেন, স্থির শান্ত-ভাবে যা তাঁর বক্তব্য ছিল বলে দিলেন, তারপর আবার চোখ বুজলেন, চির-দিনের জন্য চোখ বুজলেন।

পরাধীন ভারতের বুকে এই আগুনের ফুলটিকে ফুটিয়ে তুলল কে ? বিদ্রোহ। একমাত্র বিদ্রোহের পক্ষেই সম্ভব।

উজীর আলী নকী খাঁ

অযোধ্যার রাজ্যহারা নবাব ওয়াজিদ আলী খাঁ কলকাতার মুচিখোলায় তাঁর নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। ওদিকে বেগম হযরত মহল বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব নিয়ে আযোধ্যায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এখানে স্বদেশ থেকে বহুদূরে, স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওয়াজিদ আলী খাঁর জীবনসায়াহ্নের শেষ দিনগুলো অতীতের ঐশ্বর্য ও সুখ-স্মৃতির রোমন্থনের মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছে।

নবাবের উজীর আলী নকী খাঁ অদ্ভুত করিৎকর্মা ধুরন্ধর লোক! বাইরে থেকে দেখলে কেউ তাঁর ভিতরের রহস্য বুঝতে পারে না। উজীর সাহেব দিলখোলা খোস মেজাজের লোক। খান, দান, ফুর্তি করেন, মজা লোটেন,ইয়ার বন্ধুরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ!

কিন্তু ক'জন জানে তাঁর গোপন কথা। সরকারের সর্তক চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিনি ভেতের ভেতের ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছেন। এই ফিরিঙ্গীদের শেষ না করা পর্যন্ত তাঁর চোখে ঘুম নেই, তাঁর প্রাণে শান্তি নেই। ইঁদুরের মত নিঃশব্দে তিনি গর্ত খুঁড়ে চলেছেন। এই গর্তে বৃটিশ শাহীকে কবর দিতে হবে।

আলী নকী খাঁর গুপ্ত প্রচারকের দল ফকীর, সন্ন্যাসী, পুরোহিত, ভিক্ষুক, ফিরিওয়ালার ছদ্মবেশ ধরে সিপাইদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে রাজ-বিদ্রোহের প্রচার করে বেড়াচ্ছে, সবাইকে প্রস্তুত করে তুলছে সেই নির্দিষ্ট দিনটির জন্য, যখন সারা দেশের সিপাইরা একই সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, ফিরিঙ্গীদের শাসনের বুনিয়াদকে ভেঙ্গে বরবাদ করে দেবে।

সিপাইদের মধ্যে যে-সমস্ত দেশী অফিসার ছিলেন, আলী নকী খাঁ তাঁদের সঙ্গে গোপনে চিঠিপত্র চলাচল করাতে লাগলেন। তিনি তাঁদের আহ্বান জানালেন এই বিদ্রোহে শরীক হবার জন্য–

"কোম্পানীর রাজত্বের কি লাভ হয়েছে আপনাদের ? সুযোগ-সুবিধা, মানসম্মান, সমস্তই তো, ওই ফিরিঙ্গী অফিসারদের একচেটিয়া। ওদের সবাইকে দিয়ে থুয়ে ক্ষুদ কুড়া যেটুকু বাকী থাকে, আপনাদের বরাতে শুধু সেইটুকুই মিলতে পারে। আর ওরা কি আপনাদের মানুষ বলে মনে করে! আমাদের দেশে যেদিন আমাদের হাতে ফিরে আসবে সেইদিনেই আপনারা আপনাদের উপযুক্ত মর্যাদা পেতে পারবেন, তার আগে নয়।"

এই আহ্বানে দেশী অফিসারেরা চঞ্চল হয়ে উঠল।

বাংলাদেশের সিপাইরা অনেকে অযোধ্যা প্রদেশের লোক। নবাবের হাত থেকে অযোধ্যা কেড়ে নেবার ফলে কি মুসলমান কি হিন্দু সকলের মনেই দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। ডালহাউসী যেদিন অযোধ্যা গ্রাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেদিন তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, ভবিষ্যতে তাঁর এই নীতি একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল্যে কি প্রচন্ড আঘাতই না দেবে।

আলী নকী খাঁ মানুষের মনের কথা বুঝতে পেরে ঠিক সেই জায়গাটিতেই আঘাত করলেন। ইংরাজ দস্যুরা কিভাবে অযোধ্যা দখল করে নিয়েছিল, তাঁর প্রচারকের দল সিপাইদের মধ্যে সেই কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করে চলল। ইংরাজদের হাতে নবাব পরিবারকে কি নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল,

কিভাবে বলপ্রয়োগ করে বেগমদের প্রাসাদ থেকে বের করে দেওয়া হয়, একটির পর একটি করুণ চিত্র যখন তাদের সামনে তুলে ধরা হতে লাগল, অনেক বীরহৃদয় সিপাইও তখন চোখের পানি না ফেলে পারে নি।

মুসলমান অফিসারেরা কোরআন ছুঁয়ে এবং হিন্দু অফিসারেরা গঙ্গার পানি ছুঁয়ে শপথ করল যে, এই হারমাদ কোম্পানীর রাজত্বকে খত্‌ম না করে তারা নিবৃত্ত হবে না। এইভাবে সুবাদার, মেজর সুবাদার, জমাদার ও অন্যান্য দেশী অফিসারেরা যখন পক্ষে চলে আসতে লাগল, তখন স্পষ্টই বোঝা গেল সিপাইরা বিদ্রোহের পক্ষেই থাকবে।

উজির আলী নকি খাঁ এইভাবে সুকৌশলে বাংলার সিপাইদের মন জয় করে নিচ্ছিলেন। তাঁর প্রচারকেরা কলকাতার কেল্লার মধ্যেও তাদের গোপন হস্ত বাড়িয়ে দিয়েছিল। জুন মাসে কলকাতায় একটা জনরব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, অযোধ্যার নির্বাসিত নবাবের অনুচরদল কলকাতার দুর্গের সিপাইদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে।

এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, উজীর আলী নকী খাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল ব্যারাকপুর। এখানকার সিপাইরা সাফল্যের সঙ্গে বিদ্রোহ করতে পারলে সাময়িক ভাবে হলেও কলকাতা ইংরাজদের হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল খুবই বেশী। সেইজন্যই কলকাতার ইউরোপীয়ানরা ব্যারাকপুরের কথা মনে করে আতঙ্কের ঘুমোতে পারতেন না।

মে মাসের শেষ ভাগে ব্যারাকপুরের সিপাইরা হঠাৎ নতুন এক কৌশল গ্রহণ করল। মনে হয় আলী নকী খাঁর কৌশলী হাত এর পেছনে ছিল।

ব্যারাকপুরের সিপাইরা হঠাৎ সবাই রাজভক্ত বনে গেল। তারা বলল, আমরা কোম্পানীর নিমক খাই, কোম্পানীর জন্য জান দিতে আমরা রাজী। যেসব সিপাই কোম্পানীর সঙ্গে বেইমানী করে বিদ্রোহ করছে, তারা আমাদের দুশমন। আমাদের দিল্লী পাঠানো হোক, ওদের ভাগিয়ে দিয়ে আবার আমরা দিল্লীতে কোম্পানীর রাজত্ব বসাব। তবে আমরা শান্তি পাব।

ব্যারাকপুরের সিপাইদের এই অদ্ভুত রাজভক্তির পরিচয় পেয়ে কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত হলেন। একমাত্র শিখ সৈন্য ছাড়া এ রকম আনুগত্য সে সময় আর কোন অঞ্চল থেকেই প্রত্যাশা করা যেতে না।

এই সংবাদ পেয়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং নিজে এত উৎসাহিত বোধ করলেন যে, সিপাইদের উৎসাহ দেবার জন্য তিনি নিজে ব্যারাকপুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সত্তর নম্বর রেজিমেন্টের দৃষ্টান্তে তেতাল্লিশ নম্বর রেজিমেন্টের সিপাইরা জানাল যে, তারাও বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে দিল্লী যাবার জন্য তৈরি আছে।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সিপাইরা গর্ভনমেন্টের কাছে এনফিলড রাইফেলে জন্য প্রার্থনা জানালো। এ এক অদ্ভূত ব্যাপার, যে-বন্দুকের টোটা নিয়ে সমস্ত গোলযোগের শুরু, সিপাইরা কি না সেই বন্দুকই চেয়ে বসল। সত্তর নম্বর রেজিমেন্টের একজন অফিসার সুস্পষ্টভাবে তাঁর আবেদন জানালেন ঃ

"আমরা এই বিষয়ে বিবেচনা করে দেখেছি। এখন আমরা উত্তর-পশ্চিম

প্রদেশে যাত্রা করছি। যে-রাইফেল নিয়ে সমস্ত দেশে এতদিন এত গোলমাল চলেছে, আমরা সেই রাইফেল পাবার জন্যই প্রার্থনা করছি। এই রাইফেল ব্যবহার করে আমরা গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারব এবং যাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে, তাদেরও বোঝাতে পারব যে, এই রাইফেলের ব্যবহারে আপত্তির কোনই কারণ নেই। তা নইলে আমরাই বা কি করে এই রাইফেল ব্যবহার করি! আমরা কি জাতি ও ধর্ম সম্পর্কে সচেতন নই ?"

গভর্নমেন্ট এবার তার রাজভক্ত সিপাইদের নিয়ে উভয় সংকটে পড়লেন। সিপাইরা যদি রাজভক্তির ভাণ করে এই উৎকৃষ্ট বন্দুক হস্তগত করে নিয়ে শেষ পর্যন্ত গভর্নমেন্টের বিপক্ষে চলে যায়, তাহলে অশেষ বিপদ। আর তাদের আবেদন পূর্ণ না করলে তারা বুঝবে যে, গভর্নমেন্ট তাদের সন্দেহের চোখে দেখছেন; তার ফলে তারাও গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।

এ পর্যন্ত অভিনয় বেশ ভালই চলছিল। হঠাৎ একটা বেকায়দা ঘটে গেল। ব্যারাকপুরের সিপাইদের কতগুলো চিঠি ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেইসব চিঠিতে কিছু কিছু গোপন খবর ফাঁস হয়ে যায়।

সুবাদার মাদার খাঁ, সরদার খাঁ ও রামশাহীলাল লিখেছেন—"বিশ্বাসঘাতকতা করার ব্যাপারে শালা ফিরিঙ্গীদের জুড়ী আর কেউ নেই। অযোধ্যার নবাব রাজ্য ছেড়ে দিলেন, কিন্তু ব্যাটারা তাঁকে পেনসনটা পর্যন্ত দিল না।"

আর একটা চিঠিতে খবর ছিল—"সেকেন্ড গ্রেনাডিয়ার বলেছেন, সমস্ত রেজিমেন্ট নবাবের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত আছে।"

চিঠির মধ্য দিয়ে আসন্ন বিদ্রোহের প্রস্তুতির সংবাদ ফাঁস হয়ে গেল। জেনারেল হিয়ার্সে ১৩ই জুন তারিখ গভর্নর জেনারেলের কাছে জরুরী সংবাদ পাঠালেন যে, ব্যারাকপুরের সিপাইরা সেই রাত্রিতেই বিদ্রোহ করবার ষড়যন্ত্র করেছে। কাজেই অবিলম্বে তাদের নিরস্ত্র করা দরকরা।

জেনারেল হিয়ার্সের কাছ থেকে এরকম মারাত্মক সংবাদ পেয়ে লর্ড ক্যানিং এবিষয়ে আর ইতস্তত করা সঙ্গত মনে করলেন না। পর দিন ভোর বেলায় দুই দল সৈন্য ব্যারাকপুরে গিয়ে পৌঁছল।

সে দিনই সন্ধ্যাবেলা সিপাইদের প্যারেডের ময়দানে জমায়েত করা হোল। সিপাইরা কর্তৃপক্ষের এ সমস্ত আয়োজন কিছুই জানতে পারে নি। ময়দানে হাজির হয়ে চমকে উঠল। তাদের মুখের সামনে কামানগুলো সাজানো রয়েছে। পাশেই সশস্ত্র গোরা সৈন্যরা প্রস্তুত হয়ে আদেশের অপেক্ষা করছে। জেনারেল হিয়ার্সে সিপাইদের অস্ত্র সমর্পণের জন্য আদেশ করলেন। বেচারী সিপাইরা কি করবে। গত্যন্তর না দেখে নিঃশব্দে হাতের অস্ত্র নামিয়ে রাখল।

ব্যারাকপুরের সিপাইদের বিদ্রোহের পরিকল্পনা এইভাবে ব্যর্থতায় ভেঙ্গে পড়ল। গভর্নমেন্ট একটা বিরাট ধাক্কা সামলে উঠল। কিন্তু কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজে তার প্রতিক্রিয়া যা ঘটল, তা ভোলার নয়।

মুখে মুখে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল। সমস্ত কলকাতায় প্রচার হয়ে গিয়েছিল ব্যারাকপুরের সিপাইরা ১৩ই জুন রাত্রিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। এখন তারা দলবদ্ধ হয়ে কলকাতার উপর হামলা করবার জন্য এগিয়ে আসছে! আরও একটা জনরব শোনা যাচ্ছিল যে, নির্বাসিত অযোধ্যার নবাবের অনুচরেরা সিপাইদের সঙ্গে একত্র মিলিত হবার জন্য উদ্যোগ করছে। এবার আর কারুর রক্ষা নাই!

কলকাতার ইউরোপীয় লোকেরা সকলেই প্রাণের ভয়ে ঘর বাড়ী ছেড়ে আত্মগোপন করবার জন্য নিরাপদ স্থান খুঁজতে লাগল। নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীরা ভয়ে আত্মহারা হয়ে দলে দলে চৌরঙ্গী থেকে গড়ের মাঠের দিকে ছুটে চলল। তারা

কেল্লার দুয়ারে গিয়ে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করবার জন্য কাকুতি মিনতি করতে লাগল। নগরের কোন কোন অংশের প্রশস্ত পথ গাড়ীতে পূর্ণ হয়ে গেল। ইউরোপীয়

স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে কোন দিকে দৃকপাত না করে পালাবার জন্য গাড়ীতে গিয়ে উঠতে লাগল। গড়ের মাঠে জনস্রোত বয়ে গেল। ওদিকে গঙ্গার তীর লোকে লোকারণ্য। পলায়নকারীরা হয় কেল্লায় নয় তো গঙ্গার উপরে যে-সমস্ত জাহাজ ছিল, সেখানে আশ্রয় লাভের জন্য চেষ্টা করছিল। যে দিকেই চাওয়া যায় সেদিকেই ত্রাসের চিহ্ন। কে কার আগে, কোথায় প্রাণ নিয়ে পালাবে সকলের মধ্যে তাই নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা চলছে।

সোমবার দিন প্রকৃত খবর যখন জানা গেল, তখন শহরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। ব্যারাকপুরের ঘটনার পরে গভর্নমেন্ট নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ, তাঁর উজির আলী নকী খাঁ ও অন্যান্য কর্মচারীদের কার্যকলাপ-সম্বন্ধে

বিশেষভাবে সন্দিহান হয়ে উঠলেন। ব্যারাকপুরের সিপাইদের চিঠিপত্র ছাড়াও কিছু কিছু সংবাদ তাদের কানে এসে পৌছেছিল। গভর্নমেন্ট এ ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে সাহস করলেন না, অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্ তাঁর প্রধান উজীর আলী নকী খাঁ ও অন্য তিনজন কর্মচারীকে আটক করে রাখা হবে।

এই কাজের ভার পড়ল পররাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী এডমনস্টোন সাহবের উপর। তিনি গোরা সৈন্য ও পুলিশ প্রহরীদের নিয়ে ভোর বেলা মুচিখোলায় নবাবের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সৈন্যরা সমস্ত বাড়ী ঘেরাও করল। এডমনস্টোন সাহেব কয়েকজন সৈন্য নিয়ে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। প্রথমেই তিনি গেলেন উজীর আলী নকী খাঁর ঘরে। কিছুক্ষণ পরে আলী নকী খাঁ ও আর কয়েকজন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হোল।

এডমনস্টোন সাহেব অতঃপর নব্যবের প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। নবাব পারিষদগণ ·বেষ্টিত হয়ে একটি কেদারায় বসে ছিলেন। সবাই গভর্নমেন্ট সেক্রেটারীকে সসম্মানে গ্রহণ করলেন। আসন গ্রহণ করে এডমনস্টোন নবাবকে বললেন, "গভর্নর-জেনারেল সংবাদ পেয়েছেন, গুপ্তচরগণ আপনার নাম করে বৃটিশ রাজ্যের চারদিকে সিপাইদের গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছে। এইজন্য গভর্নর-জেনারেলের ইচ্ছা যে, আপনি আমার সঙ্গে কলকাতা যাত্রা করেন।" নবাব ওয়াজিদ আলী আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু এডমনস্টোন সাহেব সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বললেন যে, এ ব্যাপারে তাঁর কোনই হাত নেই। তিনি গভর্নমেন্টের আদেশ প্রতিপালন করতে এসেছেন মাত্র।

১৫ই জুন সকালবেলা নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ তিন জন পারিষদসহ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আবদ্ধ হলেন।

সাবাস চট্টগ্রাম

১৮ই নভেম্বরের স্মরণীয় রাত্রি।

চট্টগ্রামের সিপাইদের ৩৪নং রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে বসল।

এইখান থেকেই আমাদের কাহিনী শুরু। সেদিনকার বাংলাদেশে—কলকাতায় নয়, ব্যারাকপুরে নয়, জলপাইগুড়িতে নয়, ঢাকায় নয়, আর কোন অঞ্চলে নয়, সিপাইদের প্রথম ও স্বাধীন অভ্যুত্থান চট্টগ্রামেই যে প্রথম ঘটেছিল, এ কথা আমরা অনেকেই জানি না।

সেদিনকার বাংলাদেশে বিদ্রোহের মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ সবাই আশায় ও আতঙ্কে ব্যারাকপুরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সকলের দৃষ্টিই একই দিকে নিবন্ধ। শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের স্মৃতি-বিজড়িত এই ব্যারাকপুর! শহীদের প্রাণদান কি বৃথাই যাবে! উত্তর

ভারত থেকে বিদ্রোহের উত্তপ্ত হাওয়া বার বার এসে ঝাপটা মেরে গেছে তার বন্ধ দরজায়। ফকীর আর সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধরে কত বার কত প্রচারকের দল বিদ্রোহের অগ্নিবাণী শুনিয়ে গেছে। লক্ষ্ণৌর প্রাক্তন নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্র মন্ত্রী আলী নকী

খাঁ কলকাতার মুচিখোলায় বসে ষড়যন্ত্রের সুতো টেনে চলেছেন, দিনের পর দিন আগুনে ফুঁ দিয়ে চলেছেন! কিন্তু কই, আগুন তো সেখানে জ্বলে উঠল না। ১৩ই জুন তারিখে হিয়ার্সে সাহেব হন্তদন্ত হয়ে কলকাতায় খবর পাঠালেন, ব্যারাকপুরের বিদ্রোহ ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে, অবিলম্বে সাহায্য পাঠাও। খবরটা হয়তো ঠিকই ছিল। কন্তি খবরটা পূর্বাহ্নেই ফাঁস হয়ে যাওয়াতে গভর্নমেন্টই এগিয়ে এসে আঘাত করল। সাজানো কামানের মুখে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা বিদ্রোহীদের পক্ষে সম্ভব হোল না। কর্তৃপক্ষের আদেশে তারা নিঃশব্দে হাতের অস্ত্র নামিয়ে রাখল।

জলপাইগুড়িতে বিদ্রোহের আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল। ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলা হচ্ছিল। কিন্তু গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। শৃঙ্খলিত ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল ৪ঠা ও ৫ই ডিসেম্বর তারিখে। কিন্তু সেও তো চট্টগ্রামের পরে। ঢাকার সিপাইরা ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল, এ সংবাদ আমরা জানি, কিন্তু এখানেও ইংরাজ সৈন্যরাই প্রথম গিয়ে আঘাত করল। তার প্রতিরোধ করতে গিয়েই বিখ্যাত 'কালা-ধলার লড়াই' ঘটে গেল।

সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে চট্টগ্রামের সিপাইরাই সবার আগে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করল, মরা গাঙ্গে তারাই প্রথম বান জাগিয়ে তুলল, এই কথাটি সম্মরণ করে রাখবার মত। এই প্রসঙ্গে দু'টি কথা মনে রাখা দরকার। চট্টগ্রামের সিপাইদের মধ্যে ব্যারাকপুরের সিপাইদের একটা দলও ছিল, সেখান থেকে তারা বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্র বহন করে নিয়ে এসেছিল, এই অনুমান অস্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয় কথা, চট্টগ্রামে সরকারী তৎপরতা ছিল খুবই কম, বিদ্রোহ করতে গিয়ে বিদ্রোহীদের সরকারী বাধার সম্মুখীন হতে হয় নি।

কিন্তু সমস্ত কথা বলবার পরেও একথা জ্বলন্ত সত্য যে, সমস্ত বাংলাদেশে চট্টগ্রামের সিপাইরাই সর্ব প্রথম প্রকাশ্য রাজপথে বিদ্রোহের ঝান্ডা হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর সমস্ত বাংলাদেশ, তথা সমস্ত ভারত জুড়ে মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল-সাবাস চট্টগ্রাম! ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর রাত্রিবেলায় চট্টগ্রাম যখন বিদ্রোহের পথ দেখাল, সেদিনকার বাংলাদেশ জুড়ে কি তেমিন জয়ধ্বনি উঠে নি-'সাবাস চট্টগ্রাম'?

নিজেদের অতীত-সম্পর্কে অচেতন থেকে, অবহেলা করে, আমরা আমাদের ইতিহাসকে হারিয়ে ফেলেছি। কত গৌরবময় কাহিনী, কত বীর শহীদের নির্ভীক আত্মদান, কত উন্মাদনাময় রোমাঞ্চকর ঘটনা, কত রক্ত ও অশ্রুর নিঃশব্দ আত্মনিবেদন আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন।

আজ আমরা জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। বিদেশীর লেখা ইতিহাসে যাকে দুর্বৃত্ত ও বদমাসদের অনাচার ও নষ্টামি বলে আখ্যা দিয়েছে এতদিন সেই ইতিহাস নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। আজ আর তাকে আমরা মেনে নিতে পারছি না। এই 'বদমাসদের নষ্টামির' ইতিহাসের মধ্যে আমরা আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রাণময় আহ্বান খুঁজে পেয়েছি। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও প্রতিদিনের বাঁচবার

সংগ্রামের সঙ্গে সেই মহাবিদ্রোহের অনন্তগূঢ় যোগাযোগ আজ আমাদের চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তাই আজ আমরা ইতিহাসের বন্ধ দরজার উপর বার বার করাঘাত করে চলেছি, ইতিহাস, দরজা খোল! আমাদের এক গৌরবময় ঐশ্বর্যভান্ডার তোমার বুকে লুকিয়ে রেখেছ!–ইতিহাস, দরজা খোল, আমরা তাকে দু' চোখ ভরে দেখতে চাই-দেখে ধন্য হতে চাই। এ দরজা কি খুলবে না ? চট্টগ্রামের সেই বীর সিপাইদের বিদ্রোহের কাহিনী–তার তাৎপর্য কি শুধু চট্টগ্রামের মধ্যেই নিহিত ? সমস্ত বাংলাদেশের প্রাণোন্মাদনা কি তাকে রস যোগায় নি ?

১৮ই নভেম্বরের স্মরণীয় রাত্রি।

চট্টগ্রামের সিপাইদের ৩৪নং রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে বসল।

সংবাদ পেয়ে অফিসারেরা ব্যাকুল হয়ে ছুটে গেলেন তাদের ঠান্ডা করবার জন্য। প্যারেডের ময়দানে জমায়েত হবার জন্য সবাইকে আদেশ দেওয়া হলো। সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষা করতেই হবে।

সামরিক শৃঙ্খলা ? কে আজ মানবে! এতদিনকার পরাধীনতার শৃঙ্খল টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য যারা অধীর হয়ে উঠেছে, এই শৃঙ্খলা তাদের জন্য নয়। অফিসারের ডাকে কেউ সাড়া দিল না। কে একজন চিৎকার করে উঠল, 'মারো, মারো ফিরিঙ্গীকো!' সঙ্গে সঙ্গে আর একজন একটা বন্দুক নিয়ে তাক করল তার দিকে। কয়েকজন মাঝখানে পড়ে তাকে নিরস্ত করল–কি হবে ওকে মেরে! দাও, ছেড়ে দাও! ক্যাপটেনকে ডেকে তারা বলল,

"সাহেব, আমরা তোমাদের কাউকে মারতে চাই না। 'তোমরা যে-কয়জন এখানে আছো, প্রাণের মায়া যদি থাকে, এখান থেকে এক্ষুণি পালাও। সময় বড় খারাপ পড়েছে, লোকগুলো ক্ষেপে উঠেছে, কখন যে কি করে বসে, বলা যায় না তো।"

ক্যাপটেন অবস্থাটা বুঝলেন। কথা ঠিক, শৃঙ্খলা রক্ষার চিন্তাটা আপাতত না করাই ভাল। আর একটুও দেরী করা চলে না। প্যারেডের ময়দান থেকে তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন।

বিদ্রোহী সিপাইরা কাউকে প্রাণে মারল না। রক্তপাত করবার দিকে তাদের ঝোঁক ছিল না। প্রাথমিক কাজ হিসেবে তারা সরকারী তোষাখানা থেকে তিনি লক্ষ

টাকা লুটে নিল, জেলখানার কয়েদীদের ছেড়ে দিল, সৈন্যদের ব্যারাক পুড়িয়ে ছাই করে ফেলল, অস্ত্রাগার দিল উড়িয়ে।

তারপর তিনটা সরকারী হাতী ও দুটো ঘোড়ার উপর তাদের লুটের মাল চাপিয়ে বিদ্রোহী সিপাইরা চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে ত্রিপুরার দিকে যাত্রা করল। কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা যাত্রা করেছিল, এর পেছনে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল কিনা, ভারতব্যাপী বিদ্রোহের সঙ্গে এর কোন যোগসূত্র ছিল কিনা, না কি এ শুধু বহুদিনের সঞ্চিত বিক্ষোভের আকস্মিক বিস্ফোরণজাত একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র–এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে!

হাবিলদার রজব আলী খাঁ। বিদ্রোহী সিপাইদের পরিচালনার ভার তাঁর উপরেই এসে পড়ল। বিদ্রোহীরা স্থির করেছিল যে, তারা ইংরাজের রাজত্ব ছেড়ে স্বাধীন ত্রিপুরার নিরাপদ অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেবে। রজব আলী খাঁ তাঁর বাহিনীকে সেই পথেই পরিচালিত করলেন। সরলমন সিপাইরা ভাবতেও পারে নি, ইংরাজের আসল গোলামেরা স্বাধীনতার তক্‌মা এঁটে তাদের ইংরাজ প্রভুর হুকুম তামিল করে চলেছে। ভারতব্যাপী মহাবিদ্রোহের দিনে এই সমস্ত তথাকথিত স্বাধীন রাজ্যের রাজা, মহারাজা ও নবাবের দল অনুগ্রহ লাভের আশায় জনসাধারণের আক্রমণ থেকে তাদের প্রভুকে রক্ষা করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। হায়দরাবাদের নিজাম, সিন্ধিয়া, গায়কোয়ার, ভূপালের বেগম, কাশ্মীরের গোলার সিং আর কত নাম করব, এরকম বহু অশুভ উপগ্রহ সেদিন বিদ্রোহের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত দুশমনি করেছিল। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা তাদের একজন।

চট্টগ্রামের কমিশনার স্বাধীন ত্রিপুরার রাজার কাছে সংবাদ পাঠালেন, বিদ্রোহী সিপাইরা তোমার রাজ্যের দিকে চলেছে, তাদের আটকাও!

অতি বশংবদ স্বাধীন রাজা উত্তরে জানালেন—জী হুজুর প্রস্তুত আছি। শুধু রাজার কাছে নয়, কমিশনার সাহেব পার্বত্য প্রদেশের আরও দুই জন বড় বড় জমিদারের কাছেও এই মর্মে চিঠি দিলেন।

বিদ্রোহীরা সীতাকুন্ড হয়ে ২রা ডিসেম্বর তারিখে 'স্বাধীন ত্রিপুরা'র প্রবেশদ্বারে গিয়ে পৌছল। গিয়ে দেখল, বহু সশস্ত্র সৈন্য সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। বিদ্রোহীদের অভিনন্দন বা অভ্যর্থনা জানাবার জন্য নয়, তাদের ধ্বংস করার জন্য তলোয়ারে শান দিচ্ছে।

সেখানে বাধা পেয়ে তারা সেখান থেকে ফিরে কুমিল্লার পাহাড় এলাকার দিকে চলল। এখান দিয়ে যাবার সময় তাদের চরম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। তাদের তিনটি হাতী এখানে হাতছাড়া হয়ে যায়, দশ হাজার টাকা খোয়াতে হয়, অনেক লোকও ধরা পড়ে যায়। ত্রিপুরার রাজা ও জমিদারেরা বার বার আক্রমণ করে তাদের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। আর কোন পথ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তারা মণিপুর রাজ্যের দিকে এগোতে থাকে।

মণিপুরের পথে শ্রীহট্টে গিয়ে তাদের বাধা পেতে হল। 'মেজর বাইঙ্গের নেতৃত্বে শ্রীহট্টের পদাতিক দল তাদের উপর আক্রমণ চালায়। চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাইরা শ্রীহট্টের সিপাইদের আপনাদের পক্ষে টেনে আনবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। কিন্তু এই চেষ্টায় কোনই ফল হয় না। লাতু নামক একটা জায়গায় দুই পক্ষের যুদ্ধ হয়, মেজর বাইঙ্গ নিহত হন। কিন্তু বিদ্রোহী সিপাইরা প্রতিপক্ষের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে লাতু ও মণিপুরের মাঝামাঝি জায়গা একটা বনের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করল।

বিদ্রোহীরা মণিপুর রাজ্যের সীমানার মধ্যে এসে পৌছে গেল। এর পরেও শ্রীহট্টের সিপাইদের সঙ্গে তাদের দু'বার যুদ্ধ হয়। আক্রমণের আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত তাদের পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। পর পর কয়েকটা যুদ্ধে তাদের পক্ষের অনেক লোক মারা যায়। যারা বেঁচে ছিল, তাদেরও বাইরে বেরিয়ে আসবার কোনই পথ ছিল না। এই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে তারা আটক পড়ে গেল। তারপর তাদের কি হয়েছিল, সে ইতিহাস কেউ জানে না।

ঢাকায় কালা-ধলার লড়াই

ঢাকা শহর, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস।

জজসাহেব মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছিলেন। গত ক'দিন ধরে খুব বেশী করেই ভাবছেন। সারা ভারতের উপর দিয়ে যে-ঝড়টা বয়ে চলেছে, ঢাকার মাথার উপর তা' কখন ভেঙ্গে পড়ে! ঝড় থামবার কোনই লক্ষণ নেই, দিন দিন বেড়েই চলেছে। আজ মীরাট, কাল দিল্লী, তারপর বারাণসী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর .... একটির পর একটি ঝড়ের ধাক্কায় কাত হয়ে পড়ছে। এর শেষ কোথায়?

ভাবতে ভাবতে জজসাহেব ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় বেয়ারা এসে সেদিনকার ডাকের "দৈনিক হরকরা" দিয়ে গেল। বেয়ারার ডাকে ঝিমুনিটা ভেঙ্গে গেল, কিন্তু ঘুমের জড়তাটা তখনও কাটে নি। ঘুম ঘুম চোখেই কাগজটা টেনে নিলেন।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড! জজসাহেব চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, মাই গড্! কি বলবেন, কি করবেন, খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত এলার্ম বেল্‌টা বাজিয়ে দিলেন। ঢং ঢং ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়তে লাগল।

কি হয়েছে, কি হয়েছে! চারদিক থেকে লোক ছুটোছুটি করে আসতে লাগল। কাচারীর কাছে ভীড় জমে গেল। সবার মুখেই এক প্রশ্ন–কি হয়েছে?

হাঁপাতে পাঁপাতে জজসাহেব সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ওরা আসছে।"

"ওরা কারা?"

"আহা, কারা আবার, সিপাইরা!"

"সিপাইরা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিউটিনি শুরু হয়ে গেছে-যে।"

আর কিছুই বলতে হোল না। হুড়-মাড় দুড়-দাড় করে দেখতে দেখতে কাছারী থেকে সমস্ত মানুষ ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। 'ওরা আসছে', 'ওরা আসছে',

চারদিকে কেবল এই কথাই শোনা যেতে লাগল। দেখতে দেখতে শহর-ময় দূর-দূরান্তে, এই কথা প্রচারিত হয়ে গেল। অফিস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান একদম খালি হয়ে গেল। শহরের লোকেরা আপন আপন দরজায় খিল দিল। ধনী লোকেরা যার যা সম্পত্তি মাটির নীচে পুঁততে শুরু কল। মুদির দোকানে বিষম ভীড়। চাল, ডাল, তেল, নুন যে যত পারে কিনতে লাগল, দেখতে দেখতে জিনিসের দর চড় চড় করে উঠে গেল।

সবাই আশঙ্কা করছে, এখনই কালা-ধলার লড়াই শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু ঢাকা শহরে-যে তখন গোরা সৈন্য মোটেও নেই, অত হিসেব কে করে!

এত হৈ-হুল্লোড়, দাপাদাপি করে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ব্যাপার কিছুই নয়। কথায় কথায় তিল থেকে তাল হয়ে যায়। কিন্তু এখানে তিলেরই অস্তিত্ব নেই। কেল্লার সিপাইরা, কোর্ট-কাছারীর সিপাইরা, তোষাখানার সিপাইরা সবাই শান্ত মনে যে যার কাজ করে চলেছে। মাঝ-খান থেকে সমস্ত শহরটা অনর্থক পাগলা ঘোড়ার মত ঘণ্টাখানেক লাফিয়ে মরল। অনেক খোঁজ করতে করতে শেষ পর্যন্ত সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। জজ সাহেব কিছুটা ঘুমঘুম চোখে, কিছুটা বা কল্পনার বশে দৈনিক হরকরায় কি দেখতে কি দেখেছিলেন, তার ফলেই এত সব কান্ড! এ কিন্তু মনগড়া গল্প নয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে ঢাকা শহরে এই ঘটনাটি সত্যসত্যই ঘটেছিল।

জুন গেল জুলাই গেল। দিকে দিকে ঘনঘটা। ঝড়ের উদ্দাম নৃত্য বেড়েই চলেছে। কানপুরে জেনারেল হুইলারের আত্মসমর্পণ, চিনহাটে ইংরাজের পরাজয়, লক্ষ্মৌর কাছে গিয়েও জেনারেল হ্যাভলককে হটে আসতে হয়েছে, কানপুরে সতীচওড়ার হত্যাকান্ড, বিবিঘরের হত্যাকান্ড-নিত্য-নতুন সংবাদ আসছে। সমস্ত সংবাদই ভগ্নদূতের সংবাদ। বিশেষ করে সতী-চওড়ার হত্যাকান্ড ও বিবিঘরের হত্যাকান্ডের সংবাদে ঢাকায় উইরোপীয়ান সমাজে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে!

ওদিকে ঢাকার সিপাইদের সদর কেন্দ্র জলপাইগুড়ি থেকে দিনের পর দিন নানারকম খবর শোনা যাচ্ছে। কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, হলপ করে কেই বা বলতে পারে! কিন্তু খবরগুলো যা আসছে, সবই উদ্বেগজনক সন্দেহ নেই। মীরাটের বিদ্রোহী সিপাইরা নাকি প্রচারকার্যে বেরিয়ে গেছে। সন্ন্যাসী আর ফকীরের বেশে

তারা নাকি সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে যাচ্ছে, বিদ্রোহের বীজ বুনে চলছে। শোনা যায়, তারা নাকি জলপাইগুড়ির সেনানিবাসে ঢুকে পড়েছে। এতদিনে তারা-যে ঢাকায় এসে পৌছায় নি, তারই বা নিশ্চয়তা কি!

কিছুদিন বাদে জলপাইগুড়ি থেকে পাকা খবর পাওয়া গেল। সেখানকার আবহাওয়া সত্যসত্যই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সিপাইরা বিদ্রোহের জন্য ষড়যন্ত্র করছিল। কিন্তু খবরটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ষড়যন্ত্রকারীরা অনেকেই ধরা পড়ে গেল। একজন গুলির আঘাতে প্রাণ দিল, একজন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নদীতে ডুবে মরল। বাকী অপরাধীদের বিচারের জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অবস্থা তখনকার মত শান্ত হলেও এ শান্তি কতক্ষণ টিকে থাকবে কে বলতে পারে! ঢাকার নিরাপত্তার জন্য জলপাইগুড়ির শান্তি অত্যাবশ্যক। তার কারণ ঢাকার সিপাইদের সদর কেন্দ্র জলপাইগুড়িতে, সেখানে সিপাইরা বিদ্রোহী হলে এখানকার সিপাইদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।! এখানকার সিপাইরা জলপাইগুড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

অবস্থা চারদিক দিয়েই ঘোরালো হয়ে আসছে। ইউরোপীয় মহল আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। তারা সিদ্ধান্ত করল, এ ভাবে বসে থাকলে চলবে না, আত্মরক্ষার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ৩০-এ জুলাই তারিখে ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে তারা একটা সভা ডাকল। উইরোপীয়ান নাগরিকের মধ্যে যারা অস্ত্রের ব্যবহার জানতো, শুধু তাদেরই আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেদিনকার সভায় ষাট জন লোক উপস্থিত ছিল। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল, দুটো ভলানটিয়ার বাহিনী গঠন করতে হবে—একটা পদাতিক বাহিনী, আর একটা সওয়ার বাহিনী। মেজর স্মিথ পদাতিক বাহিনীকে, আর লেফটেনান্ট হিচিন্‌স্ সওয়অর বাহিনীকে পরিচালনা করবেন।

আতঙ্ক দিন দিনই বেড়ে চলেছে। আর্মেনিয়ানরা দলে দলে ঢাকা ছেড়ে কলকাতার দিকে পাড়ি দিচ্ছে। ইউরোপীয়ানরা তাদের মিলগুলোকে নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছে। এগুলো সুরক্ষিত করে তোলা দরকার। সাহেবদের মধ্যে এত আতঙ্ক কিসের দেশী লোকেরা ভাল করে বুঝতে পারে না। ভলানটিয়ার বাহিনী যখন রাত্রিতে পাহারা দিতে বেরোয় এরা অবাক হয়ে হা করে তাকিয়ে থাকে।

আগস্ট গেল, সেপ্টেম্বর গেল, এল অক্টোবর। হাওয়া এবার উল্টো দিকে বইতে শুরু করেছে। বিদ্রোহীরা ঘাঁটির পর ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে পেছনে হটে আসছে। দিল্লীর পতন হয়েছে। উদ্যোগ চলে গিয়েছে ইংরাজদের হাতে, বিদ্রোহীরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। ঢাকার উইরোপীয়ান মহলে কিছুটা আশ্বস্তির ভাব ফিরে আসছে।

১২১

এই অক্টোবর মাসেই সিপাইদের ভেতরকার অবস্থার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল। সিপাইরা বিদ্রোহের জন্য ভেতরে ভেতেরে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু আগু হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। তার আগেই তাদের টুটি চেপে ধরা হোল।

আমাদের দেশের মানুষ হয়েও যারা সেদিন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, প্রধানত যাদের উপর নির্ভর করে, সাম্রাজ্যবাদ সেদিন তার খোঁড়া পায়ে উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল, বৃটিশের সেই সমস্ত বন্ধু সারা ভারত জুড়েই ছিল। ঢাকাতেও তার অভাব হয় নি। ঢাকার নবাব বাড়ীর খাজা আবদুল গণি এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

ঐতিহাসিক কে সাহেব তাঁর সম্পর্কে যা লিখেছেন, আমি শুধু সেইটুকুই তুলে দিচ্ছি ঃ

"এক সদবংশজাত ভদ্রলোক তখন ঢাকার জমিদার ছিলেন। তিনি ভাল ইংরাজী বলতে ও লিখতে পারতেন। তাঁর নাম খাজা আবদুল গণি। তাঁর সহানুভূতিও সমর্থন পুরোপুরিভাবে বৃটিশের পক্ষেই ছিল। ২৩-এ অক্টোবর তারিখে তিনি কমিশনারকে লিখে জানালেন যে, এখানে একটা গুজব ছড়িয়ে গেছে যে, ৭৩ নং নেটিভ ইন্‌-ফ্যান্ট্রির দুটো কোম্পানী নাকি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এবং তারা নাকি তাদের প্রতিবেশীদের কাছে বলেছে যে, ইংরাজের নৌ-সেনাদের সঙ্গে তাদের শীগগিরই একটা যুদ্ধ বাধবে। সেজন্যই তারা তাদের পরিবার পরিজনকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। তিনি লিখলেন, তাঁর মতে এই দু'টি কোম্পানীকে

জলপাইগুড়িতে পাঠিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা।"

খাজা আবদুল গণির কাছ থেকে এই সংবাদটা পাওয়ার ফলে ইংরাজদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল।

ভারতীয় বিদ্রোহের মূল ধারায় যখন ভাঁটার টানের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, পূর্ববঙ্গের শাখা ধারায় তখন জোয়ারের ডাক এসে পৌঁছল! এই অদ্ভুত রহস্যের ব্যাখ্যা করার মত কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। মে থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত ভারতীয় বিদ্রোহ যখন গগণস্পর্শী হয়ে উঠেছিল পূর্ব-বঙ্গের তথা সারা বঙ্গের সিপাইরা তখন বসে বসে কি ভাবছিল ?

১৮ই নভেম্বর চট্টগ্রামের ৩৪নং রেজিমেন্টের সিপাইরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল ২১-এ নভেম্বর সেই খবর ঢাকায় এসে পৌঁছল।

সেইদিনই সন্ধ্যা ছ'টার সময় সরকারী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তার পরদিন ২২-এ নভেম্বর রবিবার ৭৩নং নেটিভ ইন্‌ফ্যান্ট্রির সিপাইদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হবে।

১২২

২২-এ নভেম্বর সকালবেলায় নৌ-সেনা বিভাগের লেফটেনান্ট লিউইস জাহাজী গোরা সৈনিকদের নিয়ে কাজে নামলেন। তাদের সঙ্গে ছিল দুটো কামান। প্রথমে তিনি তোষাখানায় গিয়ে সেখানকার সিপাইদের অস্ত্র নিয়ে নিলেন। তারপর প্রধান ইঞ্জিনীয়ারের কার্যলয়রক্ষক সিপাইদের নিরস্ত্র করা হয়। তারপর মাল-গুদামের সিপাইদের পালা। কোন জায়গাতেই বাধা পাওয়া যায় নি। বাধা পাওয়া গেল লালবাগে। তারা হাতের অস্ত্র ছাড়তে রাজী হোল না। ঢাকার সিপাইদের বহু-বিলম্বিত বিদ্রোহ এবার সশস্ত্র ও রক্তক্ষয়ী রূপ নিয়ে দেখা দিল।

লেফটেনান্ট লিউইস লালবাগ অবরোধ করলেন। দুই পক্ষে প্রবল গুলিবর্ষণ চলল। চল্লিশ জন সিপাই যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিল, অনেকে গুরুতর জখম হয়ে পড়ে রইল। প্রাণ বাঁচাবার জন্য যারা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ নদীতে ডুবে মারা গেল। ইংরাজরা বলেন, তাঁদের পক্ষে মাত্র একজন নাকি এই যুদ্ধে মারা গিয়েছিল।

লালবাগ অঞ্চলের বৃদ্ধদের মুখে শুনেছি, তাঁদের ছেলেবেলায় তাঁদের দাদী-নানীদের মুখে এই কালা-ধলার লড়াইয়ের কাহিনী শুনতে শুনতে শিউরে উঠতেন। মৃত্যুপথের যাত্রী এই জখমী মানুষগুলো যখন আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে 'পানি', 'পানি' বলে চিৎকার করছিল, তাদের সেই আর্তকণ্ঠ লালবাগের দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে বাইরের মানুষের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাদের সেই আর্তনাদে কত মায়ের চোখে অশ্রু ঝরে-ছিল, কত ভাই বোনের প্রাণ রুদ্ধ আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল! কিন্তু নির্মম সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের হিংস্র অনুচরের দল সেদিন পথে আটকে দাঁড়িয়ে ছিল। লালবাগের কালো মানুষ সেদিন তার কালো সিপাই ভাইদের জন্য বিনিদ্র নয়নে ছটফট করে কাটিয়েছে।

সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে বলাবলি করত, তারা স্বকর্ণে শুনেছে! রাত্রি যখন গভীর হয়ে আসত, একটা নিঃসীম নিঃশব্দতার কালো পর্দা নেমে আসত ঘুমন্ত লালবাগে, মাঝে মাঝে, আকস্মিক দমকা হাওয়ায় বুড়ীগঙ্গার পানিতে জেগে উঠত

মর্মরিত বিলাপ, তখন ঠিক সেই সময় লালবাগের ভাঙ্গা প্রাচীরের অন্তরাল থেকে কাদের করুণ কণ্ঠ ভেসে আসতা ঃ ভাইয়া, পানি দে। এ মায়ি, থোড়া পানিদে।

আজকার ভিক্টোরিয়া পার্ক রূপগরবিনী সুন্দরীর মত ফুলের হাসি হাসছে। পথচলিত মানুষ মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। পুরানো ঢাকার সেই অতিপরিচিত আন্টাঘরের ময়দান। আজ তার কত বর্ণ বিলাস! কিন্তু এখনকার লোকেরা কি জানে, এই ফুলের হাসির অন্তরালে সে কি এক নিষ্ঠুর ও বীভৎস স্মৃতি বহন করে চলেছে?

লালবাগের সেই খন্ডযুদ্ধে যে-সব সিপাইরা বন্দী হয়েছিল, যে-সব পলাতকেরা ক্রমে ক্রমে ধরা পড়তে লাগল, তাদের সবাইকে সেদিন আন্টা-ঘরের ময়দানে

গাছের ডালে ডালে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। ঢাকার কালো মানুষেরা আতঙ্কে চোখ বুজল। কোথায় ছিল তাদের বাড়ী ঘর কে জানে! কোথায় রইল তাদের বাপ-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েরা! তাদের এই শেষ খবরটুকু কেই বা পৌছে দেবে তাদের কাছে!

দিনের পর দিন মৃতদেহগুলো ঝুলতে লাগল, পচে গলে পড়তে লাগল, শকুনেরা মহোৎসবে মেতে গেল! ঢাকা শহরের মানুষের মনে আতঙ্ক ও বিভীষিকার সৃষ্টি করে আন্টাঘরের ময়দানে ইংরাজ তার বিজয়োৎসব সম্পন্ন করল।

আন্টাঘরের সেই হত্যাকান্ড সম্পর্কে তখনকার দিনের ঢাকা শহরের একজন নাগরিক একটু উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর নাম হৃদয়নাথ মজুমদার। তিনি তাঁর 'দি রেমিনিসেন্স অব ঢাকা' নামক বইটিতে লিখেছেন ঃ

"তাদের সব কজনাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হোল। আন্টাঘরের ময়দানে এই শোচনীয় হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাপর থেকে ঢাকার লোক এই জায়গাটাকে ভয়ের চোখে দেখত। বাংলাবাজার, শাঁখারীরবাজার, কলতাবাজার এবং চারদিককার অন্যান্য মহল্লার লোকদের মধ্যে এ নিয়ে নানারকম গল্প চলতি ছিল। রাত্রিবেলা নিহত লোকদের প্রেতাত্মারা নাকি ময়দানে ঘুরে বেড়াত এবং সেখান থেকে নাকি আর্তনাদ ও নানারকম বিকট শব্দ শোনা যেত। বুড়োবুড়ীদের কাছে আমরা এই সমস্ত গল্প শুনতাম। সন্ধ্যার পর ভয়ে ওদিকে মাড়াতাম না।"

লালবাগ, ঢাকা শহরের পবিত্র ভূমি। এখানে বীর সিপাইরা সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচরদের আদেশে, প্রাণের ভয়ে হাতের অস্ত্র ছেড়ে দেয়নি, আত্মসমর্পণ করে নি, যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছে। একদিন সারা ভারত জুড়ে অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করবার জন্য যে দুঃসাহসিক অভিযান শুরু হয়েছিল, আমাদের ঢাকার বীর সিপাইরা সেই অভিযানের নির্ভীক যাত্রী। বুকের শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিয়ে তাঁরা আমাদের যাত্রাপথকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তাঁদের নিশান আমাদের পথ দেখিয়েছে।

শহীদের রক্তে ভেজা শহরের মাটি উর্বর হয়ে উঠেছে। এই উর্বর জমিতে তাজা ফসল ফলছে, ফলবে। দেশের ডাকে প্রাণ উৎসর্গ করবার লোকের অভাব এখানে কোনদিনই হবে না। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে বাংলাভাষার বীর শহীদেরা তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এখানকার আকাশে-বাতাসে বীর শহীদদের বজ্র আহ্বান নিরন্তর ঘোষিত হয়ে চলেছে। এখানকার মানুষ সেই আহ্বানে সাড়া দিতে কোনদিন পশ্চাৎপদ হবে না।

সাম্রাজ্যবাদের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে আমরা অচেতন হয়ে ছিলাম। এক শো বছর আগেকার আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমাদের

বীর শহীদদের আমরা চিনতে পারি নি, তাদের আমরা স্বীকার করি নি। কিন্তু আজ হাওয়া বদল হয়ে গিয়েছে। আমরা লক্ষ শহীদানের আত্মদানের মহিমায় উজ্জ্বল অতীতকে ফিরে পেয়েছি। আমরা বেঁচে গেছি। বীর শহীদদের রক্তে লাল লালবাগ তাই আজ আমাদের চোখে মহান হয়ে দেখা দিয়েছে।

আজ স্বপ্ন দেখছি—এ স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠতে বেশী দেরী নেই—এই লালবাগে একদিন বীর বিদ্রোহীদের স্মরণ করে স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি স্বপ্ন দেখছি, সারা বাংলাদেশের দেশপ্রেমিকেরা একদিন দলে দলে জিয়ারত করতে আসবেন এই পুণ্যতীর্থে। শহীদ-বেদীতে প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি ঢেলে দিয়ে ধন্য হয়ে ফিরে যাবেন। হতাশ দেশসেবকেরা এখানে এসে তাঁদের ভাঙ্গা মনকে জোড়া দিয়ে নিয়ে যাবেন, প্রতিকূল অবস্থার হতাশা, অবসাদ ও ক্লান্তির মধ্যেও এখানে এসে তাঁরা নতুন উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হয়ে যাবেন।

আমি সেই স্বপ্ন দেখছি। জানি, আমার এই স্বপ্ন দেখা নিষ্ফল হবে না। লালবাগের খন্ড যুদ্ধের পর অধিকাংশ সিপাই ঢাকা ছেড়ে তাদের হেড কোয়ার্টার জলপাইগুড়ির দিকে ছুটল। গভর্নমেণ্টের মতলব ছিল ঢাকার সিপাইদের ঢাকাতেই খতম করে দেওয়া, যাতে তারা অন্যত্র গিয়ে উপদ্রবের সৃষ্টি করতে না পারে। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল। জাহাজী গোরা সৈন্যদের নায়ক মিঃ লিউইস তাদের অবরোধ করেছিলেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ সিপাই সেই বেড়া ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ল এবং তাদের আগেকার পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা জলপাইগুড়ির দিকে যাত্রা করল।

ঢাকার বিদ্রোহী সিপাইরা জলপাইগুড়ির দিকে আসছে শুনে সরকারী মহলে 'সামাল্' 'সামাল্' রব পড়ে গেল। ভাগলপুরের কমিশনার ইউল সাহেব তাদের আটকাবার জন্য সসৈন্যে জলপাইগুড়ির দিকে যাত্রা করলেন। ঢাকার সিপাইরা তিস্তা নদী পার না হতেই ইউল সাহেব এসে তাদের ধরে ফেললেন। ইউল সাহেবের লক্ষ্য ছিল এরা যাতে কিছুতেই তিস্তা পার হতে না পারে। কিন্তু এদের আটকে রাখা সম্ভব হোল না। এরা অন্য পথ দিয়ে নদী পার হয়ে গেল। ইউল সাহেব তাদের পেছনে পেছনে ছুটলেন। সিপাইরা বৃটিশ এলাকা ছেড়ে নেপাল রাজ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সেখানে গিয়েও নিশ্চিন্ত হবার যো নেই। নেপালের জঙ্গ বাহাদুর ইংরাজদের পরম বন্ধু বা বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। ইউল সাহেব ঢাকার সিপাইদের শায়েস্তা করবার জন্য জঙ্গ বাহাদুরকে লিখে পাঠালেন।

জঙ্গ বাহাদুর এই কাজ হাসিল করবার জন্য রত্নমণি সিং নামে একজন নেপালী সেনাপতিকে আদেশ দিলেন। কিন্তু তাতে কোনই কাজ হোল না। সিপাইরা

নেপালের অরণ্যময় পার্বত্য পথ দিয়ে এমন কৌশল করে অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমাংশে পালিয়ে গেল যে, ইংরাজ ও নেপালীরা বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাদের ধরতে পারল না।

তাঁতীয়া টোপী

"আমার নাম তাঁতীয়া টোপী। আমার বাবার নাম পাভুরঙ্গ। আমি বিঠুরের অধিবাসী। আমার বয়স পয়ঁতাল্লিশ। আমি নানা সাহেবের দেহরক্ষক বা এইড্-ডি-ক্যাম্প হিসেবে কাজ করে এসেছি।"

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে কানপুরের কালেক্টর নানা সাহেবকে তাঁর সৈন্য ও কামান নিয়ে বিঠুর থেকে কানপুরে এসে থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন। নানা সাহেব তাতে রাজী হওয়ায় নানা সাহেব ও আমি এক শো সিপাই, তিন শো বন্দুকধারী ফৌজ ও দু'টি কামান নিয়ে কালেক্টর সাহেবের বাড়ীতে এসে পৌছলাম। তিনি বললেন, আমরা-যে তাঁর সাহায্যের জন্য এসেছি, এটা তাঁর পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা, কারণ সিপাইরা বড় বেশী অবাধ্য হয়ে উঠেছে।

"এর দু'দিন বাদে ইন্‌ফ্যান্‌ট্রির তিনটি রেজিমেন্ট ও সেকেন্ড লাইট ক্যাভেলরির সওয়াররা আমাদের ঘেরাও করে নানা ও আমাকে তোষাখানার মধ্যে বন্দী করে রাখল এবং অস্ত্রাগার ও তোষাখানা নিঃশেষে লুট করল। তা থেকে নানার হাতে তারা দুই লাখ এগার হাজার টাকা দিল। আবার সেই টাকা পাহারা দেবার জন্য তারা তাদের নিজেদের শান্ত্রী মোতায়েন করল। ইতিমধ্যে আমাদের দলের সিপাইরা বিদ্রোহী সিপাইদের দলে ভিড়ে গিয়েছে।"

"এর পর সিপাইরা নানা সাহেবকে, আমাকে ও আমাদের সমস্ত লোক-জনকে নিয়ে যাত্রা করল। বলল, চলুন, আমাদের সঙ্গে দিল্লী যেতে হবে। কানপুর থেকে তিন ক্রোশ পথ যাবার পর নানা সাহেব বললেন, বেলা শেষ হয়ে এসেছে, এখানেই আমাদের বিশ্রাম নেওয়া ভাল। কাল সকালে আবার যাত্রা করা যাবে।"

"পরদিন সকালে সিপাইরা যাবার প্রস্তাব করাতে নানা সাহেব অস্বীকার করে বসলেন। সিপাইরা তখন বলল, 'তাহলে আমাদের সঙ্গে কানপুরে ফিরে চলুন, সেখানে যুদ্ধ করতে হবে। নানা তাতেও আপত্তি জানালেন। কিন্তু সিপাইরা মানল না। আমাদের নিয়েই কানপুরে ফিরে এল।"

[তাঁতীয়া টোপীর ডায়েরী]

ইতিহাসের দিক থেকে তাঁতীয়া টোপীর ডায়েরীর এই অংশটুকু খুবই দামী। যাঁরা মনে করেন কানপুরে বিদ্রোহের নেতা নানা সাহেব, তাঁতীয়া টোপীর ডায়েরী পড়লে এই ভুল আর তাঁদের থাকবে না। পেশোয়ার বংশধর নানা সাহেব তখন সমস্ত হিন্দু মনের আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল, কি মুসলমান কি হিন্দু সমস্ত বিদ্রোহীরাই এ বিষয়ে সচেতন ছিল। কাজেই তারা হুঁশিয়ার হয়ে তাদের নেতাকে সামনে রেখে সঙ্গিনের মুখে ঠেলে নিয়ে চলেছিল, এড়িয়ে যাবার বা পিছিয় পড়বার কোনই সুযোগ দেয় নি।

এ পর্যন্ত বিদ্রোহের ক্ষেত্রে তাঁতীয়া টোপীর-যে বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল তাও

মনে হয় না। নানা সাহাবের অতি বিশ্বস্ত দেহরক্ষক হয়ে তিনি দিন যাপন করছিলেন। কেই বা জানত কি আছে তাঁর মধ্যে, কোন্ ধাতু দিয়ে তিনি তৈরি! বিদ্রোহ ঘুমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে তাঁর কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। বিদ্রোহ এই অনভিজ্ঞ প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ-সন্তানকে শক্তিশালী বৃটিশ ফৌজের বিরুদ্ধে দুর্দম সামরিক অধিনায়কে রূপান্তরিত করল।

কিন্তু তাঁতীয়া টোপীর ডায়েরীর মধ্যে তাঁর এই রূপ কোথাও খুঁজে পাবেন না। নিতান্ত সাদাসিধে সংক্ষিপ্ত কথায় কতগুলো ঘটনার বিবৃতি। এর মধ্যে কোথাও এতটুকু আবেগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই, নিজের গৌরব প্রচারের সামান্য প্রচেষ্টাটুকু নেই। যে তাঁতীয়ার সামরিক প্রতিভার খ্যাতি সেদিন শুধু হিন্দুস্থান নয় সমগ্র ইউরোপময় ছড়িয়ে পড়েছিল, এই ডায়েরীর মধ্যে কোথাও সেই পরিচয় খুঁজে পাবে না। "আমরা হেরে গেলাম" আমরা পালিয়ে গেলাম", "সবগুলো কামান ফেলেই আমরা পালালাম", সমস্ত ডায়েরী জুড়ে বার বার এই একই কথার পুনরাবৃত্তি! তাঁর কোন কৃতিত্বের কথা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দলের পর দল ইংরাজ সৈন্য তাঁকে ধরবার জন্য ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে, কখনও পেছন থেকে, কখনও সামনে থেকে, কখনও বা পাশ থেকে। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ক্রমাগত দশ মাস পর্যন্ত তিনি তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে চলেছেন, একা নয়, হাজার হাজার লোক সঙ্গে নিয়ে। শত্রুপক্ষকে বোকা বানিয়ে কতবার তিনি তাদের হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। একদিকে ইংরাজের ঘোড়সওয়ার আর একদিকে তাঁর পদাতিক বাহিনী, এই দুই দলে দৌড়ের প্রতিযোগিতা চলেছে। একমাত্র দ্রুত অপসারণের যাদুবিদ্যার সাহায্যে এই অসম প্রতিযোগিতায় তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন।

তাঁর রণপ্রতিভার পরিচয় পেতে হলে তাঁর প্রতিপক্ষের কাছেই যাওয়া ভাল। তাঁতীয়ার অদ্ভুত সমরচাতুর্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তখনকার 'টাইমস' পত্রিকা লিখেছিল ঃ

১২৭

"আমাদের বন্ধু তাঁতীয়া কেন্দ্রের পর কেন্দ্র বিধ্বস্ত করে চলেছেন, তোষাখানা লুট করেছেন, অস্ত্রাগার নিঃশেষ করেছেন, ফৌজ সংগ্রহ করেছেন, তাদের হারিয়েছেন, যুদ্ধ জয় করেছেন, যুদ্ধে হেরেছেন, দেশীয় রাজাদের কাছ থেকে কামান কেড়ে নিয়েছেন, তাদের হারিয়েছেন। বিদ্যুতের মত তাঁর গতি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তিনি দিনে ৩০/৪০ মাইল মার্চ করে চলেছেন, নর্মদা নদী পারাপার করেছেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ বাহিনীগুলোর ভেতর দিয়ে পেছন দিয়ে, সমুখ দিয়ে চলে গিয়েছেন। পাহাড়, নদী, গহ্বর, উপত্যকার উপর দিয়ে, জলাভূমির ভেতর দিয়ে, কখনও সামনে, কখনও পেছনে, কখনও পাশ ঘেঁষে আকাঁবাঁকা পথে ছুটে চলেছেন।"

শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত "ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া"র জনৈক ইংরাজ লেখক লিখেছেন ঃ

"তারপর শুরু হোল সেই অদ্ভুত পশ্চাদপসরণের পালা। একটির পর একটি, ক্রমাগত, দশ মাস ধরে এই খেলাই চলেছে। সমস্ত ইউরোপ জুড়ে অধিকাংশ

এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সেনাপতিদের চেয়ে তাঁতীয়ার নাম অনেক বেশী পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর সামনে যে সমস্যাগুলো ছিল তাদের কোনমতেই সহজ বলা চলে না। পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটেছে, তার মধ্যেও এক দল প্রাচ্যদেশীয় সিপাইকে এক সূত্রে বেঁধে রাখতে হচ্ছে। অথচ এই সংহতিকে শক্তিশালী করে তোলবার জন্য আর কোন বন্ধন-ই তো ছিল না। একমাত্র যা ছিল, তা হচ্ছে বৃটিশ জাতির প্রতি ঘৃণা ও বৃটিশের ফাঁসিকাঠ সম্পর্কে আতঙ্ক। এই পাঁচমিশালী ফৌজ কখনও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে নি, তাকে সব সময় ছুটিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। শত্রু কখনও পেছন দিক থেকে তাড়া করে আসছে, কখনও বা বরাবর মধ্যভাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে। একমাত্র গতিবেগের সাহায্যেই শত্রুর এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে হবে। একদিকে এই অর্ধ সংগঠিত ফৌজকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে, সেই সঙ্গে নতুন নতুন শহর দখল করতে হচ্ছে, নতুন রসদ মালপত্র সংগ্রহ করতে হচ্ছে, নতুন কামান যোগাড় করতে হচ্ছে, আর সবার উপরে সৈন্যের দলে নতুন লোক ভর্তি করতে হচ্ছে তাদের মধ্য থেকে, যারা স্বেচ্ছায় যোগ দেবে, যাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ হচ্ছে প্রতিদিন অবিরাম ছুটে চলা। তার হাতে যেটুকু সুযোগ ছিল, তাই দিয়ে তিনি যে-ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় তিনি সামান্য শক্তির অধিকারী ছিলেন না। তাঁর সম্বন্ধে আমরা যতই তাচ্ছিল্য দেখাই না কেন, এ দিক দিয়ে তিনি হায়দর আলীর সমশ্রেণীয় ছিলেন, এ কথা অবশ্যই বলা চলে। তিনি যদি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী নাগপুরের মধ্য দিয়ে মাদ্রাজ পর্যন্ত চলে যেতে পারতেন, তাহলে তিনি হায়দার আলীর মতই দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতেন। নেপোলিয়নের সমুখে যেমন ইংলিশ চ্যানেল, তাঁর সমুখেও নর্মদা তেমনি তাঁর

উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম প্রথম তাঁর ফৌজ বৃটিশ ফৌজের মতই ধীর গতিতে চলত। ক্রমেই তার গতিবেগ বাড়তে লালগ। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ব্রিগেডিয়ার পার্কস বা নেপিয়ারে ফৌজের গতিবেগ তার তুলনায় অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে। গ্রীষ্মের অগ্নিদাহ, বর্ষার অবিরল বর্ষণ, শীতের হিমেল হাওয়া মাথায় বয়ে নিয়ে তিনি চলেছেন, ছুটেই চলেছেন।"

নিশুতি রাত। সমস্ত পৃথিবী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাঁতীয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছেন। তাঁর বন্ধু মানসিং তাঁকে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় দিয়েছেন। আজ আর কোন ভয় নেই। প্রমত্ত শিকারীর দল আজ আর তাঁকে সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে তাড়া করে ছুটবে না। ক্লান্ত অবসর মহারাষ্ট্র শার্দুল আজ তাঁর অরণ্যবাসে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছেন। চুপ, ওঁকে ঘুমোতে দাও। ও-যে বড় ক্লান্ত, অনেকদিন পর একটু শান্তিতে ঘুমিয়েছেন।

এমন সময় নিঃশব্দে চোরের মত কে ওই পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে? রাজা মানসিং না? তাই বটে, তাঁতীয়ার পরম বন্ধু আশ্রয়দাতা মানসিং বটে। পেছনের ওই ছায়ামূর্তিগুলো কারা? কারা ওরা মানসিং-এর পেছন পেছন একজনের পর একজন চুপি চুপি এসে দাঁড়াল স্তব্ধ থমথমে রাত, এতটুকু শব্দ নেই। ঘুমন্ত তাঁতীয়ার নিশ্বাস পতনের শব্দটুকুও শোনা যাচ্ছে না।

রাজা মানসিং অস্ফুট একটু সংকেত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তিগুলো তাঁতীয়ার চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল। শব্দ শুনে তাঁতীয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন, তিনি ইংরাজের হাতে বন্দী। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ৭ই এপ্রিল মধ্য রাত্রিতে তাঁতীয়া বেইমান মানসিং-এর বিশ্বাসঘাতকতার জালে বাঁধা পড়লেন। তার পরদিন সকালবেলা তাঁকে সিপ্রিতে জেনারেল মীডের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোল।

সঙ্গে সঙ্গেই কোর্ট মার্শাল বসল।

বৃটিশ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এই অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়।

বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, এই তিনদিন ধরে তদন্ত চলল। মামলার আগে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে বলা হলে তিনি সংশ্লিষ্ট অফিসারকে বললেন ঃ

"আমি একথা ভালভাবেই জানি, আমি যখন ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, তখন আমাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতেই হবে। আদালত দিয়ে আমার কোনই প্রয়োজন নেই। এ মামলায় আমি কোন অংশ গ্রহণ করতে চাই না।"

শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দু'টি ঊর্ধ্বে তুলে তিনি আবার বললেন ঃ

"আমি এখন শুধু এই আশাই করি যে, কামানের মুখেই হোক বা ফাঁসির দড়িতেই হোক, আমি যেন এ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে পারি। আপনাদের কাছে আমার শুধু এই একটি নিবেদন, গোয়ালিয়রে আমার পরিবারের যাঁরা আছেন, আমার কাজের সঙ্গে তাঁদের কোনই সম্পর্ক ছিল না। আমার কাজের জন্য আমার বুড়ো বাপকে যেন দায়ী হতে না হয়।"

মামলার ফল যা হবার তাই হোল। ১৮ই এপ্রিল অপরাহ্ন ৪টায় ফাঁসির সময় ধার্য করা হোল।

তাঁতীয়া যখন ফাঁসিমঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন, সৈন্যরা চারদিকে ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁতীয়া শেষবারকার মত অনুরোধ জানালেন, তাঁর বাবার উপর যেন কোনরূপ জুলুম করা না হয়।

অভিযোগ ও দন্ডাজ্ঞা যথারীতি পাঠ করা হোল। মিস্ত্রি পায়ের বেড়ী ভেঙ্গে দিল। তাঁতীয়া দৃঢ়পদে ফাঁসির মঞ্চের কাছে এলেন, ধীরভাবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন। রীতি-অনুযায়ী জল্লাদ তাঁর হাত-পা বেঁধে দিতে চাইল। তাঁতীয়া একটু হেসে বললেন, "অত সব অনুষ্ঠানের দরকার কি!" এই বলেই তিনি নিজেই ফাঁসির দড়ির মধ্যে-গলা ঢুকিয়ে দিলেন।

হাজার হাজার লোক সেদিন এই বিদ্রোহী বীরকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেক ইউরোপীয়ানও ছিলেন। ফাঁসির সময় কয়েকজন ইংরাজ মহিলা তাঁর জন্য প্রার্থনা করলেন। জেনারেল মীড ও তাঁর সৈন্যরা স্থানত্যাগ করে চলে গেলে পর কয়েকজন ইংরাজ মহিলা মৃতদেহের কাছে গিয়ে এই মহাপ্রাণের স্মৃতির নিদর্শন হিসেবে তাঁর কেশগুচ্ছ নিয়ে সযত্নে রক্ষা করলেন।

শেষ পর্যন্ত লর্ড ক্যানিং তাঁতীয়ার মৃত্যুদন্ড নাকচ করবার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই আদেশ তাঁর ফাঁসির ছয়দিন পরে এসে পৌঁছল।

অযোধ্যার বেগম

মাত্র দশদিনের মধ্যে অযোধ্যায় বৃটিশ শাসন স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেল; সামান্য চিহ্নটুকুও বাকী রইল না। সৈন্যরা বিদ্রোহ করল, তারই সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার জনসাধারণ এক শো বছরের গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বিদ্রোহীরা একজন নবাব বা নায়কের প্রয়োজন বোধ করছিল, যাকে কেন্দ্র করে তাদের যুদ্ধ ও শাসনকার্য সুসংগঠিত হয়ে উঠবে, যার আহ্বানে ছোট থেকে বড়, ধনী থেকে নিঃস্ব সবাই একই পতাকার নীচে এসে দাঁড়াবে। তারা হুকুমতের একটা প্রতীকচিহ্ন খুঁজে ফিরছিল। সে প্রতীক যদি দুর্বল বা ভঙ্গুরও হয়, তবু সে সময় তার প্রয়োজন ছিল অসামান্য। বৃদ্ধ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ কলকাতার মুচিখোলায় নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। তাঁর শূণ্যস্থান পূরণ করবে কে?

বিদ্রোহীরা শূন্যস্থান পূরণ করবার ব্যবস্থা করল। নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের নাবালক ছেলে ব্রিজিস কাদিরকে তারা সামনে তুলে ধরল। অযোধ্যার জনসাধারণ স্বীকৃতি দিল। এই স্বীকৃতিই সেদিন তাদের কাছে বিরাট শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৬ই আগস্ট তারিখে বিদ্রোহীরা সগৌরবে ঘোষণা করে জানাল, "আমরা আজ আমাদের রাজার অভিষেক করলাম। এতদিনে ফিরিঙ্গীদের শাসন বরবাদ হয়ে গেল।" এই অভিষেক উৎসব সিপাইদের মনে শক্তি সঞ্চার করল। তারা নতুনভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠল।

নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিলেন না। কিন্তু এই অভিষেকের প্রধান শর্ত ছিল এই যে, এই নতুন নবাবকে অর্থাৎ তাঁর উপদেষ্টাদের দিল্লীর বাদশাহের সকল নির্দেশনামা মান্য করে চলতে হবে। কেননা একথা সবাই বুঝতে পারছিলেন যে, বিদ্রোহ সফল হলে সবাইকে একসূত্রে গ্রথিত হতে হবে। প্রধান প্রধান সরকারী পদগুলো মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের মধ্যেই বন্টন করে দেওয়া হোল। কোন কোন পুরনো উজীরকে তাঁদের পূর্বতন পদে বহাল রাখা হয়েছিল। শরফউদ্দৌলাহ্ প্রধান উজীর হলেন। অর্থ দফতরের ভার পড়ল মহারাজ বালকিষণের উপর। মাম্মু খাঁকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। যুদ্ধ বিভাগের উজীর হলেন রাজা জয়লাল সিং। নাবালক ওয়ালীর মা বেগম হযরত মহল তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে সমস্ত কিছু পরিচালিত করবার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

অন্তঃপুরের কালো পর্দা টেনে ছিঁড়ে ফেলে সামনে এগিয়ে এলেন অযোধ্যার বেগম –বেগম হযরত মহল। বিচিত্র এক চরিত্র! এ আগুন এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল!

বিদ্রোহ এক অদ্ভুত যাদুকর, অঘটন ঘটাতে সিদ্ধহস্ত। আপাত-দৃষ্টিতে যা সম্ভাবনার অতীত, তার হাতের ছোঁয়ায় সেই অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে। যে দেশের নারী মানুষের অধিকার ও মানুষের মর্যাদা পায়নি, যে দেশের গোপন অন্তঃপুরচারিণীরা

বাইরের আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত, সেই দেশের মেয়েদের মধ্যে এ কি এক অনির্বাণ আগুন জ্বলে উঠল। এরই নাম বিদ্রোহ। এরই নাম বিপ্লব।

একদিকে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ আর একদিকে অযোধ্যার নারী বেগম হযরত মহল। দু'টি জ্বলন্ত অগ্নিকুসুম! একজন যুদ্ধ করতে করতে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন, আর একজন স্বদেশ ও স্বজন থেকে দূরে গুর্খাদের দেশে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করলেন।

বেগম হযরত মহল কখনও অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নামেন নি। মাত্র একবার সৈন্যদের উৎসাহিত করে তোলবার জন্য যুদ্ধের সময় তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু যে কঠিন দায়িত্ব তাঁকে বহন করে চলতে হয়েছিল, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। দিল্লীর পতনের পর লক্ষ্মৌ শহর তার জায়গা দখল করল, বিদ্রোহীদের প্রতিরোধের মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হিন্দু ও মুসলমান নেতারা ও হাজার হাজার সিপাই এখানে এসে জড় হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল, সবাই একই উদ্দেশ্য নিয়ে বা একই রকমের চিন্তা

নিয়ে বিদ্রোহে যোগ দেননি, নীতিগত ও কৌশলগত মতভেদ ছিল, ব্যক্তিগত মান-অভিমানের প্রশ্ন ছিল, ঈর্ষা-বিদ্বেষ ছিল, আর সর্বোপরি ছিল আমাদের সর্বনাশা দলাদলির প্রবৃত্তি, যা বিদ্রোহের ভাঙ্গনের মুখে চরম সংকটের সময় সবচেয়ে বেশী প্রকট হয়ে দাঁড়ায়।

বিদ্রোহের প্রধান দুর্বলতা ছিল এইখানেই। এই দুর্বলতাই দিল্লীর পতনকে ডেকে আনল। এরই ফলে প্রচুর সুযোগ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্মৌর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল। এই ভাঙ্গনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে বিদ্রোহীদের মধ্য থেকে এমন শক্তিশালী নেতৃত্ব বেরিয়ে আসতে পারে নি। অযোধ্যার বেগমের পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু একথা স্মরণ রাখতেই হবে যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অক্লান্ত প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলোর যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে চলেছিল।

তাই সাংবাদিক রামেল সাহেব বলেছেন ঃ

অযোধ্যার বেগম অদ্ভুত উদ্যম ও যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন। সমস্ত অযোধ্যাকে তিনি উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা প্রকাশিত হবার পর বিদ্রোহী নেতাদের বিভিন্ন জনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কিন্তু বৃটিশের প্রতিশ্রুতির উপর অযোধ্যার বেগমের এক বিন্দু আস্থা ছিল না। মর্মে মর্মে তিনি তাদের অবিশ্বাস করতেন।

প্রাণ বাঁচাবার জন্য, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার জন্য, শত্রুর কাছে নতজানু হয়ে আত্মসমর্পণ করতে তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁকে সসম্মানে, ভারতে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, তেজস্বিনী অযোধ্যার বেগম সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন না। নির্বান্ধব ও সহানুভূতিহীন গুর্খাদের মধ্যে তাঁর শেষ জীবন কাটিয়ে দিলেন। ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁর জন্য একটা পেনসনের ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি তা' প্রত্যাখ্যান করলেন। শত্রুর অনুগ্রহের প্রত্যাশী হয়ে বেঁচে থাকবার বিড়ম্বনা তাঁর সইল না। স্বাধীন অযোধ্যার স্বাধীনচেতা বেগম শেষ পর্যন্ত তাঁর আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন। সেই জন্যেই তাঁর কথা স্মরণ করে জাতি আজ পরম গর্ব ও গৌরব বোধ করে।

নাজিম মহম্মদ হাসান

অযোধ্যার শাসনভার কোম্পানীর দখলে চলে যাবার আগে নাজিম মহম্মদ হাসান ছিলেন অযোধ্যার অন্তগর্ত গোরখপুরের নাযিম বা গভর্নর। বিদ্রোহের সময় সমস্ত অযোধ্যা রাজ্য বিদ্রোহীদের হাতে চলে আসে। সেই সময় মহম্মদ হাসান আবার তাঁর পূর্ব পদে বহাল হন। বিদ্রোহ যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে এল, অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের মত মহম্মদ হাসানও বিতাড়িত পশুর মত স্থান থেকে স্থানান্তরে পালিয়ে পালিয়ে ফিরছিলেন। এই সময় মহারানী ভিক্টোরিয়ার শান্তিসূচক ঘোষণাবাণী প্রকাশিত হয়। গোরখপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খায়েরউদ্দীন আহমদ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মহম্মদ হাসানকে আত্মসমর্পণ করবার জন্য পরামর্শ দিয়ে চিঠি লেখেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের মধ্যে দু'বার পত্র-বিনিময় হয়। এই চিঠির মধ্য দিয়ে নাজিম মহম্মদ হাসানের নির্ভীক ও তেজস্বী চরিত্রটি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বর্ণনা করে বোঝাতে হবে না চিঠিগুলো নিজেরাই কথা বলবে। চিঠিগুলো থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি উপস্থিত করা হচ্ছে।

খায়েরউদ্দীন থেকে মহম্মদ হাসানের কাছে তারিখ ১৩ই নভেম্বর, ১৮৫৮

"বৃটিশ গভর্নমেণ্ট খুবই শক্তিশালী। গভর্নমেণ্ট বহু বিদ্রোহীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, এখন তাদের ক্ষমা করতে চান। হিন্দুস্থানের গভর্নমেণ্ট চান যে, বিদ্রোহীরা যেন তাদের ভুল পথ ত্যাগ করে, কেন না এই পথ তাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। এই মাসে প্রকাশিত মহারানীর ঘোষণাপত্র এই সঙ্গে আপনাকে পাঠালাম। এই ঘোষণা পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন যে, যারা কোন বৃটিশ অফিসার বা বৃটিশ প্রজার হত্যার অপরাধে অপরাধী, কেবলমাত্র তাদেরই শাস্তি দেওয়া হবে। যে-সমস্ত বিদ্রোহী

নেতারা এই ধরনের কোন অপরাধ করেন নি তাঁদের প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই। বৃটিশ অফিসারদের বাঁচাবার জন্য যদি তাঁরা কোন চেষ্টা করে থাকেন, তা হলে সে সম্বন্ধেও বিবেচনা করে দেখা হবে। এ অবস্থায় এখনো বিদ্রোহীদের সঙ্গে পড়ে থাকা বৃথা। এতে আপনার কোন সুবিধাই হবে না। এখনও যদি আপনি ধরা না দেন শেষ পর্যন্ত আপনাকে ধরা পড়তে বা নিহত হতেই হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমি বলি কি আপনি চলে আসুন, হয় আমার কাছে, নয়তো আপনি যাকে

ভাল মনে করেন এমন যে কোন বৃটিশ অফিসারের কাছে আত্মসমর্পণ করুন। আমি জানি, আপনি কোন বৃটিশ অফিসার বা বৃটিশ প্রজাকে হত্যা করেন নি। এই ধরনের অপরাধ সম্পর্কে আপনার উপর কারু মনে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আপনি যদি মার্জনা লাভের এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে চান, তা হলে এই সঙ্গে গোন্ডার রাজা, অন্যান্য বিদ্রোহী সর্দার ও সিপাইদের আত্মসমর্পণ করতে বলবেন।"

মহম্মদ হাসান থেকে খায়েরউদ্দীনের কাছে

"আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি ও সেই সঙ্গে মহারানীর ঘোষণার একটি নকল পেয়েছি। আপনার চিঠির মধ্যে আমার নির্দোষিতার সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়েছে। এজন্য আমি বিশেষ আনন্দিত, কারণ আমি কখনও কোন বৃটিশ অফিসার বা বৃটিশ প্রজাকে হত্যা করি নি, যদিও আমি জানি ইউরোপীয় অফিসার ও তাদের সৈন্যরা হাজার হাজার নির্দোষ ও নিতান্ত সাধারণ মানুষ, এমন কি স্ত্রীলোক, অন্ধ, ফকীর ও সন্যাসীদের পর্যন্ত নির্বিচারে হত্যা করেছে, তাদের আবাসগৃহ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে এবং তাদের সম্পত্তি লুট করে নিয়েছে। মহারানীর ঘোষণা-অনুসারে এই সমস্ত হত্যার অপরাধে যারা অপরাধী তারা নিশ্চয়ই শাস্তির যোগ্য। সিপাইদের বিদ্রোহ যখন শুরু হয়ে গেল এবং তারা যখন নির্দয়ভাবে অফিসারদের হত্যা করতে লাগল, সেই সময় যারা ইউরোপীয়দের সাহায্য করতে এগিয়ে গেছে, তাদেরও অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে এবং তাদের সম্পত্তি লুটপাট বা বিধ্বস্ত হয়েছে।

সেই দুঃসময়ের মধ্যে যারা ইউরোপীয়দের প্রাণ রক্ষা করতে এগিয়ে গিয়েছিল আমি তাদেরই একজন। আমি তখন ভয় ভাবনা ছেড়ে আমার অনুচরদের দিয়ে দু'জন কর্নেল এবং তাদের একজনের স্ত্রী ও মেয়েকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করেছিলাম আমার নিজের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য তাদের সাদরে রেখেছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত তাদের গোরখপুরের কর্তৃপক্ষের কাছে নিরাপদে পৌছে দিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে আমার রাজার নির্দেশে এবং খোদার মদদে আমি যখন গোরখপুর পুনরুদ্ধার করে অযোধ্যা রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিলাম (গোরখপুর আগে অযোধ্যা রাজ্যেরই অংশ ছিল), তখনও আমার অধীন দেশীয় অফিসারদের লুটপাট ও হত্যাকান্ড থেকে নিবৃত্ত

করেছি এবং কয়েকজন খ্রীস্টানকে বিপদ থেকে রক্ষা করে তাদের সুস্থদেহে ও নিরাপদে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি। কাজেই আমার বিবেচনায় এ-সম্পর্কে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসা অনুমোদন লাভের অধিকার আমার আছে।

বৃটিশ গভর্নমেন্ট অত্যন্ত শক্তিশালী, এই গভর্নমেন্ট বহু বিদ্রোহীর সংহার সাধন করেছেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে থাকলে আমার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে

ইত্যাদি বলে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছেন! আমি এ সমস্ত কথার সত্যতা পুরোপুরি স্বীকার করি। কিন্তু একটা কথা জানবেন, সর্বশক্তিমান খোদাহ্ যাঁর অপর নাম হচ্ছে আল কাদির (শক্তিশালী) ও আল হাফিজ (রক্ষক) তিনি সব কিছুই করতে পারেন। শত্রু যদি শক্তিশালী হয়, তিনি তার চাইতেও শক্তিশালী। যদি তাঁর অভিরুচি হয় তবে তিনি প্রবলকে দুর্বল ও দুর্বলকে প্রবল করে তোলেন। তিনি আপনার ইচ্ছা-অনুযায়ী কাউকে উচ্চে তোলেন, কাউকে বা রসাতলে নামিয়ে দেন। এই দুর্যোগের দিনে একথা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। খোদাহ্‌র হুকুম ছাড়া কেউ হত্যা করতে পারে না, আগুন দিয়ে পোড়াতেও পারে না। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের যদি খোদাহ্‌র মতই ক্ষমতা থাকত তা হলে সিপাইদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাকামনা চরিতার্থ করবার জন্য হিন্দুস্থানের প্রতিটি অধিবাসীকে হত্যা করা হত।

যে লোক তার যুদ্ধের পথকে ধর্মবিশ্বাস-রূপে গ্রহণ করে সে প্রথমত আপনাকে নিহত বলেই কল্পনা করে নেয়। কাজেই গ্রেফতার বা মৃত্যু-সম্পর্কে এতটুকু ভয় আমার মনে নেই। আপনি ও আপনার মতই অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা গর্ভনমেণ্টের পক্ষে থেকে জেহাদের মতই দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করে ঐহিক জগতের সুযোগ-সুবিধা ও সমৃদ্ধি লাভ করতে চান। ঠিক তেমিন আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যদি আমার স্বধর্ম ও রাজার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ দিই, তা হলে তা আমার ইহজীবন ও পরজীবন উভয়ের পক্ষেই হিতকর হবে।

এই ঘোষণার যে অংশে মার্জনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেখানকার ভাষা কিছু অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। এর মধ্যে এমন কোন কথা নেই যার উপরে নির্ভর করে মার্জনা-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। যেমন ধরুন না, ঘোষণায় বলা হয়েছে, এই বিদ্রোহের সময় সাধারণভাবে যে সমস্ত লোক রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিমূলক কাজ করেছে, কতগুলো বিশেষ শর্তে তাদের ক্ষমা করা হবে। এখন ভেবে দেখুন, যে সমস্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সবগুলোই রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিমূলক। তাদের সবগুলোকেই এখানে একই শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। তা ছাড়া 'সাধারণভাব' কথাটির ব্যবহার করবার ফলে এবং শর্তগুলো সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কোন উল্লেখ না থাকার ফলে মানুষের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে তুলবেই।

১৩৫

হিন্দুস্থানের ইংরাজ শাসকেরা দেশীয় রাজাদের সঙ্গে যে-সমস্ত চুক্তি করেছিলেন, সেগুলো প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং চুক্তির যে সমস্ত শর্ত অলঙ্ঘনীয় হওয়া উচিত ছিল, সেগুলো লঙ্ঘন করেছেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবার ব্যাপারে ইংরাজরা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। লাহোরের রাজা, পেশোয়া ও অন্যান্য বহু রাজার সঙ্গে তাদের যে-সমস্ত চুক্তি হয়েছিল, সেগুলোর কি দশা হয়েছে ভেবে দেখুন।

গভর্নমেণ্টের এই জুলুমে উত্তেজিত ও মরিয়া হয়ে হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণ সিপাইদের বিদ্রোহের সুযোগ পেয়ে এই বিদ্রোহে সামিল হয়ে গেল। ফলে খোদাহ্‌র হাজার হাজার নির্দোষ বান্দাহ্ নিহত ও লুণ্ঠিত হতে লাগল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করে দিল। মহারানী যদি এখনও ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করেন, অযোধ্যার রাজাকে যদি তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন, তাহলে সমস্ত অশান্তি ও হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে যাবে। মহারানীর ঘোষণা থেকে এ আভাসটুকু পাওয়া যায়, এ

অভিপ্রায় যেন তাঁরও আছে। মহারানী যদি হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের অবস্থার প্রতি করুণা পরবশ হয়ে হত্যার স্রোত বন্ধ করবার জন্য অথবা ন্যায়পরায়ণতার খাতিরেই আমাদের রাজাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন তাহলে সমস্ত হাঙ্গামা থেমে যাবে, দেশময় শান্তি ফিরে আসবে।

কাজেই আমার অনুরোধ, আপনি আমার এই চিঠিটা গভর্নর জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি যদি ঘোষণার শর্তগুলো পূর্ণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, অযোধ্যার উপর উপদ্রব করা থেকে বিরত থাকেন এবং সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে যে সব শর্তে চুক্তি করা হয়েছিল পুনরায় সে সব শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে রাজী থাকেন, তাহলে ঘোষণার অন্যান্য দিকগুলো যাতে আন্তরিকতার সঙ্গে কর্যকার করা হয় সে বিষয়ে আমি উকিল হিসেবে কাজ করব। দ্রুত উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম।"

খায়েরউদ্দীনের মত রাজভক্ত কর্মচারীর পক্ষে এ রকম চিঠি হজম করা কঠিন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? ইংরাজ সৈন্যরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সহস্র সহস্র নির্দোষ লোককে হত্যা করেছে, তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে, একজন রাজভক্ত কর্মচারী হয়ে তিনি এমন কথা কি করে সহ্য করেন। তিনি তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ করলেন। অথচ ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা, এমনকি এই সমস্ত অপরাধের অনুষ্ঠাতা যাঁরা, তাঁরাও কিন্তু একথা অস্বীকার করেন নি। অযোধ্যা রাজ্য সম্পর্কে মহম্মদ হাসান যে দাবি করেছিলেন, সে সম্বন্ধে খায়েরউদ্দিন লিখলেন, 'অযোধ্যা রাজ্য সম্পর্কে আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন এবং যার ফলাফলের উপর আপনার আত্মসমর্পণ নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন, সেই প্রস্তাবের কোন মানেই হয় না। গভর্ণমেণ্ট যা একবার দখল করে নিয়েছেন, তার একবিঘা জমিও ফিরিয়ে দেবেন না। আর এসব নিয়ে আপনিই বা

মাথা ঘামাতে আসেন কেন ? নিজের সম্পর্কে যা বলবার থাকে বলুন, কিন্তু রাষ্ট্রসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কথা বলবেন না। এক কথায় আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, যদি আপনি আপনার প্রাণ বাঁচাতে চান তবে আপনাকে অবিলম্বে আত্মসমপর্ণ করতে হবে।'

তার এত বড় শাসানীতেও কোন ফল হোল না। নাজিম মহম্মদ হাসান তাঁর সংকল্পে দৃঢ় রইলেন। খায়েরউদ্দীনের আমলাতান্ত্রিক ধমকের জবাবে শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় লিখেছেন যে, তিনি তাঁর জীবনের জন্য বিদ্রোহীদের শক্তির উপর তিলমাত্র নির্ভর করেন না।

"সর্বশক্তিমান খোদাহ্‌র উপর আমার একান্ত নির্ভর। তিনি যদি আমাকে রক্ষা করেন, কোন দুশমনের শক্তি নেই যে আমার ক্ষতি করে। আর তিনি যদি মুখ ফেরান, কোন শক্তিই আমার কোন কাজে আসবে না।"ঃ

"যে-গভর্নমেন্ট মানুষের উপর সকল রকমের অত্যাচার চালিয়ে আসছে, কর্নেল লেক (লেনক্স) ও দু'টি মহিলার প্রাণ রক্ষা করেছিলাম বলে সে গভর্নমেণ্টের কাছে কোন কিছু আশা করতে যাওয়া আমার পক্ষে নির্বুদ্ধিতা মাত্র।"

"যদি আমি আমার জীবন ও পার্থিব সম্পদকে আমার ধর্মের চেয়েও বড় করে দেখতাম , তা হলে আমি অবশ্যই আপনার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতাম।"

"আমি বালারাও বা নানার ভৃত্য নই, আমি তাঁদের কানপুরের শিবিরে যাইও নি

কখনো। কাজেই ইংরাজ মহিলা ও শিশুদের উপরে যে জঘণ্য অপরাধের কাজ করা হয়েছিল, তার দায়িত্ব আমার উপরে কখনোই এসে পড়ে না।"

"আমার বিবেচনায় এ অবস্থায় আত্মসমর্পণ করা আমার পক্ষে শুধু যে বৈধ হবে না তা নয়, একটা মারাত্মক অপরাধের কাজও হবে। এ ছাড়া আর যে সমস্ত কথা আপনি লিখেছেন, তার উত্তর দিতে গেলে বৃথা তিক্ত আলোচনার সৃষ্টি হবে মাত্র। কাজেই এই পর্যন্তই যথেষ্ট।"

পরে মহম্মদ হাসান তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। অনেকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু গোরখপুরের কমিশনার মিঃ উইংফিল্ড তাঁর উপর বেজায় খাপ্পা ছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁর ইঙ্গিতেই খায়েরুদ্দীন মহম্মদ হাসানের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। তার উত্তরে মহম্মদ হাসান যে কড়া জবাব দিয়েছিলেন, তার তাতটা মিঃ উইংফিল্ডের গায়ে ভাল মতই লেগেছিল। তাইতেই তিনি এতটা চটে গিয়েছিলেন। মহম্মদ হাসান সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে আত্মসমর্পণ করবার পর মিঃ উইংফিল্ড স্যার হোর গ্রান্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন যে, তিনি নাকি এই বিদ্রোহী নেতাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। তা ছাড়া মিঃ

পেপী নামক জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোকের হত্যার জন্য তিনি মহম্মদ হাসানকে দায়ী করলেন। মহম্মদ হাসানের ভাগ্যের জোরে মিঃ পেপীকে জীবিত অবস্থাতেই পাওয়া গিয়েছিল।

গভর্নমেণ্ট মহম্মদ হাসানকে সীতাপুর জেলায় বাস করবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

যবনিকা পতন

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগ। বিদ্রোহ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। এই ভাঙ্গনকে রোধ করবার শক্তি কারো নেই। বিদ্রোহের নেতারা আক্রমণের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে এখন মাথা বাঁচাবার আশ্রয় খুঁজে ফিরছেন। ঘাঁটির পর ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে চলছেন উত্তরে, আরও উত্তরে।

স্যার কলিন ক্যাম্পবেল পেছন পেছন তাড়া করে চলেছেন, কোথাও তাঁদের স্থির হয়ে বসবার সুযোগ দিচ্ছে না। স্যার কলিন অযোধ্যার রাজপুত প্রধানদের ঘাঁটিগুলোকে একটির পর একটি হস্তগত করে চললেন। প্রথমে রামপুর কাসিয়া, তারপর আমেথি। কোন জায়গাতেই বিশেষ বেগ পেতে হয় নি, সহজেই তারা আত্মসমর্পণ করল।

স্যার কলিনের এবার দৃষ্টি পড়ল শঙ্করপুরের দিকে। এখানে বৈসওয়ার রাজপুতদের বীর নেতা বেণী মাধ্যো অনেকদিন ধরেই তাঁদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িছিলেন। বিদ্রোহ ভাঙ্গনের মুখে, কিন্তু সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বেণী মাধ্যো কোনদিন ভেঙ্গে পড়েন নি।

স্যার কলিন প্রথমত আপসের মধ্য দিয়ে তাঁর এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে বশে আনবার চেষ্টা করে দেখলেন। তিনি বেণী মাধ্যের কাছে খবর দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি যদি এখনও বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করেন, তাহলে তাঁকে কোন শাস্তি দেওয়া তো হবেই না, বরঞ্চ যে-সম্পত্তি তিনি এখনও ভোগ করছেন, এই সম্পত্তির মালিকানা তাঁরই হাতে থাকবে। বেণী মাধ্যো অন্য ধাতুর লোক, তাঁকে ভেঙ্গে ফেলা যায়, কিন্তু নোয়ানো যায় না। এই প্রস্তাবের উত্তরে তিনি জানালেন, "আমার শরীর আমার নিজের সম্পত্তি নয়—এর মালিক অযোধ্যার রাজা। কাজেই এ শরীর আর কাউকে সমর্পণ করবার অধিকারী আমি নই। তবে এই কেল্লাটা আমার নিজের সম্পত্তি এটা আমি আপনার হাতে সমর্পণ করতে পারি।"

বেণী মাধ্যো বুঝতে পেরেছিলেন, এই কেল্লায় বসে স্যার কলিনের আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখা কোন মতেই সম্ভব হবে না। কাজেই তিনি গোপনে রাত্রির অন্ধকারে কেল্লা ত্যাগ করলেন। ব্রিগেডিয়ার এভেলেঘকে তাঁর পেছনে ধাওয়া করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হোল। কিন্তু কার পেছনে তিনি ধাওয়া করবেন? কোথায় বেণী মাধ্যো? সাংবাদিক রাসেল সাহেব এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বেণী মাধ্যোকে খুঁজে বের করতে হবে, আপাত এইটাই সমস্যা। আমাদের গুপ্তচর বিভাগ থেকে আমরা 'সুনিশ্চিত' সংবাদ পাচ্ছি যে, বেণী মাধ্যো একই দিনের একই সময়ে নানা দিকে নানা জায়গায় অবস্থান করছেণ। এই রিপোর্টগুলো যাচাই করে দেখতে হলে

একত্রিশটি বাহিনীকে একত্রিশ দিকে পাঠাতে হয়।"

অবশেষে তাঁর সঠিক ঠিকানা পাওয়া গেল। ২৪-এ নভেম্বর দু'পক্ষের মধ্যে একটা যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীরা পরাজিত হোল, কিন্তু বেণী মাধ্যোকে ধরতে পারা গেল না। সেই-যে তিনি তাঁর জন্মভূমি ত্যাগ করলেন, আর কোনদিন সেখানে ফিরে আসতে পারেন নি। ৪ঠা ডিসেম্বর একটা সংবাদ পাওয়া গেল যে, বেণী মাধ্যো নাকি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। কেবলমাত্র ৫০০০ সৈন্য দলে দলে বিভক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। এর পর বেণী মাধ্যো অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হবার জন্য উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

স্যর কলিনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবার সফল হতে চলল। এই পরিকল্পনা-অনুসারে বেণী মাধ্যো, দেববকস, মহম্মদ হাসান, মেহদী হাসান, অমর সিং, খান বাহাদুর খাঁ, বেগম হযরত মহল, মাম্মু খাঁ, নানা সাহেব, বালা সাহেব, জওয়ালা প্রসাদ প্রমুখ বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট নেতাদের নিজ নিজ এলাকা থেকে বিতাড়িত করে একই বেড়াজালের মধ্যে ফেলে নেপালের সীমান্তে একটি সংকীর্ণ জায়গা নিয়ে এসে ঘেরাও করে ফেলা হোল। এখন জঙ্গ বাহাদুরের এলাকায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই বাকী কাজটা শেষ হয়ে যায়।

বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে একজন কিন্তু এই ফাঁদে আটকা পড়তে রাজী হলেন না। তিনি হচ্ছেন শাহজাদা ফিরোজ শাহ্। দু'হজার সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিছিয়ে এলেন। তারপর গঙ্গা পাড়ি দিয়ে এটোয়ায় গিয়ে উঠলেন। ব্রিগেডিয়ার ট্রপ ও ব্রিগেডিয়ার মার্কার অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে আটকাতে পারলেন না। এর পরেই ফিরোজ শাহ্ রা ও সাহেবও তাঁতীয়া টোপীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন।

এই সময় কমিশনার মেজর ব্যারো মহারানীর ঘোষণা অনুযায়ী আত্মসমর্পণের জন্য বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে মধ্যস্থ মারফত কিছু কিছু আলাপ আলোচনা চালান। এমন কি স্বয়ং বেগম হযরত মহল ও ব্রিজিস কাদির মেজর ব্যারোর কাছে এ

সম্পর্কে চিঠি ও লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আলোচনায় কোনই ফল হোল না। বৃটিশের আন্তরিকতা সম্পর্কে বেগমের মনে এতটুকু বিশ্বাস ছিল না। আর বেগম যতক্ষণ রাজী না হবেন ততক্ষণ রাজভক্ত বেণী মাধ্যোর রাজী হবার প্রশ্নই ওঠে না। মাম্মু খাঁ স্বতন্ত্র কোন সিদ্ধান্ত নিলেন না। নানা সাহেব জানালেন যে, তিনি তাঁর জীবনের নিরাপত্তা-সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চয়তা না পেলে ধরা দেবেন না।

আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার পর স্যার কলিন আবার বিদ্রোহীদের পেছনে ছুটলেন। বারোরদিয়াতে বেণী মাধ্যোর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বেণী মাধ্যো কিছুটা পিছিয়ে গেলেন। স্যার কলিন নানপারায় এসে জানতে পারলেন যে, নানা ও বেণী মাধ্যো সেখান থেকে ২০ মাইল দূরে বাঁকিতে আছেন। বাঁকি রাপ্তি নদীর ধারে। তিনি স্থির করলেন সারারাত্রি মার্চ করে অতর্কিতে তাঁদের উপর গিয়ে পড়বেন। কিন্তু খবরটা বিদ্রোহীদের কানে পৌছে গিয়েছিল। নানা নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেলেন। বিদ্রোহী বাহিনী তাঁর অনুসরণ না করে স্যার কলিনকে প্রতিরোধ করে দাঁড়াল। স্যার কলিন বিদ্রোহীদের নেপালের এলাকায় ঠেলে দিয়ে

১৮ই জানুয়ারী তারিখে লক্ষ্ণৌ শহরে ফিরে এলেন।

বাঁকির যুদ্ধের পর কয়েকজন বিশিষ্ট বিদ্রোহী নেতা আত্মসমর্পণ করলেন। সাংবাদিক রাসেল সাহেব লিখেছেন ঃ

"৭ই তারিখে সকালবেলা আমরা রওয়ানা হবার আগেই ফরাক্কাবাদের নবাব তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে রাপ্তি নদী পার হয়ে এসে মেজর ব্যারোর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। মেহদি হোসেন এবং আরও কয়েকজন বিখ্যাত বিদ্রোহী নেতা এই সময় ধরা দিলেন। এই লোকগুলো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আমাদের সঙ্গে লড়াই করছিল, আর এখন কেমন দিব্যি সহজ স্বাভাবিকভাবে অতি স্বচ্ছন্দচিত্তে স্পেশাল কমিশনের তাঁবুতে বসে আছে যেন কিছুই হয় নি। চিত্তাকর্ষক দৃশ্যই বটে!"

প্রধান প্রধান বিদ্রোহী নেতারা এবার নেপালের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। নেপালের প্রধানমন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর প্রথম থেকেই প্রকাশ্যে বৃটিশের পক্ষে যোগ দিয়ে এসেছেন, তবু তাঁর সম্পর্কে নেতাদের মনে কেন যে মোহ ছিল বোঝা খুবই কঠিন! তাঁদের মনে মনে বিশ্বাস ছিল বিপদের দিনে তাঁর কাছে আশ্রয় মিলবেই। তাই দেখতে পাই, অনেকদিনে আগে থেকেই ব্রিজিস কাদির, তাঁর প্রতিনিধিগণ ও নানা সাহেব তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি করে আসছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ১৯-এ মে ব্রিজিস কাদির তাঁর কাছে লিখেছেন ঃ "কিছুদিন আগে বৃটিশ সরকার আমাদের গরু ও শূয়োরের চর্বি-মাখানো টোটা দাঁতে কাটতে আদেশ দিয়ে আমাদের হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করতে চেয়েছিল। সিপাইরা এ কাজ করতে

অস্বীকার করবার অপরাধে তাদের কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হোল। এই হচ্ছে যুদ্ধ বাধবার কারণ।"

কিন্তু এসব ধর্মীয় যুক্তিতে বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন জঙ্গ বাহাদুরকে টলানো গেল না। তিনি সকল ধর্মের সেরা ধর্ম চিনেছিলেন, তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বৃটিশের সেবা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ১৫ই জানুয়ারী তিনি বেগমকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন, "এটা জেনে রাখবেন যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ও নেপাল রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার সম্পর্ক রয়েছে এবং এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এই চুক্তি বলবৎ আছে যে, এক রাষ্ট্রের শত্রু অন্য রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে তাকে ধরে পূর্বোক্ত দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই আমি আপনাদের লিখে জানাচ্ছি, যদি আপনারা আমার রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকেন তবে পূর্বোক্ত চুক্তি মোতাবেক গুর্খা সৈন্যরা নিশ্চয়ই আপনাদের উপর আক্রমণ করবে। আরও জেনে রাখুন, যারা নিমকহারামী করে অবিশ্বাসী ও কৃতঘ্নের মত প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, নেপাল রাষ্ট্র তাদের কোনরূপ সাহায্য বা আশ্রয় দেবে না।

কিন্তু নেপাল গভর্নমেণ্ট এঁদের নিয়ে উভয়সংকটে পড়ে গিয়েছিল। ইংরাজের মনস্তুষ্টি সাধন করে তাকে চলতে হবে, কাজেই তার শত্রুকে আশ্রয় দেওয়া কোনমতেই চলে না, অন্যদিকে রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রার্থীদের ধরিয়ে দেওয়াটা রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পক্ষে হানিকর। এ অবস্থায় বুঝিয়ে বা ভয় দেখিয়ে বিদায় করতে পারলেই ভাল। তা যদি সম্ভব না হয়, তবে অগত্যা বলপ্রয়োগ করতেই হবে।

বিদ্রোহীরা সংখ্যায় কত ছিল সঠিক বলা যায় না। চার হাজার থেকে পঁচিশ হাজার পর্যন্ত শোনা গেছে। এই হতভাগ্য পলাতকের দল চিতওয়ান, ভুটওয়াল এবং

নয়াকোটের মধ্যে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে ঘুরে ঘুরে মরছিল। অসহ্য দুর্দশা ও অভাবের মধ্য দিয়ে তাদের দিন কাটছিল। কোন কোন সিপাই খাদ্যের জন্য তাদের বন্দুক বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে। গুর্খারা তাদের কাছে চাল বিক্রি করতে আপত্তি করত না, কিন্তু ভীষণ চড়া দাম আদায় করত। জ্বর ও আমাশয় রোগে ভুগে বহু লোক মারা পড়তে লাগল, তেমনি মরতে লাগল অনাহারে।

নেপাল গর্ভনমেন্ট এবার স্বমূর্তি ধারণ করলেন। তাঁর সৈন্যরা এই অবাঞ্ছিত মেহমানদের ধরে ধরে নেপাল থেকে বহিষ্কার করতে লাগল। শঙ্করপুরের বীর নেতা বেণী মাধ্যো গুর্খা সৈন্যদের হাতে ধরা দিতে রাজী হলেন না। দঙ্গ উপত্যকায় গুর্খা সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তিনি প্রাণ দিলেন। তাঁর সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই এই যুদ্ধে মারা যায়। বেণী মাধ্যোর ভাই যোগরাজ সিংও এই যুদ্ধে নিহত হন। বেণী মাধ্যোর বিধবা স্ত্রী ও ছেলে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত নেপালেই ছিলেন। বেণী মাধ্যোর মৃত্যুর সময় ছেলেটির বয়স ছিল তেরো কি চৌদ্দ। পরে

তাকে সীতাপুরে নিয়ে আসা হোল। নবাব মাম্মু খাঁ, খান বাহাদুর খান, জওয়ালাপ্রসাদ এবং আরও বহু বিদ্রোহীকে নেপাল গভর্নমেণ্ট বৃটিশ কতৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করেন। গোণ্ডার রাজা দেবী ককস, খয়রাবাদের চাকলাদার হরপ্রসাদ, বিস্ওয়োর গোলাব সিং নেপালেই মারা যান। কিভাবে মারা যান, জানা যায় নি। বুঁদীর হরদৎ সিংকে হত্যা করা হয়েছিল। আজিমুল্লাহ্ খাঁ অক্টোবর মাসে ভুটওয়ালে মারা যান। ম্যালেরিয়াতে বালা সাহবের মৃত্যু হয়। নানা সাহেবের মৃত্যুসংবাদ না পাওয়া গেলেও, মনে হয় তিনিও এই রোগেই মারা গিয়েছিলেন।

বেগম হযরত মহল তাঁর ছেলেকে নিয়ে গুর্খাদের দেশেই থেকে গেলেন। তাঁর স্বামীকে, যে-পেনসন দেওয়া হোত, তা ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে তাঁকে একটা পেনসন দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে সসম্মানে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ফিরে আসতে কিছুতেই রাজী হলেন না। বৃটিশ গভর্নমেন্ট-যে পেনসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

খান বাহাদুর খান ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের হত্যার অভিযোগ ছিল। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মে তারিখে সতীচওড়ার ঘাটে জওয়ালাপ্রসাদকে ফাঁসিতে ঝুলানো হোল। বখত খাঁ দিল্লী ছেড়ে লক্ষ্মৌ পর্যন্ত এসেছিলেন। তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। শুধু এইটুকুই জানা গেছে যে, তিনি ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মে যুদ্ধে মারা যান।

বাকী রইলেন তাঁতীয়া টোপী, রাও সাহেব আর ফিরোজ শাহ্। তাঁতীয়ার ফাঁসির কথা আগেই বলা হয়েছে।

রাও সাহেব যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে সন্ন্যাসীর বেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি সিরোন্‌জ থেকে উজ্জয়িনী, উজ্জয়িনী থেকে উদয়পুরে এলেন। এখানে তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। তাঁকে নিয়ে তিনি দিল্লী গেলেন। সেখান থেকে থানেশ্বর, জ্বালামুখী ও কাংড়া হয়ে জম্মুর অন্তগর্ত চেনানিতে এসে বাসা বেঁধে ছিলেন। এখানে একজন মারাঠি তাঁকে ধরিয়ে দেয়। পাণ্ডুরঙ্গ সদাশিব ওরফে রাও সাহেবকে ফাঁসিতে ঝুলানো হোল।

দিল্লীর শাহজাদাদের মধ্যে ফিরোজ শাহ্ই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি আন্তরিকতার সঙ্গে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দুঃখকর পরিণাম তাঁকে সমস্ত জীবন ভরে বহন করে চলতে হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে কোন ইউরোপীয়ের হত্যার অভিযোগ ছিল না। মহারানীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ তাঁর ছিল। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর এ সম্পর্কে কথাবার্তা চলছিল। কিন্তু স্বাধীনচেতা ফিরোজ শাহ্ গভর্নমেন্টের শর্ত মেনে নিয়ে প্রাণ বাচাঁতে রাজী হলেন না। আত্মসমর্পণ করবার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের কাছে তিনি

তিনটি শর্ত উপস্থিত করেছিলেন : ১। তাঁকে উপযুক্ত ভাতা দিতে হবে। ২। তাঁর অবাধ চলাচলের অধিকার দিতে হবে, স্থান বিশেষ আটক রাখা চলবে না। ৩। তাঁর দশ বারো জন অনুচর ছিল, গভর্নমেণ্ট তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে পারবেন না। গভর্নমেন্ট তাঁর এই শর্ত মেনে নিতে রাজী হলেন না। বাবরের বংশধর ফিরোজ শাহ্, নিরপত্তা ও মর্যাদার মধ্যে মর্যাদাকেই বেছে নিলেন।

এর পর ফিরোজ শাহ্ আর ভারতে থাকা নিরাপদ বিবেচনা করলেন না। তিনি গোপনে ভারত ত্যাগ করলেন। তখন তাঁর বয়স আর কতই বা, ত্রিশের মত হবে। ভারতের সঙ্গে এইখানেই তাঁর সম্পর্কের শেষ। আর কোনদিন তিনি দেশে ফিরবার সুযোগ পান নি। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে তিনি কান্দাহারে ছিলেন এই খবর পাওয়া গেল। এর পর থেকে তিনি যেখানেই গেছেন বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ম নজর রেখেছে। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে বোখারায় দেখা যায়। এখানে তাঁকে অত্যন্ত আর্থিক কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তেহরাণে ফিরে এলেন। এর পর কয়েকটা বছর তিনি হেরাত ও বোখারার মধ্যেই চলাচল করছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতের সীমান্তঘেষা সোয়াত উপত্যকায় চলে আসেন। সোয়াত থেকে তিনি কাবুল গেলেন। কিন্তু আফগানিস্তানের আমীর তাঁকে মেহমান হিসেবে পেয়ে বিশেষ খুশী হলেন না।

ফিরোজ শাহ্ রাজধানী কাবুলে থাকলে তাঁর বৃটিশ বন্ধুদের মনে সন্দেহ ও উদ্বেগেরে সৃষ্টি হতে পারে, এ ভয় তাঁর মনে মনে ছিল। তাই তিনি তাঁকে বাদাকশানে চলে যেতে বললেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ্ বেশী দিন সেখানে ছিলেন না। এর পরেই তাঁকে দেখতে পাই সমরখন্দে। কি উদ্দেশ্যে তিনি একটির পর একটি মুসলিম রাষ্ট্রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সে খবর কিছুই জানা যায় নি। ১৮৭২-এর অক্টোবরে তাঁকে কনস্ট্যান্টিনোপল্ এ দেখা গিয়েছে। অভাব, উদ্বেগ ও দুঃসহ কষ্টভোগের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তিনি অসময়ে বার্ধ্যক্যে আক্রান্ত হন!

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ক্যাপটেন হান্টার তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন : "ইস্তাম্বুলে অনেকের কাছে শোনা গেছে যে, ফিরোজ শাহ্ কয়েক মাস আগে মীর্জা মহম্মদের সঙ্গে মক্কার পথে যাত্রা করেছেন। আমার সংবাদদাতা বলেছেন যে, তিনি এখানে তাঁকে সুলতান ইব্রাহিমের সঙ্গে দেখেছেন। তাঁর শরীর তখন একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে, একটা চোখও প্রায় অন্ধ, পা'টা খোঁড়া হয়ে গিয়েছে।" সে সময় তাঁর

বয়স ৪৫-এর বেশী নয়। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে তিনি মক্কায় যান এবং ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১৭ইং ডিসেম্বর সেখানেই তাঁর চিরবিশ্রামলাভ ঘটে। এই অশান্ত বিদ্রোহীর উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণযাত্রা এতদিনে সমাপ্তির ঘাটে এসে পৌছল।

এইভাবে স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ ফিরোজ শাহ্ স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে, বিদেশে বিদেশীদের মধ্যে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। দেশের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, তাঁর দেশবাসী কি সে কথা মনে রেখেছে? দেশভক্ত ফিরোজ শাহ্ কেবলমাত্র নিজের চেষ্টার জোরে তাঁর সৈন্যবাহিনী গঠন করে তুলেছিলেন এবং দুই বছর পর্যন্ত সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সংগ্রাম করে চলেছিলেন। নির্দোষের রক্তপাতে তাঁর হাত কোনদিন কলুষিত হয় নি। শিশুহত্যা ও নারীহত্যার বিরুদ্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি তাঁর ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় বলেছেন, "এই নির্দোষ শিশু ও নারীদের হত্যা করতে গিয়ে আমাদের লোকেরা ইংরাজদের পরাজিত করবার কাজটাকে আরও পিছিয়ে দিয়েছে। নেতারা কখনোই এমন নির্দেশ দেয় নি। এই ধরনের কাজ বন্ধ করে দিয়ে আমাদের পবিত্র জেহাদ ঘোষণা করতে হবে।"

এইভাবে বিদ্রোহের বাতিগুলো একটি একটি করে নিবে গেল। রঙ্গমঞ্চ গভীর অন্ধকারে ছেয়ে গেল। যবনিকা পতন হোল।

কিন্তু কিছুই একেবারে নিঃশেষ হয় না। রাত্রির গভীর অন্ধকারের ওপারেই আছে আলোকোজ্জ্বল প্রভাত। রাত্রি তারই জন্য তপস্যা করে চলেছে। যবনিকা আবার উঠবে। আবার নতুন প্রভাত, নতুন দৃশ্য দেখা দেবে।

—০—